রহস্যভেদী বাসব

(অষ্টম খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : পঞ্চানন জানা : জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০।১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন : কলিকাতা—১২

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রহস্য ঔপন্যাসিক কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় "রহস্যভেদী বাসব—৭ম খণ্ড" মুদ্রণকালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

"রহস্যভেদী বাসব"-এর ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত গ্রন্থকার স্বয়ং ভূমিকা লিখেছেন। এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটেছিল সপ্তম খণ্ড প্রকাশকালে।

এবার আমরা "অষ্টম খণ্ড" প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও গ্রন্থকারের নিজস্ব রচিত ভূমিকা আমরা উপস্থাপনা করতে পারছি না। এবং পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও ভূমিকা উপস্থাপনা করতে পারব না। তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকেরা এই ভূমিকা-বিহীন খণ্ডগুলি পূর্বের মত সমান মর্যাদায় গ্রহণ করবেন এই আমাদের আন্তরিক আশা।

ইতি

প্রকাশক

—সূচীপত্র—

অরণ্য আদিম

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ আগে উতরে গেছে।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তুমুল তর্কের এইমাত্র পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তর্কের বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্রতিবারের মত এবারও যথানিয়মে বাসবের মুখের তোড়ের সামনে দাঁড়াতে না পেরে শৈবাল চুপ করে গেছে। চুপ করে গেছে বলেই তর্ক মাঝ পথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মৃদু হাসিতে ঠোঁট রাঙিয়ে বাসব পাইপ ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তরল গলায় বলল, দেখ ডাক্তার, অন্য অনেক কিছুর মত তর্ক করতে জানাটাও একটা আর্ট।

—নিশ্চয়। শৈবাল বিরস মুখে বলল, তবে তুমি যে ভঙ্গীতে তর্ক কর তাকে আর্ট না বলে বলা উচিত, গায়ের জোরে নিজের মতবাদকে পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। বাসব ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দিয়ে বলল, আমার উপর এ তোমার ঘোর অবিচার। তুমি যদি প্রকৃত সত্যটা না দেখতে পাও সে অপরাধ কি আমার? যাক, এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই ভাল। রাজনৈতিক খচাখচি নিয়ে আমাদের অনেক সময় কাটল। আচ্ছা ডাক্তার তোমার মৃণাল চৌধুরীর কথা মনে পড়ে? শৈবাল একটু চুপ করে রইল। নামটা মনে করবার চেষ্টা করল বোধহয়। তারপর বলল, নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ঠিক মনে করতে পারছি না। কে বল তো?

—দিন দিন তোমার স্মরণ শক্তি এ রকম দুর্বল হয়ে পড়ছে তাতো আমার জানা ছিল না ডাক্তার! বিহার পুলিসের বিখ্যাত গোয়েন্দা অফিসার মৃণাল চৌধুরীকে তোমার মনে পড়ছে! আশ্চর্য ব্যাপার তো। সেই যে পাটনায় "খায়রী-মার্ডার" কেসে আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

—ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ মনে পড়েছে। হঠাৎ তাঁর কথা?

—আজ দুপুরে তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি।

—চিঠি পেয়েছ!

—হ্যাঁ।

চিঠিতে রহস্যের কিছু গন্ধ মাখানো আছে। পড়ে দেখ না। বাসব সোফা থেকে উঠে হোয়াটনটের দিকে এগিয়ে গেল। হোয়াটনটের উপর আজকের ডাকে আসা কতকগুলো চিঠি ছিল। তার মধ্যে থেকে মৃণাল চৌধুরীর চিঠিখানা বেছে নিয়ে শৈবালকে দিল।

ছাপা লেটার প্যাডে গোটা অক্ষরে লেখা—

মাননীয় বাসববাবু,

কুশলে আছেন ভরসা করি।

মাস আটেক আগে আমাদের দেখা হবার পর আর কোন সংবাদ আপনার পাইনি। ছোটনাগপুরের এই ছোট শহরে আপনাকে কয়েকবার আসতে অনুরোধ করেছি। এখানকার চমৎকার জল-হাওয়া সম্পর্কে লোভ দেখাতেও কার্পন্য করিনি। তবু আপনি আসেননি। স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে আসার মত সময় বোধহয় আপনার হাতে ছিল না।

এখানে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় এই চিঠির অবতারণা। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, নইলে নিজেই কলকাতায় উপস্থিত হয়ে আপনাকে সমস্ত কিছু বলতাম। আমাদের এই বাঙ্গালী প্রধান শহরে সম্প্রতি রহস্যজনক ভাবে গোটা দুয়েক খুন হয়ে গেছে। হত্যাকারী ধরা পড়েনি। দুটো খুন একই ব্যক্তি করেছে কি করেনি তাও সঠিক ভাবে বুঝতে পারা যায়নি। সমস্ত শহরে আতঙ্কের জোয়ার বইছে।

আমি অনেক চিন্তার পর ও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই রহস্যকে একমাত্র আপনিই পরিষ্কার করতে পারেন। হাতে সময় থাকলে চলে আসুন অবিলম্বে। সমস্ত শহরবাসী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কবে এবং কোন্ ট্রেনে আসছেন ওয়্যার করে জানান। স্টেশনে উপস্থিত থাকব।

নমস্কার গ্রহণ করুন
ভবদীয়
শ্রীমৃণাল চৌধুরী।

—কি বুঝলে ডাক্তার?

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, খুন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। তবে তোমার হাতে সময় আছে সুতরাং তুমি যাবে, একথাটা আমি সহজেই বুঝতে পারছি।

—আমি একা নই, তুমিও—

—না, না আমাকে আর টেন না।

—আপত্তির কারণ আছে নিশ্চয়?

—ছুটি কোথায়? ইচ্ছে করলেই কি আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব?

—আমি এত সব টেকনিকাল কথার মধ্যে যেতে চাই না ডাক্তার। আগামী পরশু আমি রওয়ানা হব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে এই হল সার কথা।

শৈবাল নাচার ভঙ্গীতে ঘাড় বেঁকাল!

পাইপ নিভে গিয়েছিল। উপরকার ছাই ঝেড়ে নিয়ে আবার অগ্নি সংযোগ

করল বাসব। বার কতক ঘন ঘন টান দিতেই কালচে হলদে রংএর ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—তুমি তো প্রশ্ন করলে না ডাক্তার, মৃণাল চৌধুরী পাটনা ছেড়ে ছোট নাগপুরের ছোট একটা শহরে পেঁছালেন কি ভাবে।

—বদলি হয়ে গেছেন বোধহয়!

—না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন রিটায়ার হওয়ার বহুদিন বাকি থাকতেই। অবশ্য অসুস্থতার জন্য যে তিনি এই পথ বেছে নিয়েছিলেন তা নয়।

—তবে?

—একটা এক্সিডেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। মিঃ চৌধুরীর মুখেই শুনেছি শোচনীয় সেই ঘটনার কথা। উনি তখন পাটনাতে। স্বামী-স্ত্রীতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছেন ফ্রেজার রোডে। বাড়িতে ছিল ওঁদের এগারো বছরের মেয়ে নন্দিতা ও তার পিসতুতো দাদা কিংকর। নন্দিতা কাপড় ইস্ত্রী করছিল, কি ভাবে যেন হঠাৎ তার ফ্রকে আগুন ধরে গেল। সে আগুন নেভান গেল না। পাড়ার লোকেরা ও কিংকর প্রচুর চেষ্টা করেছিল—সংবাদ পেয়ে মৃণালবাবুরা এলেন, তখন সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে নন্দিতা। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই হাসপাতালে মারা গেল সে। একটি মাত্র সন্তানকে হারিয়ে মৃণালবাবু শোকে দিশেহারা হয়ে পড়লেও অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর স্ত্রী কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। শোকে মেণ্টাল ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললেন। তখন তাঁকে চাকরি ছাড়তেই হল। অসুস্থা স্ত্রীর চিকিৎসা করালেন, মাসের পর মাস ঘুরে বেড়ালেন বিভিন্ন শৈলাবাসে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ নিরোগ হয়েছেন।

—তারপরই বুঝি ছোটনাগপুরের ওই ছোট শহরে বাড়ি তৈরি করে বাস করছেন?

—ঠিক তাই।

—জায়গাটার নাম কিন্তু এখনও আমি জানি না।

—কামানিচক। বেশ নাম, কি বল ডাক্তার? যাহোক, আর কোন ওজর আপত্তি না তুলে কাল তুমি ছুটির ব্যবস্থা করে নেবে।

কামানিচক শহরটি খুব বেশি দিন গড়ে ওঠেনি।

ঊনিশ শ' চৌত্রিশ সালে যখন বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল তখন এই অঞ্চলটায় শুধু ছিল প্রকাণ্ড মাঠ। আর ছিল এখানে-ওখানে গোটা পঞ্চাশেক সাঁওতালদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির ঘর। শোনা যায়, শ' খানেক বছর আগে এই মাঠে সাঁওতালদের সঙ্গে রাজপুতদের প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। লড়াই হয়েছিল কামানিচক কেল্লার অধিকার নিয়েই।

উভয় পক্ষের বীরদের রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠেছিল। শৌর্যের চরমতম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেও, শুধু বিশ্বাসঘাতকতার দরুন পরাজিত হয়েছিল রাজপুতরা। তারপর এক অজানা কারণেই প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলটি নির্জনতার কোলে ঢলে ছিল। ভূমিকম্পের আঁচড় এখানে এসে না লাগলেও তার ঢেউ এসে লাগল। বিধ্বস্ত মোতিহারি থেকে একদল বাঙ্গালী সমস্ত কিছু হারিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। বলতে গেলে ঠিক সেই দিন থেকেই এই শহরের পত্তন। কি সূত্রে যে তাঁরা বিহারের এতটা মাটি মাড়িয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তা আজ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্মানিচক দ্রুত জন সমৃদ্ধ হয়েছে।

এখন শহরের লোকসংখ্যা প্রায় হাজার কুড়িক। দেশ স্বাধীন হবার পর, মাত্র বছর দশেক আগে এখানে একটি তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই খনিই শহরের বহু মানুষের মুখের গ্রাস এনে দেয়। তাছাড়া আছে কাঁচের ফ্যাক্টরি, তাঁতের কাপড়ের ঢালাও ব্যবসা।

গোটা তিনেক স্কুল ছিলই, সম্প্রতি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করেছেন কলকাতা থেকে আগত একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। শহরের নাম ক্রমেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। শীতকালে দূরদূরান্তর থেকে স্বাস্থ্যের লোভে অনেকে আসেন এখানে। শহরটিও চমৎকার নৈসর্গিক আওতার মধ্যে অবস্থিত। তিন দিকের উঁচু পাহাড় যেন শহরকে বিশেষ কিছুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। ভারতের এই একটি মাত্র নদীই জলের সঙ্গে সোনার রেনু বয়ে এনে বালুবেলার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। সোনার সন্ধানকারীর সংখ্যাও এখানে অল্প নয়।

শান্ত নির্জন, ছিমছাম শহর।

প্রায় হাজার কুড়িক লোক আছে এখানে বুঝতেই পারা যায় না। বিস্ময়ের বিষয় আজ পর্যন্ত বড় রকম কোন ডাকাতি হয়নি, রাহাজানি হয়নি—দুচার টাকার ছিনতাইয়ের সংবাদ মাঝে মাঝে কানে আসে এই পর্যন্ত। সেই কার্মানিচকে রহস্যজনক খুনের ঘটনা ঘটল, একটা নয় দুটো!

প্রথম যেদিন খুনের ঘটনাটা শোনা গেল অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। এই সমস্ত ভয়াবহ গুজব রটনাকারীকে শহর থেকে বার করে দেবার কোন আইন আছে কিনা এ সম্পর্কেও অনেকে অনুসন্ধান করে দেখেছে। অথচ শেষ পর্যন্ত ঘটনা পরিবেশই চোখে আঙ্গুল দিয়ে সকলকে দেখিয়ে দিল, গুজব নয়—বাস্তব ঘটেছে এই মর্মন্তুদ ঘটনা।

সেদিন কার্মানিচকের আকাশে ছিল মেঘের ঘন ঘটা।

সকাল থেকে কনকনে হাওয়া দিচ্ছিল। শহরের আসপাশে যে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। এই অঞ্চলে শীতের দাপট

একটু বেশি। এই গুরু গম্ভীর জল-হাওয়ায় তার দাপট বহুলাংশে বেড়ে গেছে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে বিকেলের পর বাড়ি থেকে বাইরে যাবার কথা কেউ মনেও স্থান দেয়নি।

দিনের আলো তখন নিভু নিভু।

বোধহয় সাড়ে পাঁচটা তখন।

বাদল নির্জন পার্কে প্রবেশ করল। এই পার্কটি শহরের প্রায় এক প্রান্তে। জল-হাওয়া ভাল থাকলেও এখানে লোকসমাগম বিশেষ হয় না। বাদল গ্রেটকোটের কলার ভাল করে তুলে দিয়ে শেডের তলায় একটা বেঞ্চের উপর বসল। তার পরিচিত লোকেরা এখন তার মুখ দেখলে অবাক হত। হাসিখুশি বাদলের মুখ এখন অসম্ভব গম্ভীর। আরো বিস্ময়ের বিষয় হল যখন কেউ বাড়ি থেকে বেরুতে চাইছে না, তখন সে এই নির্জন পার্কে এল কেন?

একথা জানাতে হলে অনেক কথাই বলতে হয়। বর্ণনা করতে হয় বাদলের কার্মানচকে পা দেবার পরের ইতিহাস। বাদল কলকাতার ছেলে। তিনকুলে তার কেউ নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত মাসীমা মরা বোন-পোকে নিজের কোলে তুলে নিয়েছিলেন যখন তার বয়স মাত্র আটমাস। তার নিজের ছেলের মতই বাদলকে মানুষ করেছেন। বি. এ. পাশ করিয়েছেন।

ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পড়ছিল—মাসীমা মারা গেলেন সেই সময়। এমন কিছুই হয়নি, সামান্য জ্বর। যা সহজেই সেরে যাবার কথা তাতেই সমস্ত শেষ হয়ে গেল। মেসোমশাই কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। চতুর্দিক ফাঁকা মনে হতে লাগল বাদলের। পড়তে আর ভাল লাগল না, কয়েকমাস চুপচাপই বসে রইল বাড়িতে। কিন্তু এই ভাবে চিরটাকাল কাটতে পারে না। চাকরির সন্ধান করা দরকার।

বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। এই চাকরি আক্রার যুগে একরকম ভাগ্যের জোরেই কলকাতা থেকে বহু দূরে কার্মানচকের তামার খনিতে কাজ পেয়ে গেল। চাকরি হল, সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার জনারণ্য থেকে বহুদূরে থাকার মস্ত সুযোগ এসে গেল, এও কম লাভের কথা নয়। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাদল একদিন কার্মানচকে এসে উপস্থিত হল।

বছর দেড়েক আগের কথা। তখন কার্মানচকে কোন হোটেল ছিল না। এখনও যে ভদ্রগোছের কোন হোটেল আছে তা নয়। থাকার সমস্যা নিয়ে বাদল ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে লাগল। প্রথম দু'দিন কোনরকমে কাটিয়ে দিল স্টেশনে। তৃতীয় দিন আশার আলো দেখা গেল। তার অন্যতম সহকর্মী হল অমিয় সেন। স্ফূর্তিবাজ ছেলে। এখানে একটা সাংস্কৃতিক

ক্লাব গঠন করে তাই নিয়ে বলতে গেলে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকে।

অমিয় বলল, আপনি খুবই ভাবনায় পড়ে গেছেন দেখছি।

ভাবনা হবে না, কি বলছেন আপনি। ওয়েটিংরুমে ছারপোকার কামড় খেয়ে বে-আইনী ভাবে আর কতদিন থাকা যায় বলুন?

—আমি অবশ্য আপনাকে একটা বাসার সন্ধান দিতে পারি।

—বলেন কি! আমি তো মশাই বেঁচে যাই তাহলে।

—তবে—

—তবে—?

অমিয় সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, একটু কণ্টোল হবে।

প্রায় অধৈর্য গলায় বাদল বলল, তা হোক। যে অবস্থার মধ্যে আছি তাতে এখন টাকার মায়া করলে চলবে না। কোন্ পাড়াতে বাড়িটা?

হ্যান্ডলুম কর্ণারে।

শহরে যে অংশে তাঁতের কাপড় তৈরি হয়, সেই পাড়াকে হ্যান্ডলুম কর্ণার বলা হয়। এখানে প্রায় গোটা ত্রিশেক বড় বড় কোম্পানি আছে।

অমিয় ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, একটা পুরো বাড়ি অবশ্য পাবেন না। তবে একখানা ঘর পেতে পারেন।

—বাড়িটা কার?

—হেমলতা হাজরার। নামটা বোধহয় চেনা চেনা ঠেকছে?

—কই, না তো।

সেকি মশাই, আপনি তো অবাক করলেন! কার্মানচকে পা দেবার পরই তো হেমলতা হাজরার নাম শোনবার কথা।

বিস্মিত বাদল প্রশ্ন করল, কেন, তিনি কি শহরের নেত্রীস্থানীয়া কেউ? মিট মিটে হাসিতে মুখ ভরিয়ে অমিয় বলল, নেত্রীস্থানীয়া কেউ না হলেও কোন বিশেষ বিষয়ে বিখ্যাত নিশ্চয়ই। যাক, এত কথায় কাজ কি, আপনার তো মাথা গোঁজবার জায়গা পেলেই হল। বিকেলে হ্যান্ডলুম কর্ণারে গিয়ে কথাবার্তা পাকা করে নিন।

বিকেলে হ্যান্ডলুম কর্ণারে গেল বাদল।

বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। একজন পথচারিকে প্রশ্ন করতেই তিনি বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন। উঁচু পাঁচিল ঘেরা চত্বরের মধ্যে তিনতলা বাড়ি। গেটের পাশে আরেকখানা আধুনিক কেতায় তৈরি একতলা বাড়িও আছে। একতলা বাড়ির বারান্দায় একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাদল তাঁর দিকেই এগিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমি হেমলতাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমারই নাম হেমলতা।

—নমস্কার।

—কি ব্যাপার বলুন তো ?

—আমি ঘরের জন্যে এসেছিলাম।

—ও। আসুন—

ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে বাদল সুসজ্জিত ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

বসতে অনুরোধ করে হেমলতা প্রশ্ন করলেন, আপনি নতুন এসেছেন কি ?

—হ্যাঁ। সবে দিন তিনেক হয়েছে।

—ও। কি প্রয়োজন আপনার, ফ্যামিলি কোয়ার্টার না ব্যাচেলার্স ডেন ?

—মানে আমার কোন ফ্যামিলি নেই।

—তার মানে ব্যাচেলার্স ডেনে থাকতে চান। দেখি জায়গা খালি আছে কিনা। তিনি সোফা থেকে উঠে ঘরের কোণে রক্ষিত একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের উপর কয়েকটা ফাইল ও বাঁধানো খাতা রাখা ছিল। জীবনে অনেক মহিলা দেখেছে বাদল তবে এমন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে কাউকে দেখেনি। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। পরনে সরু কালো পেড়ে জর্জেটের শাড়ি। বলা বাহুল্য আধুনিক কেতায় পরা। ম্যাচ করা ব্লাউজ। কাঁচা পাকা চুলের এলো খোঁপা ঘাড়ের উপর দুলছে। কানে পাথর বসান সুদৃশ্য টপ। হাতে কোন চুড়ি নেই—শুধু রিস্টওয়াচ। সিঁদুর নেই। আজকাল অনেকেরই থাকে না। তবু বুঝতে পারা যাচ্ছে না তিনি বিবাহিত কি না। অবশ্য কুমারী কি বিধবা তা অনুমান করে নেওয়াও কষ্টকর।

হেমলতা খাতা-পত্তর ঘেঁটে আবার ফিরে এলেন।

বললেন, আপনার ভাগ্য ভাল। একটা মাত্র সিটই খালি আছে। ভাড়া একশ টাকা। লোকে অবশ্য বলে আমি একটু ভাড়া বেশি নিয়ে থাকি। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, হাজরা হাউসের মত কম্ফার্ট সমস্ত শহরে আপনি আর কোথাও পাবেন না।

—ভাড়ার জন্যে আটকাবে না। আমি আজই চলে আসতে পারি ?

—আমার কোন অসুবিধা নেই। তবে তার আগে আপনার পূর্ণ পরিচয় আমার জানা দরকার। বাদল বলল।

হেমলতা লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটের উপর ছোট্ট রুমাল বুলাতে বুলাতে শুনলেন। বললেন তারপর, আমি তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম নিয়ে থাকি। ঘর দেখে নিয়ে টাকাটা আমায় মিটিয়ে দিন।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তিনটে একশ টাকার নোট হেমলতার হাতে গুনে দিয়ে বাদল বলল, ঘর দেখার দরকার নেই। আমি মালপত্র নিয়ে আসছি।

হাজরা হাউসের তেতলায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে বাদলের। ঘরখানা মন্দ নয়। কলকাতার বাড়িওয়ালারা যেমন ঘর নয় ঘরের নামান্তর ভাড়া দেন, এটা ঠিক সে রকম নয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিলিয়ে ঘরখানা বড়ই। দক্ষিণ খোলা। খান তিনেক জানলা আছে। যে কোন একটা জানলার সামনে দাঁড়ালে কার্মানচকের অনেকখানি চোখে ধরা দেয়।

ঘরখানা অবশ্য একার দখলে আসেনি বাদলের। আরেকজন রুমমেট আছে। সঞ্জয় ঘোষ—গ্যাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। অমিয় ঠিকই বলেছিল, একটু কষ্টটাল হয়ে পড়বে। কলকাতা থেকে বহু দূরে, এই ছোট শহরে আধখানা ঘরের ভাড়া একশ টাকা একটু বেশি বইকি! তা হোক। বাসা সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট।

তেতলাটা ব্যাচেলার্স ডেন। একতলা ও দোতলা মিলিয়ে গোটা আটেক ফ্যামিলি কোয়ার্টার আছে। সকলকেই মোটামুটি অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়। দোতলার অসীম সোমের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বাদলের। প্রৌঢ় অসীম সোম কপার মাইনেই কাজ করেন। এখন তিনি রিটায়ারের মুখে।

অফিস থেকে ফেরার পর বাদলের কিছু করার থাকে না। মিঃ সোমের দরজায় এসে নক করল। তিনি যেন মুখিয়েই ছিলেন। দরজা খুলেই বললেন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। আসুন—

অনেক কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। চা ও চিঁড়ে ভাজা এসে পড়ল এক সময়। কথা প্রসঙ্গে সোম প্রশ্ন করলেন, হেমলতা হাজরার কাছে আবার গিয়েছিলেন নাকি?

—না। বাড়ির মালিকের সঙ্গে ভাড়াটেদের একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলাই ভাল।

তাছাড়া—

—থামলেন কেন?

তাছাড়া ভদ্রমহিলার কথা বলার ভঙ্গী আমার মোটে ভাল লাগেনি। এ রকম দেখা অভ্যাস নেই বলেই বোধহয়!

—উনি একটু বিচিত্র ধরনের। আমিও সযত্নে ওঁকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি।

আচ্ছা মিঃ সোম—বাদল বলল, হেমলতা হাজরা কি অবিবাহিতা?

চোখ কপালে তুললেন অসীম সোম।

—অবিবাহিতা—কি বলছেন মশাই! কেন, আপনি ওঁর সম্পর্কে কিছু শোনেননি?

—কই, না তো।

—উনি বিধবা। ওঁর উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে আছে।

—এ কদিনের মধ্যে কোন মেয়ে তো চোখে পড়ল না?

—এখানে থাকে না। পাটনা না কোথায় পড়াশুনা করে শুনেছি।

এই সময় দুজনের আলাপে বাধা পড়ল। বার কয়েক কে করাঘাত করল দরজায়। অসীম সোম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুললেন। আগন্তুক আর কেউ নয়, স্বয়ং হেমলতা হাজরা। আজও তাঁর মুখে কসমেটিক উজাড় করা রয়েছে। নিজেকে তরুণী প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা সাজপোশাকে প্রকট। সপ্রতিভ ভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন হেমলতা।

কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন, মিঃ সোম, কাল সকালে আপনাকে একবার স্টেশনে যেতে হবে।

—কেন বলুন তো ?

—কাল কল্পনা আসছে। বুঝতে পেরেছেন বোধহয় আমি আমার মেয়ে কল্পনার কথা বলছি। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু—। আমার এই উপকারটুকু আপনি নিশ্চয় করবেন ?

সোম বললেন, আপনার কিন্তু হবার কিছু নেই। আমি স্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসব।

—ধন্যবাদ। সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন ইন করে। এখন চলি।

বলা বাহুল্য তিনি সমস্ত কথা চিবিয়েই বললেন। হেমলতা বিদায় নেবার পর বাদল ও অসীম সোমের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

বাদল অফিসে গেল সাড়ে নটার পর। তখনও স্টেশন থেকে ফেরেননি অসীম সোম। কল্পনাকে দেখার যে আগ্রহ বাদলের মনে বাসা বাঁধেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ট্রেন লেট্ হবার দরুণই বোধহয় ফিরতে দেরি হচ্ছে। নিরাশ হয়ে সে অফিস চলে গেল।

কাজের চাপে ক্রমে সকালের আগ্রহ মন থেকে উবে গেল। ছুটির পর বাজার হয়ে বাসায় ফিরল। স্টেশনারি জিনিষপত্র কিছু কেনার ছিল। গেট পার হয়ে সবে কম্পাউণ্ডে পা দিয়েছে—লক্ষ্য করল, লনের ঘাসের উপর বসে একটি মেয়ে উল আর কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তার বয়স বছর কুড়িকের মধ্যেই হবে। গায়ের রং ধপধপে ফর্সা নয় আবার কালোও নয়। সুশ্রী মুখ। এক নজরেই বুঝতে পারা যায় মেকআপ ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে নিজের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়নি। পরনে তাঁতের রঙ্গীন শাড়ি।

বাদল থমকে দাঁড়াল। হেমলতা হাজরার মেয়ে কল্পনা নাকি ? কিন্তু মা ও মেয়ের সাজ-পোশাকে এত পার্থক্য হওয়া কি সম্ভব ? মেয়ের এই সাধারণ সাজ-পোশাক আর মা ওই বয়সে তরুণী-আধুনিকা সাজার আপ্রাণ প্রয়াসে ব্যস্ত ! যাহোক, বাদল আর দাঁড়াল না, তিনতলায় নিজের ঘরে চলে গেল।

সপ্তাহখানেক আরো অতিক্রম করেছে।

বাদলের এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, লনে দেখা মেয়েটিই কল্পনা। অফিস যাওয়া-আসার পথেও তাকে দেখে। নিজের জানলার সামনে দাঁড়িয়েও দেখতে পায়। বয়সের ধর্ম বলেই বোধহয় মন মাঝে মাঝে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এবং একথাও খুব সত্যি যে বাদল আজ পর্যন্ত মন দেওয়া-নেওয়ার পালায় মেতে উঠতে পারেনি। কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছে। বান্ধবী সংগ্রহ করবার ইচ্ছে থাকলে সহজেই সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু ও তখন অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি দেয়নি। মন দিয়ে পড়াশুনা করবার চেষ্টা করেছে।

রুম মেট সঞ্জয় বাদলকে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, নিচে লনে ডেকচেয়ারে বসে কল্পনা বই পড়ছে। শীতের মিষ্টি রৌদ্র ওর মুখের উপর ছড়িয়ে রয়েছে।

—কি দেখছেন ?

সঞ্জয়ের কথায় বাদল চমকে উঠল।

—শহরের বেশ খানিকটা এখান থেকে দেখা যায়।

—তা যায় অবশ্য। তবে আপনি আপাততঃ অন্য কিছু দেখছেন, তাই নয় কি ?

—না ‥ ‥ মানে …… ঠিক ‥ ‥

—সঙ্কোচ করবার কিছু নেই। ভরসা দেওয়ায় সুরে সঞ্জয় বলল, আমি বছর তিনেক এখানে আছি। এর মধ্যে এমন একজনও তরুণ ভাড়াটেকে দেখলাম না যে মহিলাটির দিকে বার বার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়নি।

একটু ইতস্তুতঃ করে বাদল বলল, আপনাকে নিশ্চয় প্রৌঢ় বলা চলে না। আপনিও কি—

হ্যাঁ। আমারও বেশ কিছুদিন নেশা ছিল। এখন ছুটে গেছে।

আপনারা এত অল্পে সন্তুষ্ট জেনে অবাক হচ্ছি।

কেন ?

কেন নয় বলুন ? তিন বছরের মধ্যে আপনারা কেউ আলাপ-সালাপ করতে পারলেন না ! শুধু চোখের দেখাই দেখতে থাকলেন !

ও বড় শক্ত ঠাঁই মশাই। ওই সুন্দর চেহারার আড়ালে একটা কঠিন মন আছে। যারা আলাপ করতে গেছে তারাই নাজেহাল হয়েছে।

আমার মনে হয় কোন অশোভন—

মোটেই নয়। কেউ কোনরকম অশোভন ব্যবহার করবার চেষ্টা করেনি। বেশ তো আপনি একবার করে দেখুন না—

একটু চুপ করে থেকে বাদল বলল, আমার তো মনে হয় না আলাপ করতে গেলে ভদ্রমহিলা আমাকে অপমান করবেন।

সঞ্জয় গম্ভীর গলায় বলল, যদি সে রকম কিছু না ঘটে, আমি আপনাকে

দশ টাকার মিষ্টি খাওয়াব।

—আমি রাজি। আমি এখুনি যাচ্ছি, আপনি এই জানলা দিয়েই লক্ষ্য করুন।

বিস্মিত সঞ্জয়ের দৃষ্টির সামনে দিয়েই বাদল কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। নেমে এল সোজা নিচে। কল্পনা একই ভাবে ডেকচেয়ারে বসে বই পড়ছে। ওর সুন্দর মুখের উপর কেমন যেন ক্লান্ত আভা। বাদল গিয়ে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল।

বাদল দ্রুত গলায় বলল, নমস্কার। আমি আপনাদের নতুন ভাড়াটে। বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নামিয়ে কল্পনা বলল, কোন কথা থাকলে আপনি মাকে গিয়ে বলতে পারেন।

—কথাটা আপনার সঙ্গেই। আপনি আমাকে টাকা দশেকের মিষ্টি খাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন।

—আমি! কি বলছেন—

—শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও কথাটা আমি মিথ্যে বলিনি। আমার সঙ্গে একজন বাজি রেখেছে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে এলে দশ টাকার মিষ্টি খাওয়াবে।

কল্পনার মুখে কৌতুকের আঁচ পাওয়া গেল এবার।

—আশ্চর্য ব্যাপার তো।

—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আপনি কারুর সঙ্গে আলাপ করতে চান না তাই—

—কে বললে আমি কারুর সঙ্গে আলাপ করতে চাই না? তবে যে কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভাল নাও লাগতে পারে। দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।

কথা শেষ করে কল্পনা চেয়ার থেকে নেমে ঘাসের উপর বসল। কারণ চেয়ার একখানাই ছিল। তেতলার দিকে বাদল দৃষ্টি তুলল, সঞ্জয় জানলার সিক ধরে ব্যগ্রভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ও বসে পড়ল ঘাসের উপর।

নাটকীয় ভাবে যে আলাপের সূত্রপাত তাদের মধ্যে হল তা চরম পরিণতিতে পেঁছাতে মাস দুয়েকের বেশি সময় নিল না। বাদল বুদ্ধিমান ছেলে। অত্যন্ত দ্রুত নিজের মন স্থির করে ফেলল। দিনের পর দিন সকলের চোখ বাঁচিয়ে প্রেম করে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না—ঘর বাঁধার স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলাই ভাল। একদিন সপ্রতিভ ভাবে প্রস্তাবটা করল।

ওর ধারণা ছিল কল্পনা প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে রকম কিছু ঘটল না। একটু লাল হয়ে, একটু ঘাড় বেঁকিয়ে সম্মতি দিল।

কথাটা এবার হেমলতাকে জানাতে পারলেই হল। ঠিক এই সময় বাদলের কানে এমন কতকগুলো কথা পেঁছাল যা ওর পক্ষে পরিপাক করা

কঠিন হয়ে উঠল। তাই আজকের এই দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ও এখানে এসেছে কল্পনার সম্পর্কে শোনা কথাটা যাচাই করে নিতে। আসবার সময় কল্পনাকে এখানে আসবার ইঙ্গিত করে এসেছে।

বাদল নির্জন পার্কে প্রবেশ করে একটা বেঞ্চের উপর বসল। ঘন ঘন তাকাতে লাগল রিষ্টওয়াচের দিকে। মিনিট দশেক পরে কল্পনা এল। বসতে বসতে বলল, বলিহারি তোমাকে এই দুর্যোগের মধ্যেও আমাকে এখানে ডেকে আনলে।

—আমার ধারণা ছিল তুমি আসবে না।

—না এলে কি রক্ষে আছে। বাবুর মেজাজ যে গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার মুখে অমাবস্যা নেমে এসেছে কেন বলতো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বাদল বলল, বিশেষ একটা কথা বলতে ডেকে এনেছি। তুমি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে নিশ্চয়।

কল্পনা হাল্কা সুরে বলল, নিশ্চয়। কথাটা খুবই গুরুগম্ভীর মনে হচ্ছে?

—সনাতন চক্রবর্তী তোমাদের কে হয়?

বাদলের প্রশ্ন শুনে কল্পনা প্রায় চমকে উঠল। তারপর স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করবার চেষ্টা করল, এই প্রশ্ন করছ কেন?

—আমার কথার উত্তর দাও কল্পনা।

-কে আবার হবে? কেউ না। হাজরার সঙ্গে চক্রবর্তীর কখনও আত্মীয়তা হয়?

---আমি আত্মীয়তার কথা বলিনি, সম্পর্কের কথা বলছি।

তুমি ঘুরিয়ে পেচিয়ে কি বলতে চাইছ বলতো?

বাদল নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলল, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু নয়। আমার প্রশ্নের অর্থ তুমি বুঝতে পেরেছ। কতকগুলি কথা আমি নানা সূত্রে জানতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে আমার জীবনব্যাপী সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে। তাই সমস্ত কথা আমার জানা দরকার।

—সনাতন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি—

--কিন্তু তিনি তোমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ট আছেন।

কল্পনার মুখ থেকে আর্তরব বেরিয়ে এল, বাদল—!!!

---কথাটা সত্যি কিনা তোমার মুখ থেকে জানতে চাইছি শুধু।

—কথাটা যদি সত্যি হয় তুমি কি আমার কাছ থেকে সরে যাবে?

—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও কল্পনা।

--না। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। আমার ধারণা ছিল তুমি উদারপন্থী। মা-এর অপরাধ সম্বন্ধে মেয়েকে অ্যাকিউজ করবে না—। কিন্তু দেখছি আমার সমস্ত ধারণাটাই ভুল। যাক, আলোচনা আর বাড়তে দিতে

চাই না। আমি চললাম।

—আমি তো তোমায় অ্যাকিউজ করিনি। আমি—

কল্পনা ততক্ষণে গেটের দিকে চলতে আরম্ভ করেছে।

—এই—শোন—

—না—না—

ওর চলার গতি আরো দ্রুত হল।

সঞ্জয়ই কথাটা বলেছিল বাদলকে। তারপর বাদল অসীমবাবুকে প্রশ্ন করে আরো বিশদ ভাবে সমস্ত কিছু জানতে পেরেছে। সনাতন চক্রবর্তী কার্মানিচকের ধনী ব্যবসাদার। হ্যান্ডলুমের ব্যবসা ছাড়া কাচের ফ্যাক্টরিতেও তাঁর শেয়ার আছে। বছর দশেক আগে হেমলতা হাজরার স্বামী নিবারণ হাজরা তাঁর কাচের ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। কোন এক সূত্রে সনাতনের সঙ্গে হেমলতার আলাপ হয়। আলাপ পরিণত হয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায়। নিবারণের পদন্নোতি হতে থাকে। হাজরা হাউস তৈরি করিয়ে দেন সনাতন। লোকে অন্ধ নয়। হেমলতা ও সনাতনের অবৈধ সম্পর্কের কথা কারুর বুঝতে বাকি থাকে না। কলকাতায় এসমস্ত ব্যাপারকে আর কেউ গুরুত্ব দেয় না। ছোট শহরের কথা স্বতন্ত্র। কানাকানি হতে বিলম্ব হল না। এই পরিচ্ছেদের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ঠিক এই সময় অল্প কয়েকদিন ভুগে নিবারণ মারা গেলেন। কল্পনার তখন জন্ম হয়েছে। শহরের অনেক মানুষের বিশ্বাস সনাতন শ্লো পয়জনের সাহায্যে নিজের পথ নিষ্কণ্টক করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বলগাহীন উদ্দাম জীবন অতিবাহিত করছেন হেমলতা। আজও সনাতন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা।

কল্পনা গেটের বাইরে চলে গেছে। বাদল বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল. ওকে ভুল বোঝার সুযোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র—হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার চতুর্দিকের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। কল্পনার গলা মনে হল যেন! বাদল দ্রুত পায়ে পার্কের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল। শীতের বিকেল। আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে বাদল সবিস্ময়ে দেখল, কল্পনা প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে।

কি হল?—ওকি।

বাদল কয়েক পা এগিয়ে দেখল, বছর তেরোর একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। স্থির নিষ্কম্প। তার মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। এক নজর দেখলেই সন্দেহ হয় দেহে প্রাণ নেই।

বাদল ভেবাচেকা খেয়ে গেল। তারপরই ওর কেমন ভয় করতে লাগল। কে এই মেয়েটি? কল্পনাই বা এমন করে দৌড়ে পালাল কেন? এই ঠান্ডাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে। এখন ওর কর্তব্য কি? কিছুই দেখেনি এই ভাবে সরে পড়া—না সিভিক ডিউটিকে উপেক্ষা করা নয়? পালিয়ে যেতে

মন চাইল না বাদলের, ডাক্তার —না, পুলিসে খবর দেওয়াই ভাল। মারা গেছে মনে হচ্ছে যখন তখন ডাক্তার ডেকে এনে আর লাভ কি।

কিছুদূর হেঁটে যাবার পরই রিক্সা পাওয়া গেল।

সদর থানার অফিসেই তখন ছিলেন ইন্সপেক্টার পেরুমল। তিনি রাজস্থানের লোক। কি সূত্রে যেন বিহার পুলিসে যোগ দিয়েছিলেন। একজন ন্যায়নিষ্ঠ পুলিস অফিসার হিসাবে সুনাম আছে। বাদলের মুখে ঘটনাটা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে ছুটলেন ঘটনাস্থলে। বাদল অবশ্য কল্পনা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করল না।

বডি সনাক্ত করার জন্য পেরুমল আসপাশের কয়েকজনকে ডাকলেন। তাদের মধ্যে একজন মৃতদেহ দেখে জানাল, বিখ্যাত ব্যবসায়ী সনাতন চক্রবর্তীর ছোট মেয়ে জয়া। সনাতনকে খবর দেওয়া হল। তিনি এলেন। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। চওড়া উঁচু চেহারা। মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বুঝতে পারা যায় দুনিয়ার অনেক বিষয়েই তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মেয়ের মৃতদেহ দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এরকম মর্মান্তিক দৃশ্য দেখবার জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না।

পেরুমল তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, জয়া বাড়ি থেকে কটার সময় বেরিয়েছিল?

সনাতন রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, প্রত্যহ বিকেলে ও খেলা করতে বেরুত। আজও বেরিয়েছিল।

কি ভাবে মারা গেছে সঠিক ভাবে বুঝতে না পারা গেলেও, মুখের অবস্থা দেখে অনুমান করা যায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। আচ্ছা মিঃ চক্রবর্তী, আপনার কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?

কাকে হবে বলুন?

—আপনার ক্ষতি করতে পারে এমন কোন লোকের কথা মনে পড়ছে কি?

—আমি ব্যবসাদার। অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে ছলে বলে অনুকূলে আনতে হয়েছে। সুতরাং আমার শত্রুর অভাব থাকার কথা নয়।

—হুঁ। আমি এখন বডি পোষ্টমর্টেমে পাঠাচ্ছি। ওখানকার কাজ শেষ হলেই আপনাকে খবর দেওয়া হবে।

তিনদিন কেটে গেছে।

পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে গতকাল। শল্য চিকিৎসক রিপোর্টে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা পড়লে অবাক হতে হয়। পিঠের ডান পাশে অতি সামান্য একটা ক্ষত আছে। নিশ্চিত ভাবে কোন ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। বিষ ওই পথ দিয়েই শরীরে প্রবেশ করেছে। মৃত্যু হয়েছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। তবে বুঝতে পারা যাচ্ছে না এই তীব্র

বিষ কি জাতীয়।

সনাতন চক্রবর্তী চরিত্রহীন লম্পট লোক। হেমলতা ছাড়াও প্রাক যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত কত মেয়েকে নিয়ে খেলা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিবাহিত জীবন সুখের নয়। স্ত্রীকে চরম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে বারংবার। তবু জয়ার মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েছেন সনাতন। মেয়ের জন্য বাপের হৃদয় হাহাকার করছে। তিনদিন পরে এখন শোক একটু প্রশমিত হলেও আরেক চিন্তা তাকে উতলা করে তুলল। জয়ার জীবন নির্মমভাবে যে শেষ করে দিয়েছে তাকে চোখের আড়ালে থাকতে দেওয়া হবে না। শাস্তি চাই। আইনের হাতে তুলে দিতে হবে হত্যাকারীকে। পুলিসের উপর ঠিক আস্থা রাখতে পাচ্ছেন না সনাতন।

প্রায় ঘণ্টাচারেক ধরে পায়চারি করছেন ও এই সমস্ত কথা ভাবছেন তিনি। শেষে মৃণাল চৌধুরীর বাড়ি যাওয়াই স্থির করলেন। চৌধুরী বিহার পুলিসের পদস্থ কর্মচারি ছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানেই আছেন। কার্মানিচকের উঁচু মহলে তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা। সনাতনের ধারণা হল এই ব্যাপারে মৃণাল চৌধুরী প্রভূত সাহায্য করতে পারেন।

হ্যান্ডলুম কর্ণারেই চৌধুরীর সুদৃশ্য বাড়িখানা। বাউন্ডারি ওয়ালের ওধারেই সনাতনের হ্যান্ডলুম ব্যবসার অফিস বাড়ি। সামনে খোলা মাঠ। একটি চিল্ড্রেন্স অর্গানিজেশন প্রতিদিন ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার আসর বসায়। কর্ণার পার্ক থেকে খেলার মাঠের দূরত্ব বেশি নয়। জয়া প্রতিদিন-কার মত এখানেই খেলতে এসেছিল।

সনাতন ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন।

মৃণাল চৌধুরী একা ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী মায়াদেবী ছাড়া আরো দুজন রয়েছেন। তাঁরা হলেন কার্মানিচক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বিমলেন্দু কয়াল ও এই ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি গগন দত্ত। তিনজনে গম্ভীর মুখে আলোচনা করছেন। আলোচনার বিষয় হয়ত জয়ার মৃত্যু। মায়াদেবী বিষন্ন মুখে সুপুরি কেটে চলেছেন।

সনাতনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে মৃণাল চৌধুরী স্বাগত জানালেন।

দু'মিনিট প্রায় সকলেই নীরব।

শেষে সনাতন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

—সত্যি, ভাবতেই পারা যায় না আমাদের এখানে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে। বিমলেন্দু কয়াল বললেন, আমরা ওই নিয়েই আলোচনা করছিলাম।

—আপনারা রয়েছেন ভালই হল। আমি এসেছি বিশেষ একটা পরামর্শের জন্য। হত্যাকারীকে মুখ লুকিয়ে থাকতে দেওয়া হবে না। তাকে ধরতেই হবে। পুলিস যা করছে করুক। আপনারা বলুন, তাকে ধরবার অন্য

কোন পন্থা আপনারা জানেন কিনা ?

সকলেই তার মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করলেন। শোক-সন্তপ্ত মনে প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা দুর্বার হয়ে উঠেছে।

চৌধুরী বললেন, আপনার চিন্তাধারা ঠিক পথেই চলেছে। জয়া আর ফিরে আসবে না। তবে তার হত্যাকারীকে ধরতে হবে বই কি। সমাজে এরকম জীব যত কম থাকে ততই ভাল।

গগন দত্ত বললেন, পুলিস একজনকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। আমার মনে হয় তাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখলে হয়ত হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

—কার কথা বলছেন ?

—ওই যে—কি যেন নাম—হ্যাঁ হ্যাঁ বাদল মুখার্জী। যে পুলিসকে মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল জয়ার। আপনারাই বলুন, সে তখন ওখানে কি করছিল ? কেউ কিছু বলার আগেই কিঙ্কর ঘরে প্রবেশ করল। মৃণালবাবুর ভাগনে কিঙ্কর। বয়স বছর পঁচিশেক। তাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

—আরেকটা খুন হয়ে গেছে।

সুসজ্জিত ড্রইংরুমে যেন জেট-বিমান ভেঙ্গে পড়ল। সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ নিচের দিকে নামতে আরম্ভ করছে। আবার খুন। কার ঘরে আবার হাহাকার এল কে জানে। কিম্বা তাঁদেরই মধ্যে কারুর মর্মান্তিক ক্ষতি হয়ে যায় নি তো ?

—সে কিরে ?

—হ্যাঁ মামী। নিজের চোখে দেখে এলাম। পার্কের ধারে লোকে লোকারণ্য। ওখানেই মৃতদেহটা পড়ে আছে।

দ্রুত গলায় মৃণাল চৌধুরী বললেন, তুমি চিনতে পারলে কে মারা গেছে।

—পুলিস ডেডবডির কাছে যেতে দিচ্ছে না। তবে দূর থেকে যতদূর দেখলাম তাতে মনে হল, কমলেশবাবুর মেয়ে কণা।

গগন দত্ত প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, কণা !!! তাকে যে ঘণ্টা তিনেক আগেও দেখেছি। আহা হা, এমন ফুটফুটে মেয়েটা মারা গেল।

কমলেশ রায় গগন দত্তর পাশের বাড়িতে থাকেন।

সকলেই এক সঙ্গে প্রায় সোফা থেকে উঠে পড়লেন। কোন পরামর্শ না করেই সকলের চিন্তাধারা একসূত্রে যুক্ত হয়েছে। সকলে ছুটলেন ঘটনাস্থলের দিকে।

যথা সময় পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রকাশিত হল।

কণাকেও খুন করা হয়েছে জয়ার অনুরূপভাবে। কোন্ বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে তা এখনও নির্ণয় করা যায়নি। পাটনা থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আসছেন। তিনি এবিষয় গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে দেখবেন। পেরুমল

বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এখানকার কার্যকাল শেষ হতে তাঁর মাত্র ছ'মাস বাকি। এই শেষ সময় একি বিপর্যয়। দুটো খুন হয়ে গেল, রহস্যের কোন কূল কিনারাই পাচ্ছেন না। এমন কি সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিরও সন্ধান পাননি। খুনের কিনারা না হলে অনেক কৈফিয়তের মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে হবে সন্দেহ নেই।

সমস্ত শহর আতঙ্কে থম থম করছে।

কারুর মুখে অন্য কথা নেই। কার্মাটাড়কে যা কখনও ঘটেনি সেই কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করছে। অধিকাংশ ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল যাওয়া প্রায় বন্ধ। বিকেলে কাউকে আর খেলা করার জন্য বেরুতে দেয়াও হয় না। অনেকের ধারণা হয়েছে সাঁওতালরা ভোঁতা তীর দিয়ে জয়া আর কণাকে মেরেছে। যদি মেরে থাকে তবে কেন মেরেছে সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কেউ দিতে পাচ্ছে না।

সন্ধ্যার পর মৃণাল চৌধুরীর বাড়িতে সকলে একত্রিত হলেন। সকলের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। অনেক আলাপ-আলোচনা হল। একসময় চৌধুরী বললেন, আমার পরামর্শ যদি নেন তবে আমি কলকাতা থেকে প্রখ্যাত গোয়েন্দা বাসববাবুকে আনার পক্ষপাতী।

বিমলেন্দু বললেন, তাহলে তো খুবই ভাল হয়। শহরের লোক কি রকম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে দেখছেন তো। তিনি নিশ্চয় হত্যাকারীকে ধরতে পারবেন। গগন দত্ত বললেন, তিনি কি আসবেন।

--হাতে কোন কেস না থাকলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসবেন। বলুন, চিঠি দেব? সনাতন চক্রবর্তী বললেন, নিশ্চয় দেবেন। টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। তাঁকে আনাতে যা খরচ লাগে আমি দেব।

আধ ঘণ্টাটাক ট্রেন লেট ছিল।

নিজের কামরা থেকে নেমেই বাসব হাসি মুখে মৃণাল চৌধুরীকে এগিয়ে আসতে দেখল। শৈবালও নেমে এল।

--শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আর কত অভদ্রতা করব বলুন। দেখুন না ডাক্তারের আসবার ইচ্ছে ছিল না, তাকেও ধরে এনেছি। আপনাকে একটু বেশি মাত্রায় স্বাস্থ্যপুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। জল হাওয়ার গুণে বোধহয়?

বলা বাহুল্য। আপনারও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। পাইপ ধরেছেন। আসুন বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

স্টেশন থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্র বেশি দূর নয়, মিনিট দশেকের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান গেল। তখন আর কোন বিশেষ কথা হল না। দুজনেই পরিশ্রান্ত। চা ও জলখাবার খেয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে একটু গড়িয়ে নিতে

গেল বাসব ও শৈবাল। দুপুরের আহারপর্বের পর কথাবার্তা আরম্ভ হল। তিনজনে গিয়ে বসল ড্রইংরুমে। পানের প্লেট সেন্টার টেবিলের উপর রেখে সুপুরির পাত্র ও জাঁতি হাতে নিয়ে মায়াদেবীও এসে বসলেন। বাসব দেখলেও শৈবাল আগে এঁকে দেখেনি। যৌবনে সুন্দরী ছিলেন বুঝতে পারা যায়। এখন বিষাদের ছায়ায় সমস্ত মুখ আবৃত।

বাসব পান মুখে দিয়ে বলল, বলুন ঘটনাটা ?

মিঃ চৌধুরী যতদূর জানতেন বললেন।

বাসব একটু চুপ করে থেকে বলল, বাদল মুখার্জী থাকেন কোথায় ?

—এই পাড়াতেই।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে।

—মুখ চেনাচিনি আছে।

—আপনার বাড়ির সামনে যে মাঠটা দেখলাম, ওখানেই কি বাচ্চারা খেলা করতে আসে ?

হ্যাঁ। ওটা শিশুসঙ্ঘের মাঠ। এই অঞ্চলের সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়ে ওখানে খেলা করতে আসে।

—শিশুসঙ্ঘের পরিচালক কে ?

—একটা বোর্ড আছে। শহরের গণ্যমান্য লোকেরাই সেই বোর্ডের সদস্য। তবে প্রতিদিন মাঠে বাচ্চাদের পরিচালনা করার দায়িত্ব ভৈরব হালদারের হাতে। অত্যন্ত উৎসাহী লোক। বলতে গেলে ওঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই এই শিশু প্রতিষ্ঠান এখন সুষ্ঠু ভাবে চলছে।

পাউচ থেকে টোবাকো বার করে পাইপে ভরতে ভরতে বাসব বলল, ভৈরব হালদারের সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার। আপনি খবর পাঠাবেন—কাল যেন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন।

—বেশ।

—এখন চলুন, থানায় ঘুরে আসা যাক।

থানায় যাবার পথে শহরে কেমন আতঙ্ক বিরাজ করছে সেকথা জানালেন মৃণালবাবু। পর পর দুটি শিশুর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর পুরানো শোক তাজা হয়ে উঠেছে। তিনি অসম্ভব মনমরা ভাব নিয়ে আছেন। চৌধুরী ভয় পাচ্ছেন, আবার না তাঁর মানসিক বিকার দেখা দেয়।

থানাতেই পেরুমলকে পাওয়া গেল।

বাসবের আগমন সংবাদ তিনি আগেই পেয়েছিলেন। উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেসরকারী তদন্তের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। পেরুমল অবশ্য বাসবের নামের সঙ্গে অপরিচিত নন। তিনি সহর্ষে স্বাগত জানালেন তিনজনকে। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর কাজের কথা আরম্ভ হল।

বাসব পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখল। স্টেটমেন্টগুলোর উপর চোখ

বুলিয়ে নিয়ে বাসব বলল, দুটো খুন একই লোকের কাজ, কি বলেন ?

—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

—মোটিভ কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

—কিচ্ছু না। পেরুমল বললেন, অথচ জোরাল একটা মোটিভ নিশ্চয় আছে।

—আছে বইকি ! আমাদের প্রথমে হত্যাকারীর মোটিভ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভাল কথা, কাউকে সন্দেহ করছেন নাকি ?

—এখনও তেমন কোন লোক চোখে পড়েনি। সাধারণ মানুষের আবার বিশ্বাস, এই খুনের পিছনে সাঁওতালরা আছে।

কি রকম ?

—অনেকে বলছে, সাঁওতালরা ভোঁতা তীরের মুখে তাদের কোন বিশেষ ধরনের বিষ মাখিয়ে মেয়ে দুটোকে মেরেছে। আমরা তাই বিষয়টা ক্লাশিফাই করতে পারিনি।

—কিন্তু এরকম ধারণা করে নেবার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে ?

পেরুমল বললেন, কারণটা খুব জোরাল নয়, তবে সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হ্যাণ্ডলুম কর্ণারে যে পার্ক আছে, কয়েক বছর আগে আট দশ ঘর সাঁওতাল ওখানে বাস করত। তাদের একরকম জোর করে সরিয়ে দিয়ে পার্ক তৈরি করা হয়েছে। হয়ত সেই রাগের দরুণ শহরের লোকের ক্ষতি তারা করছে। আমরা এই ধারণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি না।

—হুঁ। বাদল মুখার্জীর বিষয়ে খোঁজ-খবর করেছিলেন নাকি ?

—ওঁকে অবলম্বন করেই তদন্ত যা কিছু হয়েছে। ভদ্রলোকের নিজের বলতে কেউ নেই। এখানে তামার খনিতে কাজ করেন। ভদ্র ও বিনয়ী হিসেবে সুনাম আছে। থাকেন হাজরা হাউসে আর—

সকলের উৎসুক দৃষ্টি পেরুমলের মুখের উপর।

—হাজরা হাউসের ওনার হেমলতা হাজরার মেয়ে কল্পনার সঙ্গে পুর্ণোদ্দমেই প্রেম-বিনিময় চালাচ্ছেন।

—ভেরি ইণ্টারেষ্টিং।

নিভে যাওয়া পাইপে বাসব অগ্নি সংযোগ করল।

আরো মিনিট কুড়িক কথাবার্তা বলার পর চায়ের পার্ট চুকিয়ে বাসব শৈবাল ও মিঃ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিল। ফেরার পথে বাসবকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখল শৈবাল। ওর এই ভাবের সঙ্গে শৈবাল পরিচিত। নিশ্চয় কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে—অন্যমনস্কভাবে তাই নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে এখন।

সন্ধ্যাবেলা গগন দত্ত, বিমলেন্দু কয়াল ও সনাতন চক্রবর্তী এলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাসব নতুন কিছু জানতে পারল না। ওঁরা তিনজন সৌজন্যসূচক ভাবে কথাবার্তা বললেও বাসবকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন মোটেই বুঝতে পারা গেল না।

ঘণ্টা খানেক বসে থাকার পর তাঁরা বিদায় নিলেন। বাসব সোফায় গা এলিয়ে অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করল। ওর এখন কথা বলার ইচ্ছা নেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। অগত্যা শৈবাল মায়াদেবী ও মৃণাল চৌধুরীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

মিনিট দশেক পরে বাসব একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল – আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, বর্তমানে এখানকার আদিবাসি সাঁওতালরা কি করে?

একটু অবাক হয়ে মৃণাল চৌধুরী বললেন, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না?

—মানে কি কাজকর্ম করে তারা?

—অধিকাংশই পাহাড় থেকে রাস্তা তৈরি করার জন্য যে পাথর কাটা হচ্ছে তাতেই কাজ করে। তাছাড়া চাকরের কাজও করে বাড়ি বাড়ি। এই তো, আমার বাড়ির চাকরটাই সাঁওতাল। ওদের কাজকর্ম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। শহরের গৃহিণীরা তাই চাকর হিসেবে ওদের পছন্দ করেন।

—এই শহর পত্তন হওয়ার ইতিহাস নিশ্চয় আপনি জানেন? বলুন না, শুনি—মৃণাল চৌধুরী যা জানতেন বললেন।

খাওয়া দাওয়ার পর বাসবের বিছানায় আশ্রয় নেবার আগ্রহ দেখা গেল না। আলো জেলে রেখেই ও পায়চারি করতে লাগল।

শৈবাল বলল, কি হে, তোমার শোবার এখন ইচ্ছে নেই নাকি?

—তোমার খুব ঘুম পাচ্ছে ডাক্তার?

—তেমন কিছু নয়।

—এস না কেসটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

শৈবাল উঠে বসল। গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে বলল, বেশ তো। তুমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ নাকি?

—এত তাড়াতাড়ি! আমি কি ভানুমতীর খেল জানি? তবে কেন জানি না মনে হচ্ছে কেসটা জটিল নয়। একটা বিরাট ফাঁক আছে সেটা দেখতে পেলেই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। যাক, সারাদিন আমার সঙ্গেই তো ছিলে, তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ কি?

—বিশেষ কিছু বুঝতে পেরেছি বললে বাড়াবাড়ি করা হবে। গোটা কয়েক মিল খুঁজে পেয়েছি।

—যেমন?

দুটো খুনই সন্ধ্যার মুখে হয়েছে। দুজনেই মেয়ে। দুটো ঘটনাই ঘটেছে পার্কের কাছে। দুজনে একই ক্লাবের সভ্যা। দুজনেই 'সুন্দর

দেখতে। দুজনকে একই ভাবে খুন করা হয়েছে।

—ব্রেভো ডাক্তার। তুমি আমার চিন্তাকে অনেকদূরে প্রসারিত করেছ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং একই লোক যে দুজনকে খুন করেছে এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হয়েছ।

—তুমি ?

—আমিও। আরো গোটা কতক কথা আছে। যেমন ধর, সাধারণ লোকে বলছে সাঁওতালরা বিষ মাখান তীর ছুঁড়ে মেরেছে। আমি বলব এই ধারণার মধ্যে কোন জোরাল যুক্তি নেই।

—তুমি অন্য কোন অনুমানের উপর নির্ভর করে এই যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পার না।

ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে পাউচ বার করল বাসব।

—উড়িয়ে না দিয়ে উপায় নেই। অত্যন্ত সঙ্গত যুক্তির উপরই নির্ভর করেছি। তুমি পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট পড়ে দেখেছিলে কি ? তাতে পরিষ্কার-ভাবে বলা হয়েছে, কোন বর্তুল আকারের ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। চামড়া গভীর ভাবে কেটে যায়নি। রক্তপাত হয়েছে নামমাত্র। এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে ? সঙ্গতভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে তীরের আঘাত নয়। তীর শরীরে গভীরভাবে বসে যাবার কথা—ফলা যদি ভোঁতাও হয়, তাহলেও আঘাত গুরুতর হবেই। তাছাড়া রক্তপাত বিশেষ হয়নি, এবিষয়টাও লক্ষ্য করতে হবে। সুতরাং কি ধরনের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল আমাদের তা আবিষ্কার করতে হবে।

—মোটিভটা কি আঁচ করতে পেরেছ ?

—না মোটিভের কথাই তো অবিরাম ভেবে চলেছি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, খুন দুটো কি রকম পরিস্থিতিতে ঘটেছে এ সম্পর্কে তুমি কিছু ভেবেছ ?

—না, তুমি— ?

—আমার অনুমান হল হত্যাকারীর সঙ্গে দুজনেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। জয়ার কথাই ধরা যাক—খেলাধুলো শেষ করে সে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। নির্জন পথ ধরে, পার্কের পাশ দিয়ে সে এগুচ্ছিল। সেই সময় হত্যাকারীর সঙ্গে দেখা। ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় এই সাক্ষাতে জয়া বিস্ময় বোধ করেনি। নানা রকম কথা বলতে বলতে হত্যাকারী তার পাশে পাশে চলতে থাকে এবং আচম্বিতে এক সময় আঘাত হেনে বসে। প্রশ্ন উঠতে পারে সেদিন রাস্তার নির্জনতা কোয়ান্সিডেন্স কিনা। আমার উত্তর হল, হত্যাকারী কয়েকদিন থেকেই চেষ্টা করছিল জয়াকে নির্জনে পাবার। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় কোন লোক না থাকায় সে কার্যোদ্ধার করতে পেরেছিল।

—কণার বেলায় একই ব্যাপার ঘটেছে বলতে চাও ?

—নিশ্চয়। এবার শুয়ে পড়া যেতে পারে। কাল ভোরে আবার উঠতে হবে। বাসব পাইপটা টেবিলের উপর রেখে ড্রেসিং গাউনটা খুলতে লাগল।

সাড়ে আটটার সময় ভৈরব হালদার এলেন। নামের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। অত্যন্ত সুশ্রী। ছোট-খাট মানুষ। দেখলে মনে হয় কোন সুন্দরী তরুণী বুঝি ধুতি পাঞ্জাবি পরে উপস্থিত হয়েছে। মৃণালবাবু বাসবের সঙ্গে ভৈরব হালদারের আলাপ করিয়ে দিলেন। বাসব বলল, আপনাকে এই ভাবে ডাকিয়ে আনিয়ে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না।

একগাল হেসে ভৈরব বললেন, মনে করবার কিছু নেই। আমার সহযোগিতায় আপনি যদি লাভবান হন সে আমাদের সৌভাগ্য। কি রকম দুশ্চিন্তা নিয়ে আছি তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ হবার দাখিল।

—জয়ার কথা নিয়েই আমি প্রশ্নের সূত্রপাত করতে চাই। মেয়েটির সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য আপনার জানা থাকলে বলুন?

—বিশেষ তথ্য বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝলাম না। তবে এটুকু বলতে পারি, কণা ও জয়া দুজনেই অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। মাঠে এসে তাদের আমি কোন দিন দুষ্টুমি করতে দেখিনি। বাধ্যও ছিল খুব।

—বিকেলে যে সময় ছেলেমেয়েরা খেলা করতে আসে, সে সময় তাদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও আসেন?

—সকলের নয়। দু'একজনের অভিভাবক সঙ্গেই আসেন। কণা বা জয়ার সঙ্গে কেউ আসত না।

—জয়া যেদিন খুন হয় সেদিন তার মনের অবস্থা কেমন ছিল—আপনি লক্ষ্য করেছিলেন?

ভৈরব হালদার এবার একটু তীক্ষ্ণ গলাতেই বললেন, সমিতির প্রতিটি ছেলেমেয়ের উপর আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। প্রতিদিনকার মত আমি সেদিনও জয়াকে লক্ষ্য করেছিলাম। সে অত্যন্ত হাসিখুশী। ফ্রগ গেমে সবচেয়ে বেশি পয়েণ্টও পেয়েছিল।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় কেউ তাকে নিতে এসেছিল?

—না।

কণার ক্ষেত্রে বোধহয় একই কথা প্রযোজ্য?

—হ্যাঁ।

—ধন্যবাদ মিঃ হালদার। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

মায়াদেবী ট্রেতে চা সাজিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

এলোমেলো ভাবে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা হবার পর ভৈরব হালদার বিদায় নিলেন। তখন প্রায় দশটা বাজে। বাসব হাই তুলল। আড়ামোড়া

ভেঙ্গে উঠে পড়ল সোফা থেকে।

—উঠলেন যে? মৃণাল চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

—ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একবার হাজরা হাউসে যাব ভাবছি।

—চিনে যেতে পারবেন তো? না আমি সঙ্গে যাব?

—ঠিক চিনে নিতে পারব। এই পাড়াতেই বাড়িটা। এস ডাক্তার—

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। গতকাল থানায় যাবার সময় হাজরা হাউস দেখেছিল। কাজেই বাড়িটা খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। কম্পাউণ্ডের মধ্যে পৌঁছে একজনের কাছ থেকে জেনে নিল হেমলতা হাজরা কোথায় থাকেন।

বাড়িতেই ছিলেন হেমলতা। কলিংবেল পুস করতেই বেরিয়ে এলেন। বাসব নিজের পরিচয় দিল। আগমনের উদ্দেশ্য জানাল।

হেমলতা নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আমার কাছে কেন এসেছেন!—আমি এ ব্যাপারে আর কি সাহায্য করতে পারি?

কথাবার্তা না বললে কিভাবে বুঝব আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন কি পারেন না!

—আমি আপনাকে বলছি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবে না। আমি কিছু জানি না।

আচ্ছা নমস্কার—।

—আমাকে অনর্থক কঠোর হতে বাধ্য করবেন না মিসেস হাজরা। আমাকে ফিরিয়ে দিলে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠবে। এখনও পুলিস আপনার কাছে আসেনি। এবার আপনাকে থানায় যেতে পুলিস বাধ্য করবে। আপনিও সেখানে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হবেন।

পুলিসের কথায় হেমলতার মুখের রং পাল্টাল।

তিনি শুধু বললেন, একি জুলুম।

—জানেন তো পুলিসে ছুঁলে আঠারো ঘা। সুতরাং—

—বলুন, কি জানতে চান?

বারান্দাতে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছিল। বাসব নির্বিকার মুখে একটা অধিকার করল। শৈবাল ও হেমলতা ওর পথ অনুসরণ করলেন।

—জয়া নামে যে মেয়েটি খুন হয়েছে, সে কি আপনার কাছে আসত?

—কেন, আমার কাছে আসবে কেন? তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

—তার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তার বাবার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এই রকমই যেন শুনলাম।

বাসব অপ্রিয় সত্যটা যে এই ভাবে বলে ফেলবে শৈবাল আশা করেনি।

হেমলতা তীব্র গলায় বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন?

—জটিল কিছু বলিনি। যা বলেছি, গত বিশ বছর ধরে কার্মানিচকের

সকলেই তা জানে। সনাতনবাবুর সঙ্গে অবশ্যইদানিং মন কষাকষি চলেছে আপনার। বাসবের কথা শেষ হল না। বাধা দিল এসে কল্পনা। তার আকস্মিক আগমন কেউ আসা করেনি।

—আপনারা কেন মাকে বিরক্ত করছেন। পুলিস যদি আমাদের হ্যারাস করে—করবে। আপনারা অনুগ্রহ করে এখন যান। এস মা, ভেতরে এস। কল্পনা এক রকম টানতে টানতে হেমলতাকে ঘরে নিয়ে গেল।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। হতভম্ব বাসব ও শৈবাল নেমে এল বারান্দা থেকে। রাস্তায় নেমে শৈবাল বলল, আমাদের এই সাক্ষাৎকার এমন নাটকীয়ভাবে শেষ হবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার প্রশ্নগুলো শালীনতার ধার ধারেনি।

—ওই মহিলাটি কি গত কুড়ি বছরের মধ্যে সামাজিক শালীনতার পরোয়া করেছেন? আসল কথা হল, আমি ওঁকে ভাল ভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখতে চেয়েছিলাম।

—তুমি কি ভাবে বুঝলে সনাতন চক্রবর্তীর সঙ্গে ওঁর এখন মনকষাকষি চলছে?

আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিলাম। লেগে গেল। কথাটা সত্যি না হলে হেমলতা চটে উঠতেন না।

—তুমি কি মনে কর, সনাতন চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায়, রাগে জ্ঞান হারিয়ে হেমলতা এই কাজ করেছেন। যদি তাই হবে তবে কণা মারা গেল কেন?

—আমার ধারণা ওপথে চালিত হয়নি ডাক্তার। আমি ভাবছি—থাক, এখন ও-কথা। চল, থানায় যাওয়া যাক।

—বাদলবাবুর সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন তিনি নিশ্চয় অফিস বেরিয়ে গেছেন। পরে দেখা করা যাবে।

ওরা থানা ঘুরে বাসায় ফিরল।

সমস্ত শুনে মৃণাল চৌধুরী বললেন, আশ্চর্য তো।

মায়াদেবী পান সাজছিলেন।

বললেন, মিসেস হাজরার সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার দেখা হয়েছিল। তখন তো উনি খুন দুটোর সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। আপনার সঙ্গে এ ভাবে কথা বললেন কেন বুঝলাম না।

—আমার মনে হল, ওঁর মেয়ে যেন কোন কিছুর উপর ধামা চাপা দিতে চাইছে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, মিঃ চৌধুরী, খুন দুটো যেখানে হয়েছিল বিকালে আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন তো!

—বেশ।

প্রায় পাঁচটার সময় মৃণাল চৌধুরী দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলেন। দুর্ঘটনার স্থল তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র মিনিট দুয়েকের পথ। স্থানটা একেই নির্জন, খুনোখুনির পর আরো নির্জন হয়ে উঠেছে।

বাসব চারিধার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। চোখে পড়বার মত বিশেষ কিছু যে ছিল না তা নয়। মিঃ চৌধুরী দেখিয়ে দিলেন কোথায় পড়েছিল মৃতদেহ দুটো। ঘাসের আস্তরণ বিছান জায়গাটা এখন শুধু মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

বাসব অন্যমনস্কভাবে বলল, ওই সেই পার্কটা না—যে জায়গাটা আগে সাঁওতালদের ছিল?

চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ! আসুন না—

তিনি অগ্রসর হলেন। বাসব ও শৈবাল তাঁকে অনুসরণ করল। পার্কের মধ্যে প্রবেশ করে, কয়েক পা অগ্রসর হবার পরই বিশেষ একটা দৃশ্য তিনজনের চোখে ধরা দিল। অর্কিডের ঝোপের পাশে কল্পনা একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ট আলাপে মত্ত।

চাপা গলায় চৌধুরী বললেন, বাদল মুখার্জী।

এবার ওদের দৃষ্টি তিনজনের উপর পড়ল। কল্পনা নিম্ন গলায় কি বলল বাদলকে। তারপর দ্রুত পায়ে স্থান ত্যাগ করল। বাসব সঙ্গী দুজনকে পিছনে ফেলে গিয়ে দাঁড়াল বাদলের সামনে। বাদল একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

বাসব বলল, আমার পরিচয় বোধহয় কল্পনাদেবী আপনাকে দিয়ে গেলেন। যা হোক, গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয় আপত্তি নেই।

—কি জানতে চান বলুন?

—আপনার অভিজ্ঞতার কথাটা একবার বিশদভাবে বলুন তো?

পুলিসের কাছে যা বলেছিল, বাদল সবিস্তারে তাই বলে গেল।

—এ সমস্ত কথা আমি জানি মিঃ মুখার্জী। নতুন কিছু বলুন।

-যা বললাম, তাছাড়া আমার তো কিছুই জানা নেই।

বাসব বসে পড়ল বাদলের পাশে।

—আপনি অফিস থেকে ফিরে এসে প্রতিদিন সন্ধ্যার মুখে বেড়াতে বেরোন?

—মাঝে মাঝে বেরুতে হয়।

—মাঝে মাঝে যখন তখন প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূলে না থাকলে নিশ্চয় বেরুবার প্রয়োজন বোধ করেন না?

—তাতো বটেই।

বাসব মৃদু হেসে বললে, অথচ সেই দুর্যোগের বিকেলে আপনি বেরিয়েছিলেন। পুলিসকে বলেছেন, বেড়াতে বেড়াতে পার্কে যাওয়ার পথে জয়ার

মৃতদেহ আপনি আবিষ্কার করেন। মিঃ মুখার্জী, এখন সত্যি কথাটা বলবেন কি ?

বাদল চুপ করে রইল।

—চুপ করে থাকলে পরিস্থিতির গুরুত্ব কমে যাবে একথা ভাববেন না কিন্তু।

—দেখুন·· সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার· তার সঙ্গে····

—তবু আমার জানা দরকার। বলুন ?

—আপনি যা ভাবছেন—তেমন কিছুই আমি জানি না—অর্থাৎ····

—এই হেজিটেশানই আপনাকে জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে নিয়ে যাবে। পুলিস আপনাকে সন্দেহ করছে একথা বোধহয় জানা নেই। আমাকে সমস্ত খুলে বলুন, কথা দিচ্ছি পুলিসের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমার।

বাদল একটু চুপ করে থেকে, একটু ইতস্ততঃ করে বলল সমস্ত কথা। কল্পনার চিৎকার এবং পালিয়ে যাওয়ার কথাও বাদ দিল না। বাসব পাইপ ধরিয়েছে ইতিমধ্যে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আপনি পরে কল্পনা-দেবীকে প্রশ্ন করেননি, কেন তিনি চিৎকার করেছিলেন ?

—করেছিলাম।

—কি উত্তর পেয়েছেন ?

—জয়াকে ওই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল।

—কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি না। জয়া মাটিতে পড়েছিল। সে মরে যাওয়ার পরিবর্তে আহত হয়ে পড়ে আছে—এই সঙ্গত প্রশ্নই মানুষের মনে প্রথমে জাগা সম্ভব। অথচ উনি জয়াকে সাহায্য করার চেষ্টা না করে আর্ত চিৎকার তুলে পালিয়ে গেলেন। এর পরও কি ওর উক্তিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কি বলেন আপনি ?

—আমি—আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—চিৎকার করে ওঠার বিশেষ অর্থ আছে একথা ধরে নেওয়া যায় না কি ? বাদল চুপ করে রইল।

এতক্ষণে কথা বলল শৈবাল।

তোমার কি ধারণা, কল্পনাদেবী এমন কিছু দেখেছিলেন যার জন্য চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন।

—একজ্যাক্টলি ডাক্তার। এখন আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে উনি কি দেখেছিলেন। হয়ত এই বিশেষ দৃশ্য এই রহস্যের চাবিকাঠি।—আপনাকে ডিস্টার্ব করবার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ মুখার্জী। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

বাসব পার্কের গেটের দিকে অগ্রসর হল।

বাড়ি ফিরে ক্রেডেল থেকে রিসিভার তুলে নিল বাসব।

থানার সঙ্গে যোগাযোগ হতেই প্রশ্ন করল, ইন্সপেক্টার পেরুমল কথা বলছেন কি ?

ও প্রান্ত থেকে পেরুমলের গলার শব্দ পাওয়া গেল, কথা বলছি। আপনি—?

—আমি বাসব। একটা বিষয় মনে করতে না পারায় আপনার স্মরণ নিলাম। পোষ্টমর্টমের রিপোর্টে ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা ছাড়া আর কোন আঘাতের কথা উল্লেখ আছে কি ?

—আছে। দুজনেরই গলা টিপে ধরা হয়েছিল। গলায় চাপের দাগ আছে।

—ধন্যবাদ। আগামীকাল দেখা হবে।

বাসব লাইন কেটে দিল।

মৃণাল চৌধুরী বললেন, আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনি—

অনেক কিছু জেনে ফেলেছি—বাসব মৃদু হেসে বলল, সত্যি কথা বলতে কি—মারাত্মক রকমের কিছুই এখনও জানতে পারিনি। তবে অচিরেই পারব এ বিশ্বাস রাখি। ভাল কথা, একবার মৌরিয়াকে ডেকে পাঠান তো।

মৌরিয়া বাড়ির সাঁওতাল চাকর। ডাকা হল তাকে।

প্রৌঢ় মৌরিয়া এসে দাঁড়াতেই বাসব বলল, কাল সকালে আমাকে তোমাদের পল্লীতে নিয়ে যেতে পার ?

—পারি বাবু। কিন্তু—

—ভয় নেই। তোমার বাবু, কাল তোমাকে একবেলার ছুটি দেবেন। এখন যাও। বিস্মিত মৌরিয়া চলে গেল।

—সাঁওতালদের পল্লীতে গিয়ে কি করবে ? শৈবাল প্রশ্ন করল।

—বিশেষ কোন পরিকল্পনা নেই। শুধু ওদের একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবার ইচ্ছা আছে।

মৃণাল চৌধুরী বললেন, আপনি এখানে পা দেবার পর একটা লাভ হয়েছে—আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

—সেটা আমার জন্য হয়েছে কি, লোকে সতর্ক হয়ে উঠেছে বলে আর দুর্ঘটনা ঘটছে না, বলা কঠিন।

শৈবালের ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে সাতটার সময়। চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসে সে বাসবকে নিজের পাশে দেখতে পেল না। মনে পড়ে গেল মৌরিয়ার সঙ্গে আজ সাঁওতাল পল্লীতে যাবার কথা ছিল। ওর রাগও হল একটু, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে কি ক্ষতি হত ?

জলখাবার পর্বের পর শৈবাল ড্রইংরুমে গিয়ে বসল। মৃণাল চৌধুরী ও কিঙ্করের সঙ্গে খাবার গল্প করে কাটানো ছাড়া এখন আর কি করবার

আছে? মায়াদেবী সুপুরির পাত্র ও জাঁতি নিয়ে এসে বসলেন। মেয়ে মারা যাবার পর, ভাগনে কিংকরকে অবলম্বন করেই দুজনে আছেন।

বাসব এল প্রায় সাড়ে ন'টার সময়।

চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, এত দেরি হল আপনার?

আর বলেন কেন, থানা ঘুরে আসতে হল কিনা।

—কোন সূত্র পেলেন ওখানে?

—পেয়েছি বইকি! আজ সন্ধ্যার সময় ইন্সপেক্টারের কোয়ার্টারে সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রিত হতে হবে। আমি তখন কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করতে পারব।

পেরুমলের কোয়ার্টার থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে।

সন্ধ্যা হবার কিছু আগে থেকেই একে একে সকলে উপস্থিত হতে লাগলেন। সকলকে ইন্সপেক্টার সংবাদ দিয়েছিলেন। একমাত্র হেমলতা ছাড়া কারুর আসতে আপত্তি দেখা দেয়নি। সনাতন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে সকন্যা ওখানে যাওয়াটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু পুলিসও ছাড়বার পাত্র নয়, কাজেই শেষ পর্যন্ত সম্মত না হয়ে উপায় ছিল না।

প্রথমে এলেন গগন দত্ত, তারপর বিমলেন্দু কয়াল, সনাতন ও কণার বাবা কমলেশ রায় এক সঙ্গে এলেন। গম্ভীর মুখে বাদলও এসে উপস্থিত হল, মৃণাল চৌধুরী ও মায়াদেবী এলেন, মুখে অমাবস্যা এঁকে এলেন সকন্যা হেমলতা হাজরা। বাসব ও শৈবালের দেখা নেই কিন্তু। সকলের সঙ্গে পেরুমলও ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলেন। এত বিলম্ব হবার তো কথা নয়। ওরা এল সকলের উপস্থিত হবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

বাসব সলজ্জ হেসে বলল, অনেকক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রেখেছি, ক্ষমা করবেন।

পেরুমল বললেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

—একটা ছোট্ট পরীক্ষা সারতে দেরি করে ফেললাম। ওই পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই এই হত্যা-তদন্তের সমস্ত কিছু নির্ভর করছিল। আপনারা শুনলে নিশ্চয় আনন্দিত হবেন, জয়া ও কণার হত্যাকারী কে আমি তা জানতে পেরেছি।

ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল।

বাসব সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমার সুনামের কথা হয়ত অনেকেই আগে শুনেছিলেন, মিঃ চৌধুরীও হয়ত অনেক প্রশংসা করে থাকবেন—আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীকে ধরে ফেলব এই ধারণাও কেউ কেউ করে থাকবেন। তাতে আমার উপর অবিচার করা হয়েছিল।

আমি ভগবান নই, এমন কি যোগবিদ্যাও আমার জানা নেই। সেকালের সাধুরা চোখ বন্ধ করে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারতেন, এখনকার দিনে তা সম্ভব নয়! কোন রহস্যের সমাধান করতে গেলে আমাকে নির্ভর করতে হয় তথ্য ও তত্ত্বের উপর। সুতরাং কিছু বেশি সময় লেগে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যাক, এবার আসল কথায় আসা যাক। বহুদিন আগে একটা কবিতা পড়েছিলাম। কবি এক জায়গায় লিখেছিলেন, নিশির শিশির ঝরে পড়ে হয়ত সম্পূর্ণ নিজের অনিচ্ছাতেই।

নিশির শিশিরের মতই জয়া ও কণা তাদের অনিচ্ছাতেই ঝরে পড়ল। কে এই কাজ করেছে? কেনই বা দুটি সুন্দর শিশুর জীবন এই ভাবে নষ্ট করা হল?

আপনারা জানেন অকারণে কোন কাজ হয় না। হত্যার পিছনে মোটিভ থাকতেই হবে। মোটিভ নানা ধরনের হতে পারে--কখনও স্বার্থগন্ধা আবার কখনও মনস্তাত্ত্বিক। এখানকার হত্যা দুটি কোন স্থূল মোটিভকে অবলম্বন করে নয়, হত্যাকারীর মানসিক বিকারের শোচনীয় পরিণতি। মানুষ সব সময় যে লাভ লোকসানের ক্ষতিয়ান দেখে হত্যাকাণ্ড সাধন করে না, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এখানকার মর্মন্তুদ ঘটনা দুটি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি এখানে এসে বাধার সৃষ্টি না করলে আরো গুটিকয়েক শিশুর জীবনান্ত ঘটত অবধারিত ভাবে।

ঘটনাটি কি ভাবে গড়িয়েছিল তার মোটামুটি অনুমান এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। খেলাধুলা শেষ হতেই প্রায়ই অন্ধকার হয়ে আসে। সেদিন তাই হয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে জয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার একজন অতি পরিচিতর সঙ্গে। গল্প করতে করতে দুজনে অগ্রসর হল। জয়া বরং আশ্বস্তই হয়েছিল এই ভেবে যে পার্কের সামনেকার প্রায় অন্ধকার পথটুকু আজ আর তাকে একা অতিক্রম করতে হবে না। নির্জন পার্কের কাছাকাছি আসতেই আচম্বিতে হত্যাকারী দু'হাত দিয়ে জয়ার গলা চেপে ধরে। তারপর নিজের অদ্ভুত অস্ত্র ফুটিয়ে তাকে হত্যা করে। কণার বেলাতেও ওই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

বাসব থামল। পিনড্রপ সায়লেন্স বলতে যা বোঝায় ঘরের অবস্থা সেই রকম। সকলে ভাবলেশহীন মুখে বক্তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল, হত্যাকারী আমাদের মধ্যে এই ঘরে উপস্থিত। তাকে চিনিয়ে দিতে আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করছি। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কল্পনাদেবী আশাতীত সাহায্য করতে পারবেন। তিনি সে দিন পার্ক থেকে বেরিয়ে বোধহয় একটা হত্যাকাণ্ড সচক্ষে দেখেছিলেন এবং হত্যাকারীকেও। অনুগ্রহ করে সমস্ত কিছু তিনি এখন বলবেন কি?

কল্পনা শুকনো মুখে চুপ করে রইল।

ইন্সপেক্টার বললেন, চুপ করে থাকবেন না মিস হাজরা। বলুন—

—আমি—আমি তো—

—আপনাকে যে কোন ভাবে আমরা বাধ্য করব তা নিশ্চয় আপনি চাইবেন না। বলুন—এই মর্মান্তিক ব্যাপারের উপর যবনিকা পড়ে যাক।

সনাতন চক্রবর্তী বললেন, চুপ করে থেকো না কল্পনা। বল, তুমি কি দেখেছিলে?

কল্পনা দ্রুত গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমি যা দেখেছিলাম তাতে কোন সত্যতা নেই।

বাসব বলল, তবু আপনাকে বলতে হবে। দেরি করবেন না কারণ সাড়ে নটার ট্রেনটা আমার ফেল করলে চলবে না।

সবিস্ময়ে মৃণাল চৌধুরী বললেন, আপনি আজই চলে যাবেন?

—হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরী। আমরা মালপত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। বারান্দায় রাখা আছে।

—আমি—আমি মাকে দেখেছিলাম—

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

চিৎকার করে উঠলেন হেমলতা হাজরা, কি বলছ কল্পনা! আমাকে—আমাকে তুমি দেখেছিলে?

—আমার মনে হল, আমি যেন—তোমাকে তো আগেই সেকথা বলেছিলাম মা। কথাটা শেষ করেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল কল্পনা।

কি দেখেছিলেন আপনি?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কল্পনা বলল, আর আমায় কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি আর কিছু বলতে পারছি না।

বাসব বলল, আমার মনে হয়েছিল, আপনি প্রকৃত সত্যকেই বুঝি চোখের সামনে দেখেছিলেন। পার্ক থেকে বেরিয়ে আপনি দেখতে পান, একজন মহিলা একটি বাচ্চাকে আহত করবার চেষ্টা করেছে। পিছন থেকে মনে হয়েছিল, মহিলাটি আর কেউ নয়, আপনার মা। অপ্রিয় সত্যটা এবার আমাকেই বলতে হচ্ছে। ইন্সপেক্টার আমাকে বলেছিলেন, অনেকের ধারণা, এই ব্যাপারে সাঁওতালদের হাত আছে। প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও পরোক্ষভাবে যে আছে প্রমাণিত হয়েছে। মিঃ চৌধুরীর চাকর মোরিয়াকে একটু নেড়েচেড়ে দেখতেই এ-সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। মোরিয়া বলেছে, বুনো শুয়োর, পাগল কুকুর ও শেয়াল মারার জন্য তারা বিশেষ এক ধরনের বিষ ব্যবহার করে। তীরের ফলায় প্রথমে সাপলা পাতার রস মাখিয়ে নেওয়া হয়, তারপর ফলাটাকে গরম করে নিয়ে লিকুইড পাথুরে-চুণে ডুবিয়ে নিলেই মারাত্মক অস্ত্রের জন্ম হল। এর এক খোঁচায় যে কোন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা

যাবে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে এই বিষ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা সম্ভব হয়নি। সাপলা গাছ এখানে প্রচুর, পাথুরে চুণ অতি সহজলভ্য, কাজেই হত্যাকারী মারণ অস্ত্র তৈরি করেছে সহজেই। তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, হত্যাকারী কোন তীক্ষ্ম অস্ত্র ব্যবহার করেনি। ভোঁতা গোছের কিছু দিয়ে কাজ সেরেছে। সেই ভোঁতা অস্ত্রটি কি ?

বাসব চুপ করল। সকলের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ওর মুখের উপর নিবদ্ধ। ও পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক বার করল। মোড়ক খুলতেই সকলে দেখলেন একখানা জাঁতি। জাঁতিটা ইন্সপেক্টারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, সাবধানে নেবেন, এতে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে। এর দু'ধারের হাতল তীরের চেয়ে ভোঁতা হলেও, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্মতা আছে। ওই হাতলে বিশেষ ধরনের বিষ মাখান রয়েছে। এখুনি কাউকে ফুটিয়ে দিলে বোধহয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন। হত্যাকারী কে আপনারা অনেকে বুঝতে না পারলেও, মৃণালবাবু নিশ্চয় পেরেছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, মায়াদেবীর মত মার্জিতা মহিলা মনস্তত্ত্বের নাগপাশে পড়ে জয়া ও কণাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মৃণাল চৌধুরীর মুখ দেখে মনে হয়, তিনি বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁছেছেন। অনড় হয়ে বসে আছেন মায়াদেবী। তাঁর দৃষ্টি বোধহয় মেঝের উপর কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মৌরিয়া আমাকে একথাও বলেছে যে, কথার ছলে সে একদিন এই বিষের কথা মায়াদেবীকে বলেছিল। তার একটি মাত্র মেয়ে আগুনে পুড়ে যাবার পর তিনি মনের দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না। প্রতিদিন মাঠে সুন্দর সুন্দর মেয়েকে খেলা করতে দেখতেন। মন্দিরা বেঁচে থাকলে সেও এখানে খেলতে পারত। ওদের মায়ের মত মনকেও ভরিয়ে রাখতে পারত। অজস্র বিকার মায়াদেবীকে অধৈর্য করে তুলল। ঠিক এই সময় নিশ্চয় মৌরিয়ার মুখ থেকে জানতে পেরেছিলেন বিষের কথাটা। বিকার প্রতিহিংসায় পরিণত হল। তাঁর বুকে যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুন তিনি আরো অনেকের বুকে জ্বালতে চান। আপনারা চিন্তা করে দেখুন মানুষের মনের গতি সময় সময় কত নিম্নগামী হতে পারে। মৌরিয়ার কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই আমি আলো দেখতে পেলাম। এবং অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে মায়াদেবী জাঁতির সাহায্যেই কার্যোদ্ধার করেছেন। জাঁতিটা তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। চৌধুরী সম্প্রতি এখানে চলে আসার পর আমার বিলম্বে আসার কারণ হল জাঁতিটা সংগ্রহ করে আমি তার রাসায়নিক পরীক্ষা করেছি। আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত একচুল এধার ওধার হয়নি। সেদিন কল্পনাদেবী অন্ধকার থাকায় বুঝতে পারেননি, আসলে তিনি হেমলতা-দেবীকে দেখেননি—দেখেছিলেন মায়াদেবীকে। ঘরের আলো অকারণে

নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। মায়াদেবী নড়ে চড়ে বসলেন। তাঁর মুখে কোন প্রতিবাদ বাজল না। ভবিষ্যতে বাজবে বলেও মনে হচ্ছে না।

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। গিয়ে দাঁড়াল মৃণালবাবুর সামনে। নরম গলায় বলল, আপনি আমাকে না ডাকলেই ভাল করতেন মিঃ চৌধুরী। আপনার আতিথ্য নিয়ে আপনারই দুঃখের কারণ হলাম।

মৃণাল চৌধুরী কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। জলে তাঁর দু'চোখ চকচকিয়ে উঠল।

—ইন্সপেক্টার, আপনি নিশ্চয় পরের পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমি চলি। এস ডাক্তার—

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। শৈবাল অনুসরণ করল ওকে।

ভয়াল কিউলান

বাড়িটার নাম 'পামগ্রোভ'।

বেশ নাম। মহিমারঞ্জনের নামটি বেশ পছন্দ হয়েছে। পামএভিনিউ-এ এর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি ছিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে গেলে 'রিজেন্টকেভ'-এর কথাই বলতে হয়। তবু, শুধু সুন্দর নামের জন্যই 'পামগ্রোভ'কে পছন্দ করেছিলেন মহিমারঞ্জন।

এ বছর যে তিনি কলকাতা ছেড়ে বেরতে পারবেন তার কোন স্থিরতা ছিল না। কিছুদিন ধরে কাজের অত্যন্ত চাপ যাচ্ছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস যতই এগিয়ে আসতে লাগল, এই জনারণ্য থেকে কিছুদিন সরে থাকবার জন্যে মনের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিতে লাগল তত বেশি করেই।

গত পনের বছর ধরে প্রত্যেক সেপ্টেম্বর মাসে দলবল নিয়ে ভারতের কোন-না-কোন প্রান্তের উদ্দেশে পাড়ি দিয়ে আসছেন মহিমারঞ্জন। মাসখানেক ঘোড়িয়ে, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আবার গতানুগতিক জীবনে ফিরে এসেছেন। বলতে গেলে এই বেড়াতে বেরনোটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। এবার কাজের চাপ ছিল অত্যন্ত বেশি।

বিমর্ষভাবে নিশিকান্তকে বলেছিলেন, এবার আর বেরুতে পারলাম না।

নিশিকান্ত রায় মহিমারঞ্জনের ঘনিষ্ট বন্ধু।

কেন, বেরুতে পারবে না কেন?

দেখছ তো, কি রকম কাজের প্রেসার। আবার রুমানিয়ান এক্সপার্টদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ওই সেপ্টেম্বর মাসেই। কি করা যায় বল তো?

মৃদু হেসে নিশিকান্ত উত্তর দিলেন, এ তো খুবই ভাল লক্ষণ। কাজের চাপ মানেই তো তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হু-হু করে বেড়ে যাওয়া। এক বছর বেড়াতে নাই-বা গেলে!

শেষ পর্যন্ত এছাড়া উপায়ই বা কি। কিন্তু মনের রিক্রিয়েশন তো চাই, সারাটা বছর কাজে যুতে থাকলে তো চলবে না।

অবশ্য আলোর সন্ধান পাওয়া গেল আগস্ট মাসে। কাজের চাপ কমে গেল অভাবনীয় ভাবে। শুধু তাই নয়, সংবাদ পাওয়া গেল, রুমানিয়ান এক্সপার্টরা অনিবার্য কারণে সেপ্টেম্বরে ভারতে আসতে পারছেন না। তাঁদের আসতে নভেম্বর হয়ে যাবে। মহিমারঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আর কোন বাধা রইল না।

এরপর প্রশ্ন হল কোথায় যাওয়া হবে?

অনেকে অনেক জায়গার নাম করলেন। একটি নামও পছন্দ হল না তাঁর।

এই সমস্ত জায়গায় ঘুরে আসা হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার দুবার গেছেন। ভাস্কর শেষ পর্যন্ত নাম করল রন্‌গাঁও-এর। রন্‌গাঁও-এর নাম খুব অল্প লোকই জানে। প্রখ্যাত শৈলনগরগুলির মত আভিজাত্যের আবরণে এখনো ঢাকা পড়ে যায় নি এই মনোরম স্বাস্থ্যকর জায়গাটি।

ভাস্কর মহিমারঞ্জনের ভাগ্নে। তাঁরই কাছে থেকে লেখাপড়া শিখেছে। এখন তাঁর ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। সুরূপ ও বিনয়ী ভাস্করকে মহিমারঞ্জন পছন্দ করেন। গত বছর ভাস্করের এক বন্ধু রন্‌গাঁও গিয়েছিল বেড়াতে। ফিরে এসে সে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তার মতে উটি, মাউণ্ট আবু বা পাঠানকোটের চেয়ে নৈসর্গিক শোভা এখানে অনেক বেশি। ওখানে যাওয়াই স্থির হয়ে গেল।

কাঠগুদাম যেতে গেলে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে যেমন লক্ষ্ণৌ গিয়ে নামতে হয় প্রথমে, তারপর ওখান থেকে বাসে যেতে হয় বাকি পথ, রন্‌গাঁও যেতে গেলে তেমনি ওই একই ব্যবস্থা। শুধু বাসের পথ কাঠগুদাম যাবার বিপরীত দিকে।

তোরজোড় করে সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখেই মহিমারঞ্জন বেরিয়ে পড়লেন। দলটি মন্দ হল না। নিশিকান্ত তো আছেনই। তাছাড়া অংশুমান, ভাস্কর, সুকুমার দত্ত আর সুজাতা!

অংশুমান মহিমারঞ্জনের ছেলে। অংশুর জন্মমুহূর্তেই মহিমারঞ্জন তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন। পরে আর বিয়ে করেন নি তিনি। অতি যত্নে ছেলেকে মানুষ করেছেন, ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে তাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। সে এখন তাঁর ব্যবসায়ের অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সুকুমার দত্ত বিজনেস-পার্টনার। আর সুজাতা - সুজাতার কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। আলোচনা করতে হয় মহিমারঞ্জনের জীবনের ওঠা-পড়ার ইতিহাস নিয়ে।

মহিমারঞ্জন হালদার সোনার চামচ মুখে দিয়ে না জন্মালেও, কোন হা-ঘরে এসে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন নি। তাঁর বাবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। বড়বাজারে লোহার একটা দোকান ছিল তাঁর। ব্যবসাদার হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল, কিন্তু উচ্চ আশা ছিল না।

লেখাপড়া বিশেষ করতে পারলেন না মহিমারঞ্জন। দোকানে এসে বসলেন। তারপর সেই ছোট দোকান থেকে বছর কুড়ির মধ্যে কিভাবে বিরাট আয়রন ফাউণ্ড্রি করলেন, তার ক্লান্তিকর বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, 'পুরুষস্য ভাগ্যং' কথাটার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন মহিমারঞ্জন হালদার।

স্ত্রী গত হবার পর বছর দশেক মেয়েদের নিয়ে কোনরকম চিন্তা তাঁর মনে স্থান পায় নি। অনেক লোভনীয় বিয়ের প্রস্তাবকে তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন। নিজের মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন ব্যবসায়। কিন্তু সময় একরকম যায় না। একদিন মহিমারঞ্জনের পা হড়কাল।

আয়রন ফাউণ্ড্রি স্থাপন করবার সময় সুকুমার দত্তের সহযোগিতা তাঁকে নিতে হয়েছিল। বড়বাজারের লোহাপট্টিতে সুকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়। ব্যবসায় তখন বেশ জমজমাট ভাব।

সুকুমার বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমার এখানে আসুন না, একটু খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

কিছুদিন থেকে মহিমারঞ্জন লাল-জলের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিন কারখানা থেকে ফিরে ভ্যাট সিক্সটি নাইনের আধবোতল শেষ করতে না পারলে তেমন মেজাজ পেতেন না। সুতরাং এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুকুমার দত্তের বাড়িতেই দেখা হল কেতকী রায়ের সঙ্গে। সোসাইটির রাণী কেতকী রায়কে প্রথম দর্শনেই মহিমারঞ্জন তীব্র আবেগ অনুভব করে হৃদয় হারালেন।

মাসখানেক কেতকীকে নিয়ে তাঁর সময় ভালই কাটলো। তবে তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। বহুবল্লভা নারী একটি পুরুষের ছায়ায় থাকতে চায় না—থাকতে পারে না। কেতকী একদিন কেটে পড়ল।

এদিকে মহিমারঞ্জনের নেশা ধরে গেছে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। টাকা যখন আছে চিন্তা কিসের! আবার সংগ্রহ হল। দু-চারদিন পরে তাকে বাদ দিয়ে নতুন একজনকে আবার আমদানী করা হল। এইভাবে নতুনত্বের স্বাদ নিতে নিতে তাঁর সময় কাটতে লাগল।

নিশিকান্ত একদিন বললেন, কি করছো কি? ছেলে বড় হয়েছে, এখন এইভাবে তোমার জীবন কাটান কি উচিত!

বুঝি তো সবই ভাই। কিন্তু—

বিয়ে কর না।

বিয়েতে আমার রুচি নেই। বাঁধা জীবন ভাল লাগে না। তবে যদি একটি সুন্দরী, অনুগত মেয়ে পাওয়া যায়, তাহলে এখানে-ওখানে চরে বেড়ানোর অভ্যাস হয়ত ছাড়তে পারি।

দিন দুয়েক পরে নিশিকান্ত একটি মেয়ের সন্ধান দিলেন। কলেজে পড়বার সময় প্রেম করে একটি ছেলের সঙ্গে বাড়ি ছেড়েছিল। ছেলেটি কিছুদিন পরে সরে পড়ে। দু-কূল হারিয়ে মেয়েটি অনেক ঘৃণ্য পথ ঘুরে এখন এক হোটেলে কাজ করে। নাম সুজাতা। সুজাতাকে মহিমারঞ্জনের পছন্দ হল। চাকরি ছাড়িয়ে তিনি তাকে এনে তুললেন রয়েড্ স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাটে।

বছর আড়াই কেটে গেছে তারপর। সুজাতার প্রতি একাগ্র আছেন

মহিমারঞ্জন।

ব্যাপারটা অংশুমানের অজানা নয়। সে কোনদিন এ-সম্পর্কে কোন কথা বাবাকে বলেনি। কি হবে বলে, অশান্তি দেখা দেবে। তাছাড়া এতে তো অংশুমানের কোন ক্ষতি নেই, বাবা তাকে আগেকার মতই স্নেহ করেন। তার নির্দেশেই এখন ব্যবসা চলে। সে সুজাতার ব্যাপারটা চমৎকারভাবে মানিয়ে নিল। এমন কি সুজাতার সঙ্গে কথা বলবার সময়ও উপেক্ষা বা অবজ্ঞার ভাব সে প্রকাশ করে না।

গত দু-বছর বেড়াতে যাবার সময় অংশুমানের সঙ্গে সুজাতার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সুজাতাও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছে।

লক্ষ্মৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর ওঁদের দলের একজন লোক বাড়ল। ভিড় ঠেলে অপরূপ সরকার এগিয়ে এলেন মহিমারঞ্জনের কাছে। দুজনের চোখেই বিস্ময়।

অপরূপ সরকার বললেন, কোথায় চলেছেন? রাণীক্ষেত নাকি?

না, রনগাঁও যাব। আপনি?

রাণীক্ষেত। রনগাঁও জায়গাটার নাম মাঝে মাঝে শুনেছি বটে। ঘুরে আসতে হবে পরে এক ফাঁকে।

পরে কেন?—মহিমারঞ্জন বললেন, আমাদের সঙ্গেই চলুন। নিরিবিলিতে ক'টা দিন ভালই কাটবে। তাছাড়া এখন সিজন টাইম, রাণীক্ষেতে গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাই হয়ত পাবেন না।

আরো দু'চার কথার পর অপরূপ রাজি হয়ে গেলেন। টিকিট ক্যানসেল করে ওঁদের সঙ্গে এলেন রনগাঁও-এ। অপরূপ সরকার কলকাতার বিখ্যাত কোন এক কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে গোলমাল হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সাহিত্য-সাধনা করেন। তাঁর তথ্যমূলক রচনাগুলি পাঠকদের মনে সব সময় সাড়া জাগিয়ে থাকে। মহিমারঞ্জনের সঙ্গে আলাপ একপাড়ার অধিবাসী হওয়ার জন্যে।

পামগ্রোভে সংসার গুছিয়ে নেবার পর সকলে বেরিয়ে পড়েছিলেন রনগাঁও এর প্রাথমিক পরিচয় নিতে। অপূর্ব জায়গা। যেদিকে তাকানো যায়—পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়গুলি গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ের ওপর ছাড়া, তরাই অঞ্চলেও দেওদার, পাইন আর ফারের সমারোহ। কত বছরে এই নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে কে জানে।

লোকালয়ের বিস্তার খুব বেশি নয়, টেনেটুনে হাজার দুয়েক লোক বাস করে বোধহয় এখানে। বাড়িগুলির চেহারা দেখলেই বুঝতে পারা যায়

অধিবাসীরা বেশ সঙ্গতিপন্ন। যাত্রীদের জন্যে এখনও কোন হোটেল গড়ে ওঠেনি। তবে থাকার জন্যে কিছু বাড়ি পাওয়া যায় বা কোন বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকা চলে।

বেড়িয়ে ফেরার পথে এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তিনি একটা ওয়ালনট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে লালচে রঙের এক জাতীয় পোকা চিমটে দিয়ে ধরে বোতলে পুরছিলেন। ওঁদের বাংলায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসতে দেখে, উনি যেচে আলাপ করলেন।

ভদ্রলোকের নাম চিত্তরঞ্জন সেন। বছর দশেক এখানে আছেন। পোকা-মাকড় নিয়ে গবেষণা করছেন। আশা আছে, দুরারোগ্য কতকগুলি রোগের ওষুধ এদের নির্যাস থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। আগে তিনি বোম্বের একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কেমিস্ট ছিলেন। মহিমারঞ্জন সাগ্রহে তাঁকে পামগ্রোভে আমন্ত্রণ জানালেন।

বললেন, বিকেলেই আসুন, বাড়ির সকলকে নিয়ে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে স্থায়ী বাঙালি অধিবাসীর সন্ধান পাব ভাবতেই পারিনি।

চিত্তরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, বাঙালি কোথায় নেই বলুন? গ্রীনল্যাণ্ডে গেলেও হয়ত দু-একজনের সন্ধান পাবেন। বেশ, আসব বিকেলে আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতে উঠতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। অংশুমান নিচের ঘরে গিয়ে ম্যানেজারকে চিঠি লিখতে বসল। গোটাকয়েক প্রয়োজনীয় বিষয় বলে আসতে ভুল হয়েছে।

ভাস্কর বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ট্রেনে সমস্ত সামলাতে তাকেই বেশি ছুটোছুটি করতে হয়েছে। সুখময়বাবু আর অপরূপ আবার বেরিয়েছেন।

বাগান-ঘেঁষা বারান্দায় সুজাতাকে নিয়ে বসলেন মহিমারঞ্জন।

সুজাতার বয়স বছর বত্রিশ হবে। দেখতে অনিন্দ্যসুন্দরী না হলেও মুখশ্রী বেশ সুশ্রী। সাজপোশাকে পারিপাট্য আছে।

মহিমারঞ্জন বললেন, বেশ জায়গা, কি বল?

আমার খুব ভাল লাগছে। মুসৌরি বা সিমলার মত ভিড় নেই, অথচ কত সুন্দর।

বুঝলে সুজাতা, একবার আমি আর তুমি শুধু এখানে আসব।

বেশ হবে। সুজাতা বারান্দার রেলিংএর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, এ বছরেই আবার আসবে?

এ বছর আসার সময় পাব না। ধরো, সামনের মার্চে।—আচ্ছা, এই বাড়িটা কিনে ফেললে কেমন হয়?

কিনে ফেলবে!

স্বাস্থ্যকর জায়গায় একটা বাড়ি থাকা তো খারাপ নয়। বাড়িখানা কার দেবরাজ বলতে পারবে। এবারই কথা পাকাপাকি করে চেক দিয়ে যাব। ভাস্করের যে বন্ধুটি গতবার এখানে বেড়াতে এসেছিল, সে দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল।

দেবরাজ খান্না লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত ব্রোকার। কোন শৈলনগরীতে বাসস্থান ঠিক করে দিয়ে দালালি নেওয়া থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, বাড়ি কেনা ও বিক্রি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সে দালালি করে থাকে। পামগ্রোভে থাকার ব্যবস্থা তারই করে দেওয়া।

কথায় কথায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। সাড়ে চারটের কিছু পরে চিত্তরঞ্জনবাবু এলেন। তাঁকে একা দেখে মহিমারঞ্জন বললেন, আপনার মেয়েকে নিয়ে এলেন না ?

আসছে। এখানে আসার পথে 'নিউটেক' জাতের পোকার সন্ধান পেলাম। মণিদীপাকে বললাম, বাড়ি থেকে বোতল এনে গোটা কয়েক ধরে রাখতে। ও আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে।

কোন্ পোকা আপনার কাজে লাগবে। কিভাবে বুঝতে পারেন ?

সাদা চোখে পারি না তো। অসংখ্য পোকা তাই পরীক্ষা করে দেখতে হয়। আমার তিন হাজার পোকার সংগ্রহ আছে। আবিষ্কারে যদি সাফল্য লাভ করতে পারি, জানবেন আমার বিশ্বজোড়া নাম হবে।

বাড়ির কাজকর্মের জন্যে একটি গাড়োয়ালি ছোকরাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাকে মহিমারঞ্জন আদেশ দিলেন, সুকুমার দত্ত আর অপরূপ সরকারকে ডেকে আনতে। ওঁরা এসে বসলেন। সুজাতা চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। কথা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনবাবু এখানকার ইতিহাস বর্ণনা করলেন।

বছর ত্রিশ আগে রন নরিশ নামে এক ইংরেজ এখানে শিকার করতে এসেছিলেন। ভাল শিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাঘের হাতে তিনি প্রাণ দেন। তখন এখানে লোকালয় ছিল না। কাজেই যানবাহনেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। নরিশের সঙ্গীরা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার কোন উপায় না দেখে, তাঁকে এখানেই কবর দিয়ে দিল। মাস ছয়েক পরে নরিশের ছেলে ইংল্যাণ্ড থেকে এলেন বাপের কবর দেখতে। তাঁর কি যে খেয়াল হল, আর ফিরে গেলেন না। লোকজন আনিয়ে, জঙ্গল কেটে পোলট্রি ফার্ম করলেন। বাপের নাম অনুসারে জায়গার নাম দিলেন রন্‌গাও। ক্রমে বসতি বেড়ে উঠল এখানে। আর্থার নরিশ বছর চারেক আগেও এখানে ছিলেন। অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন। হ্যামস্টেডে, নিজের পল্লীভবনে মারা যাবার ইচ্ছে নিয়ে, এখানকার সম্পত্তি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে দান করে ইংল্যাণ্ড ফিরে গেছেন।

অপরূপ প্রশ্ন করলেন, সেই পোলট্রি ফার্মের কি হল ?

আছে। সরকারের ব্যবস্থাপনায় এখন চলছে। আপনারা দেখে আসবেন গিয়ে, ভাল লাগবে।

সুকুমার দত্ত প্রশ্ন করলেন, রনু নরিশকে বাঘে খেয়েছে বলছেন, এখানে বাঘের উপদ্রব আছে নাকি?

খুব আছে। এখানকার বাঘরা আবার সেন্ট-পাসেন্ট সুন্দরবনের ম্যানইটার।

তবে তো সন্ধ্যার পর বেরুনো চলবে না. কি বলুন?

একেবারে না। চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, এরকম অস্বোয়াস্তি থাকলে বেড়িয়ে আরাম নেই। আপনারা এখানে না এলেই ভাল করতেন।

সুজাতা চায়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এল।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোবার পর ভাস্করের ঘুম ভেঙে গেল।

ক্লান্ত ভাবটা কেটেছে। বিছানা থেকে তবু উঠতে ইচ্ছে করছে না। এখানে না এলেই ভাল ছিল। কলকাতায় মৃদু আপত্তি করেছিল ভাস্কর, ওর আপত্তিকে গ্রাহ্য করেননি মহিমারঞ্জন।

বিরক্তির সুরে বলেছিলেন, কেন যাবে না, বলতে পার?

এই কথার ও কি উত্তর দেবে। বলা তো যায় না, ও গেলে অংশুমান বিরক্ত হবে। কাটা কাটা কথায় সব সময় অতিষ্ঠ করে তুলবে। ভাস্কর ভেবে পায় না, ওর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে কি আনন্দ পায় অংশুমান। মহিমারঞ্জন ওকে স্নেহ করেন—তাই বলে নিজের সম্পত্তির অর্ধাংশ তো আর তিনি ওকে দান করছেন না। তবে?

দুজনের বয়স এক। ছোটবেলা থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছে। তবু অংশুমানকে অফিসে স্যার বলে কথা বলেছে। ও যে আশ্রিত এ-কথা কখনও ভুলে যায়নি। তা সত্ত্বেও তার ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা জুটেছে। মাত্র মাস দুয়েক আগে ভাস্কর জানতে পেরেছে, রাগের আসল কারণটা কি? অকারণে অংশুমান ওকে প্রচুর বকাবকি করেছিল সেদিন। আর নিজেকে চেপে রাখতে পারেনি ভাস্কর। প্রশ্ন করেছিল, আপনি আমাকে অকারণ বকাবকি করেন কেন?

তোমাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

তার নিশ্চয় সঙ্গত কারণ আছে?

ইউ ননসেন্স, আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছ! আছেই তো। বাবার বিশ্রী স্বভাবকে তুমি কাজে লাগিয়েছ। তুমি আর নিশিকান্তবাবু মিলে সুজাতাকে সংগ্রহ করে দিয়ে টাকা মেরেছ!

আর্ত-চিৎকার করে উঠেছিল ভাস্কর।

কি বলছেন! ছি, ছি! ওকথা বলবেন না।

সেই দিনই ভাস্কর নিজের মনস্থির করে ফেলেছে। অকৃতজ্ঞতা হলেও মহিমারঞ্জনের স্নেহের আবরণকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। রন্‌গাঁও থেকে ফিরে গিয়েই চিরবিদায় নেবে হালদার-বাড়ি থেকে। ইতিমধ্যে অন্যত্র চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

আরো খানিক বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল ভাস্কর। ওধারের বারান্দা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। সকলে বোধহয় ওখানে একত্রিত হয়েছেন। সদ্যপরিচিত চিত্তরঞ্জনবাবু এসে থাকতে পারেন।

ভাস্কর ওধারে গেল না। গ্রেটকোট গায়ে গলিয়ে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সেপ্টেম্বর মাস হলেও বেশ শীত আছে এখানে। ঘণ্টাখানেক ঘুরে-ফিরে 'পামগ্রোভে' ফিরে যাবার ইচ্ছে নিয়ে ও বেরোল। গজ পঞ্চাশেক এগিয়েছে বোধহয়, দেখল একটি মেয়ে প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে রবারের গ্লাভস পরা হাতে সযত্নে ঘাসের মধ্যে থেকে পোকা বেছে বেছে একটা বোতলে রাখছে। বোতলের মুখ খোলা থাকায় পোকাগুলো বন্দী অবস্থায় থাকছে না, বেরিয়ে যাচ্ছে।

কি খেয়াল হল, মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাস্কর বলল, নমস্কার মিস সেন!

চমকে মেয়েটি মুখ তুলল। তার মুখে বিস্ময়ের ভাব।

আপনাকে তো····

আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। উঠেছি পামগ্রোভে।

ও! আপনি আমার পরিচয় পেলেন কোথায়?

মৃদু হেসে ভাস্কর বলল, সকালে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি এই রকম একটা বোতলে পোকা ধরছিলেন। বলেছিলেন তাঁর একটি মেয়ে আছে। আপনাকে পোকা ধরতে দেখে আন্দাজ করে নিলাম। এদিকে সব পোকা তো বোতল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হাসি মুখে মেয়েটি বলল, কি করব, কর্কটা হারিয়ে গেছে। গোটা কয়েক কোনরকমে নিয়ে যেতে পারলেই হল।

আপনিও এ-সমস্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করেন নাকি?

না, না, আমার এত বিদ্যে বুদ্ধি কোথায়? এই সমস্ত ছোটখাটো সাহায্য বাবাকে করি।

মেয়েটি বোতলের মুখ চেপে উঠে দাঁড়াল।

এগুলো বাড়িতে রেখে আসি। আপনাদের ওখানে আবার যেতে হবে। বাবা তো চলে গেছেন।

সে বোতল হাতে নিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে চলল। ভাস্কর দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। এরকম সপ্রতিভ মেয়ে ও জীবনে দেখেনি। কথাবার্তায়

কোন আড়ষ্টতা নেই। চমৎকার। ভাস্কর যে অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছে তা নয়, আসলে এই মেয়েটির জড়তাহীন ব্যবহার মনে দাগ কেটে গেল।

মেয়েটি চোখের আড়ালে চলে গেলে, ও আবার পামগ্রোভের দিকে ফিরল।

পরের দিন ভোরে দেবরাজ নিজের কার ড্রাইভ করে এল। বিরাট চেহারার অধিকারী দালালপ্রবর। পানের ছোপে ঠোঁট কালচে লাল হয়ে রয়েছে। সে পানের বিশেষ ভক্ত বুঝতে পারা যায়।

মহিমারঞ্জন পামগ্রোভ কিনে ফেলার ইচ্ছে তার কাছে প্রকাশ করলেন।

উৎসাহের সঙ্গে দেবরাজ বলল, খুব ভাল কথা। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। জানেন তো, এই বাড়িখানাই এখানকার প্রথম বাড়ি?

তাই নাকি!

এই স্বাস্থ্য-নিবাসের পত্তনকারী রন্ নরিস এই বাড়িতে থাকতেন।

দেখা যাচ্ছে পামগ্রোভ বেশ ঐতিহ্যশালী। কত দাম পড়বে?

হাজার পঞ্চাশের মধ্যে আমি আপনাকে পাইয়ে দেব। আমার কমিশনটা কিন্তু বেশ মোটা হওয়া চাই।

সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস্টার খান্না।

বাইরের বারান্দায় যখন এই ধরনের কথা হচ্ছে, ভিতরের একটি ঘরে তখন বিশেষ এক নাটকের সবে সূচনা দেখা দিয়েছে।

সুজাতা বিছানা ছেড়ে উঠে, আড়মোড়া ভেঙে নিজের কাপড় ঠিক করে নিচ্ছিল। সুকুমার দত্ত ঘরে ঢুকলেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে সুজাতা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কোনরকমে বলল, আপনি এখন কেন এলেন এখানে?

তোমার মতামতটা এখনো আমি পাইনি।

আপনি আমায় শান্তিতে থাকতে দিন সুকুমারবাবু। কেন অতিষ্ঠ করে তুলছেন?

একটা বুড়োকে আঁকড়ে ধরে থেকে তুমি কি যে শান্তি পাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে হাত মেলাও সুজাতা, জীবন কিভাবে উপভোগ করতে হয় তার স্বাদ পাবে।

ভীত দৃষ্টি দরজার ওপর নিবদ্ধ রেখে সুজাতা বলল, আপনাকে আগে বহুবার বলেছি, আপনার প্রস্তাবে রাজী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি মহিমাবাবুকে স্বামীর মত শ্রদ্ধা করি।

স্বামীর মত! সুকুমার দত্তর মুখে বাঁকা হাসি খেলল।—স্বামীর পুত্তুরটি একদিন তোমায় গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। তখন কিন্তু আমার কাছে যাওয়া ছাড়া তোমার অন্য পথ থাকবে না।

আপনি আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছেন দত্তমশাই। এক এক সময় ইচ্ছে করে মহিমাবাবুকে আপনার এই সব কথা বলে দিই।

দিলেই পার।

বলি না শুধু দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে যাবে বলে। ব্যবসাও হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আপনি এখন যান দয়া করে। কেউ এসে পড়লে—

বেশ, এখন চললাম। তবে এখানেই নিজের মনকে স্থির করে ফেলতে হবে। আমার সামনে হালদারের মত ওল্ড হ্যাগার্ড তোমাকে নিয়ে নাচানাচি করবে, তা আমি সহ্য করব না।

সুকুমার দত্ত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ওদিকে দেবরাজ মহিমারঞ্জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মোটর হাঁকিয়ে চলে গেল। সে গেল চিত্তরঞ্জন সেনের বাড়ি। চিত্তরঞ্জন সেন মোটা একটা কেতাবে একাগ্র ছিলেন। দেবরাজকে দেখে বললেন, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি না এসে পড়লে আমাকে লক্ষ্ণৌ যেতে হত।

চেয়ারে বসে পড়ে দেবরাজ বলল, জরুরী কথা আছে?

জরুরী বইকি! পামগ্রোভ নতুন ভাড়াটেরা কিনতে চায়, শুনেছ কিছু?

ভদ্রলোক আমায় বলছিলেন।

তুমি কি বললে?

আমি হাজার পঞ্চাশেক বাড়িটা পাইয়ে দেব বলেছি।

দৃঢ় গলায় চিত্তরঞ্জন সেন বললেন, তোমার এই দু-মুখো ব্যবহার আমার পছন্দ হয় না দেবরাজ। মহিমাবাবুকে বলে দিলেই তো পারতে অন্যত্র বাড়ি বিক্রির কথা ফাইনাল হয়ে গেছে।

কি করে বলি! আজ এক বছর ধরে আপনি কিনব-কিনব করেও তো কিনছেন না।

এই সপ্তাহেই কিনে ফেলব।

কিন্তু—

আর কিন্তু নয় দেবরাজ। রিসার্চের পক্ষে পামগ্রোভ আদর্শ বাড়ি। বাড়ি-সংলগ্ন বাগানটাকে দুষ্প্রাপ্য পোকার খনি বলা চলে। যেরকম দালালি তুমি চাইবে, আমি তাই দেব। তুমি এবার যাও। ওঁদের চা খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, এখুনি সকলে এসে পড়তে পারেন।

দেবরাজ কিছু না বলে উঠে পড়ল।

আধঘণ্টা পরে সদলবলে মহিমারঞ্জন এলেন। চিত্তরঞ্জনবাবু ও মণিদীপা সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

চিত্তরঞ্জনবাবুর মেয়ের নাম মণিদীপা। একথা গতকালই শুনেছিল ভাস্কর।

চা এবং নানারকম মুখরোচক খাবারের সঙ্গে গল্প চলতে লাগল।

নিশিকান্ত বললেন, বাংলা দেশের সঙ্গে বোধহয় আপনার কোন সম্বন্ধ নেই?

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, সম্পর্ক নেই আজ দু-পুরুষ। কোনকালে যে ওখানে আবার যাব, তার সম্ভাবনাও নেই।

অপরূপ সরকার বললেন, বাংলা দেশে মেয়ের যদি বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে তো এক-আধবার যেতেই হবে।

বাংলা দেশে মেয়ের বিয়ে আমি দেব না।

খাওয়া শেষ হয়েছিল!

মহিমারঞ্জন বললেন, আপনার পোকার সংগ্রহ দেখান এবার।

আসুন।

চিত্তরঞ্জনবাবুকে অনুসরণ করে সকলে মাঝারি ধরনের একটা হলে এলেন। সারি সারি টেবিল দিয়ে ঘরখানাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। টেবিলগুলির ওপর অসংখ্য জার ও জালের খাঁচা। জালের খাঁচা ও জারের মধ্যে অজস্র পোকা রয়েছে। তাদের বর্ণাঢ্য চেহারা দেখবার মত। ঘুরে ঘুরে পোকাগুলির পরিচয় দিতে লাগলেন চিত্তরঞ্জন। কোনটা বা হাতে নিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

পোকার যে এত গুণাগুণ থাকতে পারে বা কোন মানুষ যে এত পোকা সংগ্রহ করে সযত্নে রাখতে পারে, দর্শকদের ধারণার অতীত ছিল। সুজাতা মুখে কাপড় দিয়ে এগোচ্ছিল। তার কেমন গা ঘিনঘিন করছে।

ভাস্কর অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। চিত্তরঞ্জনবাবুর কথা ও মোটেই মন দিয়ে শুনছিল না। অন্যমনস্ক ভাবেই একটা খাঁচার ওপর হাত রাখতে গেছে—দ্রুত গলায় মণিদীপা বলল, খাঁচায় হাত দেবেন না। বিষধর পোকা আছে ওতে।

ঝটিতে হাত সরিয়ে নিল ভাস্কর। চলমান দলটি থেমে গেল। চিত্তরঞ্জনবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, আমার ভুলেই এখুনি বিপদ ঘটে যেত। আগেই সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। ওদের বিষের তেজ সাপের বিষের চেয়ে অনেক বেশি।

মহিমারঞ্জন বললেন, বলেন কি! কিন্তু দেখতে তো খুবই সুন্দর।

পোকাগুলির বিস্তার পঞ্চাশ পয়সার চেয়ে বেশি হবে না। পিঠের রঙ্ কালো, তার ওপর লাল ফোঁটা আছে। দেহের অনুপাতে শুঁড় বেশ বড়। চিত্তরঞ্জনবাবু পোকাগুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের মধ্যেও এমন আছে দেখবেন যার ওপরটা সুন্দর কিন্তু ভেতরটা নিষ্ঠুরতায় ভরা। এই পোকাগুলির নাম কিউলান। বলতে গেলে এদের জন্যেই আমাকে এখানে বাসা বাঁধতে হয়েছে।

সুকুমার দত্ত বললেন, কিউলান এখানে বুঝি প্রচুর পাওয়া যায়?

হ্যাঁ। আমি যে-ওষুধ তৈরির ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছি, কিউলানের অবদান তাতে সবচেয়ে বেশি।

কোন বিশেষ জায়গায় এরা বোধহয় চাক বেঁধে থাকে?

না, না, যত্রতত্র পাওয়া যায়। পামগ্রোভের বাগানেও আছে। কাজেই বুঝতে পারছেন মরণ-ফাঁদ পদে পদে এখানে।

সকলের শরীরের মধ্যেটা কেমন শিরশির করে উঠল।

অপরূপ সরকার বললেন, এই সাংঘাতিক পোকাগুলিকে ধরলেন কিভাবে?

ধরা শক্ত নয়; হাতে চামড়ার গ্লাভস্ পরে যে কেউ ধরতে পারে।

পোকার ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে এলেন।

এক অজানা কারণে কথাবার্তা আর তেমন জমল না। বেলাও বাড়ছিল। চিত্তরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে ওরা বিদায় নিলেন।

দুপুরে গুরুতর একটা ঘটনা ঘটল।

খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় বসে মহিমারঞ্জন পাঁশুটে রঙের পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুজাতা তখনো আসেনি। সুজাতা সবে ঘর থেকে বেরুতে যাবে, গতকালের মত সুকুমার দত্ত ঘরে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে দেখেই সুজাতার মন তেঁতো হয়ে উঠল। সে তীব্র গলায় বলল, আপনি যদি এই ভাবে আমাকে বিরক্ত করেন, আমি ওঁকে সব কথা জানাতে বাধ্য হব।

ওঁকে! সশ্লেষে সুকুমার বললেন, একেবারে সতী-সাবিত্রীর মত কথা বলছ যে!

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সুকুমার দত্ত সুজাতার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু একজনের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি—তিনি নিশিকান্ত। নিশিকান্ত দরজার বাইরে থেকে কান পেতে কথা শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুতপায়ে গেলেন মহিমারঞ্জনের কাছে।

মহিমারঞ্জন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলেন।

তখন সুজাতা বলছে, আপনি এত ইতর আমি জানতাম না। আপনার মত লোক বাপের বুকে পর্যন্ত ছুরি মারতে পারে।

শুধু বাপের বুকে নয়। তোমার—

এক ধাক্কায় কপাট খুলে মহিমারঞ্জন ঘরে প্রবেশ করলেন। ক্যানাডিয়ান এঞ্জিনের মত তিনি ফুঁসছেন। তাঁকে দেখে সুজাতা কান্নায় ভেঙে পড়ল। সুকুমার এই নাটকীয় আবির্ভাবের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, থতমত খেয়ে যাবার পর আপ্রাণভাবে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন।

প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হল দুজনের মধ্যে।

মহিমারঞ্জন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সুকুমার দত্তর সঙ্গে আর তিনি ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখতে চান না, কলকাতায় ফিরেই এর পাকা ব্যবস্থা তিনি করে ফেলবেন।

সুকুমার দত্ত নিজের গর্হিত অপরাধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অনুতাপ করলেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, এই অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন। নিজের সুটকেশ, বিছানা নিয়ে তিনি পামগ্রোভ থেকে বিদায় নিলেন।

আনন্দোচ্ছ্বল পরিবেশ প্রচণ্ড রকমের ভারি হয়ে উঠল।

বাড়িতে যখন গোলমাল আরম্ভ হয়েছে, ভাস্কর তখন নেমে পড়েছে রাস্তায়। কার্টার রোড দিয়ে ধীর পায়ে এগুতে আরম্ভ করেছে। কার্টার রোডের সব-শেষের বাড়িখানা চিত্তরঞ্জনবাবুর। প্রবল একটা আকর্ষণে সেই দিকেই চলেছে ভাস্কর।

বাড়ির সামনে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেল না। চিত্তরঞ্জনবাবু ও মণিদীপা বিশ্রাম করছেন নিশ্চয়। এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তাছাড়া চিত্তরঞ্জনবাবুর উপস্থিতিতে মণিদীপার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলা যাবে না। ও ইতস্তত করে গেটের কাছ থেকে সরে এসেছে সবে—

চলে যাচ্ছেন কেন?

ভাস্কর চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, মণিদীপা। হাতে তার একটা প্যাকেট।

এসে আবার চলে যাচ্ছিলেন যে বড়?

না · মানে····

বেল টিপেছিলেন নাকি?

না। আমি এই আসছি।

আমি বাজারে গিয়েছিলাম। আসুন।

ভাস্কর ও মণিদীপা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। লনে গোটাকয়েক বেতের চেয়ার পাতা ছিল। ভাস্করকে বসতে অনুরোধ করে মণিদীপা প্যাকেটটা ভেতরে রেখে এল।

চা খাবেন?

না।

কেমন লাগছে জায়গাটা বলুন?

খুব ভাল। আপনার বাবা কোথায়?

বেরিয়েছেন। কিছু দূরে একটা গ্রাম আছে, সেখানে গেছেন।

নিজের গলা ঝেড়ে নিয়ে ভাস্কর বলল, বসে থেকে কি লাভ? চলুন না, পাহাড়ের দিকে ঘুরে আসি।

চকিতে ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মণিদীপা বলল, চারধারেই পাহাড়, কোন ধারে যাবেন? তার চেয়ে সাউথ পয়েন্টে চলুন। লেকটা

বোধহয় আপনি দেখেন নি ?

দুজনে সাউথ পয়েণ্টের দিকে চলল। কার্টার রোড থেকে আধ মাইলটাক হবে। সারাটা পথ কোন কথা হল না দুজনের মধ্যে। লেকটা বেশ বড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এক নজরেই বুঝতে পারা যায় মানুষের সৃষ্টি লেক নয়। অল্প শব্দ তুলে পাহাড় থেকে জল পড়ছে অবিরাম।

ভাস্কর বলল, আসুন, এখানে বসা যাক।

পুরু ঘাসের ওপর বসল দুজনে।

লেক কেমন দেখছেন ?

চমৎকার। নৈনিতাল লেকের চেয়েও ভাল।

আমি নৈনিতাল যাইনি। মণিদীপা বলল, আপনি শুনলে অবাক হবেন, লক্ষ্ণৌ ছাড়া আমি আর কোন বড় শহর দেখিনি।

কেন, উত্তরপ্রদেশে তো অনেক নাম-করা শহর আছে ?

তা আছে। কিন্তু যাবার তো উপায় নেই। বাবা রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে একলাও ছাড়বেন না।

ভাস্কর নাম-না-জানা জলপ্রপাতটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমাকে গায়ে-পড়া বলে মনে হচ্ছে বোধহয় ? উপযাচক হয়ে আলাপ করলাম। আবার—

না, না, ও-কথা বলছেন কেন ! বিস্মিত মণিদীপা বলল।

এখন কিন্তু এসেছিলাম বিশেষ একটা কথা বলতে।

বলুন ?

আজ সকালে আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সামান্য কৃতজ্ঞতাও জানাব না, এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই।

কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলেন তাই ?

হ্যাঁ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মণিদীপা বলল, কৃতজ্ঞতা পাবার জন্যে তখন কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিইনি।—চলুন, ওঠা যাক।

দেবরাজের গাড়িতেই চিত্তরঞ্জন ফিরলেন গ্রাম থেকে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, তুমি তাহলে কালই বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে কথা পাকা করে নিও। এদিকটা কিভাবে সামলাবে ?

দেবরাজ পকেট থেকে ডিবে বার করে তার থেকে চারটে পান তুলে মুখে দিয়ে বলল, কিভাবে আবার ? বলতে হবে, বাড়িওয়ালার সঙ্গে আপনার কথা আগেই হয়ে গেছে, একথা আমার জানা ছিল না।

মহিমারঞ্জনবাবুকে আরেকটা বাড়ি না হয় ঠিক করে দিও। এখুনি লক্ষ্ণৌ ফিরছ ?

কিছু কাজ আছে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে আর ফিরব না। এখানে বা পামগ্রোভে কোথাও এসে রাত কাটিয়ে দেব।

ওদিকে—

পামগ্রোভের অবস্থা থমথমে।

অপরূপ সরকার শুনেছেন সব কথা। নিশিকান্তর মুখ থেকেই শুনলেন। বড় ঘরের বড় ব্যাপার—তিনি কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। অংশুমানের কোন কথা অজানা ছিল না। ঘরের বাইরে থেকে সে মহিমারঞ্জন ও সুকুমার দত্তর বচসা শুনেছিল।

নিশিকান্তকে বলেছিল গম্ভীর গলায়, এই কেলেঙ্কারিটা আপনি না বাধালেই পারতেন।

আমি—!

আকাশ থেকে পড়বেন না। কি দরকার ছিল বাবার কাছে কথাটা লাগাবার?

আমি ·· আমি তো

থাক, কোন সাফাই খাড়া করবার চেষ্টা করবেন না। আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, কলকাতায় ফিরে যাবার পর বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ করতে হবে। আপনার মত লোকের সঙ্গে মিশেই তাঁর আজ এই হাল হয়েছে।

সুকুমার দত্ত পামগ্রোভ থেকে বেরিয়ে গেলেও রনগাঁও ত্যাগ করেন নি। কাছেই আরেকটি বাড়িতে উঠেছেন। দেবরাজ চিত্তরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে ফিরছিল, তাকে দেখতে পেয়ে সুকুমার নিজের কাছে ডাকলেন।

দেবরাজ তাঁকে অন্য বাড়িতে দেখে তো অবাক!

সুকুমার বললেন, পামগ্রোভ কিনিয়ে দিলে হালদার আপনাকে কত টাকা দালালি দেবে বলেছে?

অ্যামাউণ্ট কিছু বলেন নি, তবে মোটা টাকাই দেবেন!

আমার একটা প্রস্তাব আছে।

বলুন?

পামগ্রোভ আমি কিনতে চাই। হালদারের ডবল দালালি আমি দেব। শুনলাম, আপনি বাড়ির দাম বলেছেন পঞ্চাশ হাজার। আমার সত্তর হাজারে আপত্তি নেই। বলুন, রাজি আছেন?

দেবরাজ বিস্ময়ের শেষ ধাপে। পামগ্রোভ কেনার জন্যে সকলের এত আগ্রহ কেন? বাড়িটার মধ্যে আছেটা কী?

চুপ করে রইলেন যে? বলুন? যে-কোন উপায়ে আমায় বাড়িটা পাইয়ে দিতে হবে।

দেবরাজ বেশ সহজ গলায় বলল, আপনার প্রস্তাব খুবই লোভনীয়। এই মুহূর্তে প্রস্তাবে রাজি হতে পারলে ভাল হত। উপায় নেই। চিন্তা করবার একটু সময় আমায় দিতেই হবে।

বেশ, কাল বলুন?

কাল অসম্ভব। আজ রাতে বোধহয় আমায় এখানেই থেকে যেতে হচ্ছে। কাল লক্ষ্ণৌ ফিরব। পরশু সংবাদ দিতে পারি।

সুকুমার দত্তর কাছ থেকে দেবরাজ বিদায় নিল।

মাঝরাত্রি থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

অকাল বর্ষণ। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই দ্বিগুণ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। চারদিকে অন্ধকারের আবরণ। শুধু একটানা ঝমঝম শব্দ কানে এসে বাজছে।

অপরূপ সরকার বিছানা ছেড়ে উঠলেন। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। খুব ভোরেই বিছানা ছাড়া তাঁর অভ্যাস। সে-হিসেবে আজ অনেক বেলায় উঠেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন অপরূপ। আবছা অন্ধকার ছেয়ে থাকা বারান্দায় কেউ নেই। বুঝতে পারা যাচ্ছে, বিছানার সুখস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হতে সকলেই কুণ্ঠিত।

তিনি আবার ফিরে আসছিলেন ঘরে—মাঝ পথে তাঁকে থামতে হল। মহিমারঞ্জনের দরজা খুলে গেল। ঘর থেকে কিন্তু মহিমারঞ্জন বেরিয়ে এলেন না, বেরিয়ে এল অংশুমান। সে বোধহয় অপরূপ সরকারকে দেখতে পায়নি, ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছিল একধারে। সরকার দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপলেন। আলোর বন্যায় ভেসে গেল বারান্দা।

থমকে দাঁড়াল অংশুমান। দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনের।

অংশুমানের মুখে ভয়ের ছায়া।

দ্রুত গলায় অপরূপ প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে?

গুরুতর ·· মানে··

মহিমাবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

না মানে· । অংশুমানের গলা কাঁপছে,—বাবার কিছু হয়নি। তবে—

তবে কি?

অংশুমান কিছু বলবার আগেই মহিমারঞ্জন এসে উপস্থিত হলেন। দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, আমার ঘুমই বুঝি সকলের আগে ভেঙেছে। উঃ, কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডাই না পড়েছিল রাত্রে।—কথা বলতে বলতে তিনি নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অংশুমান বাধা দিল তাঁকে,—বাবা, তোমার ঘরে দেবরাজ····

মহিমারঞ্জন মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা ঘুমিয়ে পড়বার পর দেবরাজ এসেছিল আমার কাছে। আমিই তো বললাম, ঠাণ্ডায় কোথাও না গিয়ে এখানে থেকে যেতে। উঠেছে নাকি?

না, ওঠেনি। মনে হচ্ছে মারা গেছে!

মারা গেছে!!!

অংশুমানের কথায় বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহিমারঞ্জন ও অপরূপ। পরমুহূর্তে দ্রুতপায়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বেডরুমল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় দুজনে দেখলেন, দেবরাজ খান্নার স্পন্দনহীন দেহ বিছানার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। বড় আলো জ্বালা হল।

বিস্ফারিত চোখে দুজনে দেখলেন, তার গৌরবর্ণ গায়ের রঙে হীরকাভার আস্তরণ পড়েছে। ঠেলে বেরিয়ে আসছে চোখ দুটো। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জলীয় কিছু নির্গত হয়েছে। আর—

আর কালো রঙের ওপর লাল ফোঁটা দেওয়া একটা পোকা দেবরাজের গলা কামড়ে ধরে রয়েছে। সে যে বেঁচে নেই এক নজরে বুঝতে পারা যায়।

চাপা খসখসে গলায় অপরূপ বললেন, কিউলান!

কিউলানের কামড়ে দেবরাজ মারা গেছে।

তারপর—

এই মর্মন্তুদ সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল বাড়িময়। সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে সকলে মৃতদেহ দেখতে এলেন। কে ভেবেছিল, দেবরাজ এই পামগ্রোভে অপঘাতে মারা যাবে। কিন্তু এখন তাঁদের করণীয় কি? সকলে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন। স্থির হল, প্রথমে ডাক্তারকে আহ্বান করা হোক।

রনগাঁও-এ একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন থাকেন। এখানে প্র্যাকটিশ করে এমন কোন ডাক্তার আছে কিনা কারুর জানা ছিল না। অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন মিস্টার দিওয়ানকে গিয়ে ডেকে আনল ভাস্কর। তিনি সমস্ত শুনে মৃতদেহ পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করলেন, ঘণ্টা সাতেকের ওপর হল মারা গেছে দেবরাজ। অনুমান করা যায়, বিষক্রিয়ার ফলেই মারা গেছে। এখন পুলিসে খবর দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পুলিসে কেন? ক্ষীণগলায় মহিমারঞ্জন প্রশ্ন করলেন।

অপঘাতে মৃত্যু। সময়মত পুলিসকে না জানালে আপনারাই বিপদে পড়বেন।

পুলিসে খবর দিতে হল।

লক্ষ্ণৌ গিয়ে দেবরাজের বাড়িতে এবং সদর কোতোয়ালিতে সংবাদটি জানাল ভাস্কর। সদলবলে ইন্সপেক্টার মীরচান্দানি এলেন। গভীর মনঃসংযোগে শুনলেন একে একে সব। কিউলান পোকার তীব্র বিষের কথাও তাঁকে জানান হল। তিনি গম্ভীরভাবে মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন।

বললেন তারপর, মৃতদেহ আমি পোস্টমর্টেমে চালান দিতে চাই। তাছাড়া—

সকলে ইন্সপেক্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাছাড়া মৃত্যু আকস্মিকভাবে হয়েছে, কি মৃত্যু ঘটানো হয়েছে, সে-সম্পর্কেও আমাকে অনুসন্ধান করতে হবে।

মহিমারঞ্জন বললেন, দেবরাজকে খুন করা হয়েছে, সম্পূর্ণ অলীক কথা ইন্সপেক্টার। কিউলান পামগ্রোভের বাগানে কোথাও চাক বেঁধে আছে শুনেছি, তাদেরই মধ্যে একটি--

আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলে আমি খুশি হতাম মিস্টার হালদার। খটকা কোথায় লেগেছে জানেন, এই ঘরখানা যদি বাগানের পাশে হত, একটা পোকা কোনরকমে জানলা গলে ঘরে ঢুকে অঘটন ঘটালেও ঘটাতে পারত। ঘরের পজিসন দেখুন, মোজেক করা শ্লিপারি ফ্লোরের ওপর দিয়ে, বাগান থেকে পোকাটার এতদূর আসা বিস্ময়কর। তাছাড়া যে সমস্ত পোকা বা পাখি চাক বেঁধে থাকে, তারা কখনই দলছাড়া হয় না। কাজেই—

আপনি বলতে চাইছেন, কেউ পোকাটাকে দেবরাজের বিছানায় ছেড়ে দিয়েছিল ?

জোর দিয়ে আমি এখনি কিছুই বলতে চাইছি না, সমস্ত নির্ভর করছে তদন্তের ওপর। আমি এখন চললাম। আমার অনুমতি না নিয়ে আপনারা কেউ কলকাতায় ফিরে যাবেন না।

মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে মীরচান্দানি বিদায় নিলেন।

একটা অস্বস্তিকর ও ভীতিপ্রদ পরিবেশ পামগ্রোভকে বেষ্টন করল। বেড়াতে এসে একি দুর্বিপাক ? ইন্সপেক্টার চলে যাবার পর কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। একটা অজানা বাধা শেকড় গেড়ে বসেছে সকলের মনে

বলতে গেলে ঝড়ের বেগে কেটে গেল দুটো দিন।

ইন্সপেক্টার অনেক অনুসন্ধান করেও বাগানের মধ্যে একটিও কিউলানের সন্ধান পাননি। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে, কেউ পোকাটি অন্যত্র থেকে সংগ্রহ করে দেবরাজের বিছানায় ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং তিনি তদন্তে নামলেন। পামগ্রোভের অধিবাসীদের সতর্কতার সঙ্গে জেরা করলেন।

তাছাড়া আরেক ব্যাপারে তাঁর মন তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিল। তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জনবাবুর সংগ্রহে বহু কিউলান আছে। সেদিন সন্ধ্যার পর দেবরাজের সঙ্গে কি বিষয় নিয়ে তাঁর প্রচণ্ড বচসাও হয়েছিল। তবে কি—

কিন্তু চিত্তরঞ্জনবাবু রাত্রে পামগ্রোভের মধ্যে প্রবেশ করবেন কিভাবে ?

এদিকে মহিমারঞ্জন মন স্থির করে ফেলেছেন, অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি থাকতে চান না। পুলিসের কাজ একটু ঢিমে তেতালায় হবে সন্দেহ নেই। এখানে কতদিন নজরবন্দী হয়ে থাকবেন ?

তাছাড়া পামগ্রোভে দেবরাজ মারা গেছে, কাজেই সমস্ত দায়িত্বকে যে হেসে উড়িয়ে দেবেন তাও সম্ভব নয়। অনেক চিন্তার পর মন স্থির করে ফেলেছেন। তাই দেবরাজের মৃত্যুর তদন্ত বেসরকারীভাবে করিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অপয়া জায়গা তিনি ত্যাগ করতে চান।

পুলিসের সঙ্গে এ-সম্পর্কে কথা বলে, বাসবকে ট্রাঙ্ক-কল করলেন লক্ষ্ণৌ থেকে। বছর কয়েক আগে ট্রেনে বাসবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। বাসব আগ্রায় যাচ্ছিল কোন এক তদন্তে। ফোনে মহিমারঞ্জনের সঙ্গে তার কথা পাকাপাকি হয়ে গেল।

দিন দুয়েক পরে শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বাসব এল রন্‌গাঁও। তার আগমনে অন্যান্যদের মনে কি ভাব দেখা দিল বুঝতে পারা না গেলেও, মহিমারঞ্জন সাদরে গ্রহণ করলেন দুজনকে। বাসব সময় নষ্ট করল না, কুশল বিনিময়ের পর কাজের কথার সূত্রপাত করল।

পামগ্রোভে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রথমে পরিচয় জেনে নিল। দেবরাজের কথা এবং কিভাবে খুন হয়েছে সে-বিষয়েও বর্ণনা করলেন মহিমারঞ্জন।

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, সকলেই এখন বাড়িতে আছেন বোধহয়?

আমার বিজনেস পার্টনার সুকুমার দত্ত শুধু অন্য বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

কেন?

মহিমারঞ্জন ইতস্তত করতে লাগলেন।

আপনি হেজিটেড করবেন না মিস্টার হালদার। খুনের তদন্ত করতে এসেছি, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার সমস্ত কিছু জানা দরকার।

একটু চুপ করে থেকে মহিমারঞ্জন ঘটনাটা বললেন।

এবার ঘটনার দিনে আমাদের ফিরে যেতে হবে। দেবরাজ সেদিন রাত্রে আপনার কাছে কেন আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন?

থাকতে সে চায়নি, আমিই তাকে থাকতে বাধ্য করেছিলাম।

কেন?

খাওয়া-দাওয়ার পর তখন সকলে শুয়ে পড়েছিল। আমি অভ্যাস মত বাগানের ধারের বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। দেবরাজ এল। এসে বলল, এই বাড়িটা আমাকে বিক্রি করা যাবে না। সুকুমার নাকি অনেক বেশি টাকা দিতে চাইছে। আমি বললাম, কথা কাল হবে। রাতটা এখানেই থেকে যান। বাঘের উপদ্রব আছে, লক্ষ্ণৌ ফিরতে গেলে বিপদে পড়তে পারেন। একটু আপত্তির পর দেবরাজ রাজি হল। তখন কে জানত, তাকে আমি মৃত্যুর পথে ঠেলে দিলাম! দেবরাজকে নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য এক

ঘরে গেলাম। সকালে উঠে শুনি সে মারা গেছে।

দেবরাজের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, একথা কেউ জানত?

না; সকলে তখন ঘুমে অচেতন।

দেবরাজ খুন হয়েছে, একথা আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন?

দ্বিধাজড়িত গলায় মহিমারঞ্জন বললেন, এখন অবিশ্বাস করবার তো কোন উপায় নেই।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাস্ট্রের ওপর রেখে বলল, কিন্তু কোন মানুষ তো অকারণে খুন হতে পারে না, একটা কারণ তো থাকা চাই।

এ-বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, দেবরাজকে খুন করে কে লাভবান হল।

হুঁ। যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা প্রশ্ন করি, সুজাতাদেবীর জন্যে আপনার ছেলে বা আর কোন আত্মীয়ের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য দেখা দেয়নি?

এই ধরনের প্রশ্নে মহিমারঞ্জন একটু হকচকিয়ে গেলেন।—না, সেরকম কিছু হয়নি। সকলে সহজভাবে সুজাতাকে গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বিয়ে না করলেও সে আমার স্ত্রীই।

এখানে আপনাদের শোবার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা ঘরে কেন?

কোন বিশেষ কারণে নয়। এমনি বলতে পারেন।

আপনাকে এখন আর বিরক্ত করব না মিস্টার হালদার। অংশুমানবাবুর সঙ্গে এবার দেখা করতে চাই।

বেশ, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মহিমারঞ্জন ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে অংশুমান এল।

আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

আমি যা বলবার পুলিসকে বলেছি তো!

তা বলেছেন। সেসব কথা আমার তো জানা নেই। একটু সহযোগিতা করুন, নইলে আমার কাজ এগোবে কিভাবে?

ভ্রূ কুঁচকে অংশুমান বলল, কি জানতে চান বলুন?

দেবরাজ খুন হওয়ার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

অভিমত? আমার একটা সন্দেহ আছে।

বাসব অংশুমানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিরকম সন্দেহ?

চিত্তরঞ্জন সেনের নাম বোধহয় শুনেছেন—কিউলানের বিষয় যাঁর কাছ থেকে প্রথম আমরা জানতে পারি। তাঁর মেয়ে মণিদীপার ওপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখলেই হত্যাকারীর সন্ধান পাবেন।

অর্থাৎ— ?

আমার ধারণা, মণিদীপার ওপর দেবরাজ ইন্টারেস্টেড ছিল। সম্প্রতি ভদ্রমহিলার অন্য একজন প্রেমিক জুটেছে, সে হয়ত—

বাসব একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল ; তারপর বলল, আপনার ধারণা সম্পর্কে আমি অনুসন্ধান করে দেখব। আচ্ছা সেদিন সকালে আপনি মহিমাবাবুর ঘরে কেন গিয়েছিলেন ?

গিয়েছিলাম বাবাকে বলতে—আর এখানে না থেকে কলকাতা ফিরে যাবার কথা। ঘরে ঢুকেই বিছানায় বাবার বদলে দেবরাজকে দেখে অবাক হলাম। কয়েক পা এগিয়ে কেমন বুঝতে পারলাম সে মারা গেছে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই অপরূপবাবুর সঙ্গে দেখা হল।

আপনার বাবার অসংযত চরিত্রের জন্যে আপনি নিশ্চয় বিরক্ত ?

বাসববাবু —

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ভাল হয়।

অংশুমান কি ভেবে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, জ্ঞান হয়ে অবধি বাবার স্বভাব দেখছি। গা-সওয়া হয়ে গেছে।

সুজাতাদেবী কতদিন তাঁর সঙ্গে আছেন ?

বছর পাঁচেক হবে।

কেমন মেয়ে তিনি ?

আপনি হাসালেন মশাই। একজন ধনী বৃদ্ধকে রূপের জালে জড়িয়ে যে দুহাতে টাকা লুটে যাচ্ছে, সে আবার কেমন মেয়ে হবে ? বাবা বুঝেও বোঝেন না, এতেই আমি অবাক হয়ে যাই।

আপনার কর্তব্য তাঁকে ভালভাবে বোঝানো।

আমি নিজের আখের নষ্ট করতে চাই না। তিনি যদি একবার আমার ওপর চটে যান, অন্যকে উত্তরাধিকারী মনোনিত করবেন। একজন ওঁৎ পেতে বসে আছে।

কে ?

আমার মামাতো ভাই ভাস্কর।

এমনও তো হতে পারে, সুকুমারবাবু একদিন সুজাতাদেবীকে নিয়ে সরে পড়বেন।

হতে পারে, কিন্তু হবে না। সুজাতা তাঁর সঙ্গে যাবে না– তাছাড়া বাবা আর নিশিকান্তবাবু বাধা দেবেন। একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, দেবরাজের মৃত্যুর সঙ্গে এই সমস্ত কথার সম্পর্ক কি!

সম্পর্ক যে একেবারেই নেই, একথা এখন জোর দিয়ে বলা যায় না। যাহোক আপনাকে আর আটকে রাখব না। অপরূপবাবুকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন।

অংশুমান হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অপরূপ সরকার এলেন।

নাম অপরূপ হলেও চেহারা খুবই সাদামাটা। বাসবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করলেন। দেবরাজ সে রাত্রে পামগ্রোভে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, একথা তাঁর জানা ছিল না। তাঁর কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

বাসব ও শৈবাল তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেল। এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন। ট্রেনে কম ধকল যায়নি।

কিরকম বুঝছ? শৈবাল প্রশ্ন করল।

বাসব সিগারেট ধরাচ্ছিল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সকলের সঙ্গে কথা না বলে নিয়ে কোন মন্তব্যই করতে পারছি না।

নিশিকান্তর সঙ্গে বাসবের কথা হল দুপুরে।

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, দেবরাজের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করতে চান না।

কেন?

আপনি আমাকে অন্য প্রশ্ন করুন।

হুঁ। আপনি কি করেন?

কিছুই করি না।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মহিমারঞ্জনের মত ধনী ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাদের আছে, তাদের কিছু করতে হয় না।

মহিমাবাবু আপনার সংসারের সমস্ত খরচ চালান বলছেন?

পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা। আমার জন্যে মহিমার খুব বেশি খরচ হয় না।

আচ্ছা, সুকুমার দত্ত লোকটা কেমন?

ভাল বলেই জানতাম। শুনেছেন বোধহয়, সুজাতাকে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আমাকে এখন ছেড়ে দিতে হবে, মানসিক অবস্থা ভাল নেই। পরে এক সময় বরং—

নিজের কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে নিশিকান্ত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, লোকটা বোধহয় নার্ভাস হয়ে গেছে। চলো ডাক্তার, সুকুমার দত্তর কাছে যাওয়া যাক।

দুজনে পামগ্রোভ থেকে বেরোল। বাসব আগেই জেনে নিয়েছিল, সুকুমার দত্ত কোন্ বাড়িতে আছেন। বাড়িতেই তাঁকে পাওয়া গেল। তিনি

বেসরকারি ভাবে তদন্ত করানোর কথা শুনেছিলেন। বেশ সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়েই দুজনকে অভ্যর্থনা জানালেন সুকুমার দত্ত।

বাসব কাজের কথা পাড়ল।

তিনি বললেন, আমি তো মশাই সেদিন ও-বাড়িতে ছিলাম না।

না থাকলেও, আপনার একটা যুক্তিসঙ্গত মতামত নিশ্চয় আছে?

আমার দৃঢ় ধারণা, দেবরাজকে মহিমা হালদারই খুন করেছে।

এই ধারণা হবার কারণ কি মিস্টার দত্ত?

কারণ পামগ্রোভ। হালদার বাড়িটা কিনতে চেয়েছিল। আমি মোটা টাকা অফার করায় দেবরাজ লোভে পড়ে গেল। সে নিশ্চয় হালদারকে বাড়ি বিক্রির বিষয় অক্ষমতা জানিয়েছিল। রাগ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, তা কারুর অজানা নয়! রাগের মাথায় হালদার—

তাঁকে বাধা দিয়ে বাসব বলল, এখানে যে একটা বড় রকম কিন্তু রয়েছে মিস্টার দত্ত। দেবরাজকে খুন করলেও মহিমাবাবু তো পামগ্রোভ পাবেন না। সুতরাং হাজার রাগ হলেও এতবড় রিস্ক কি তিনি নিতে চাইবেন?

আমি নিজের ধারণার কথা বললাম। প্রকৃত ঘটনা অন্যরকম হলেও হতে পারে।

আপনি 'পামগ্রোভ' কিনতে চেয়েছিলেন কেন?

নির্বিকার গলায় সুকুমার বললেন, হালদার কিনতে চেয়েছিল বলে।

হেসে ফেলল বাসব।

কথাটা ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল। শুনলাম, সুজাতাদেবীকে নিয়ে নাকি আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে।

ইচ্ছে করলে আমি সুজাতার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সুজাতাই বা ওই ওল্ড ফুলটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকবে কেন?

কারুর ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপর আপনি জোর খাটাতে পারেন না। তাছাড়া এসমস্ত ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল—বিশেষে মহিমারঞ্জনবাবু যখন আপনার বিজনেস-পার্টনার।

সুকুমার দত্ত বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, এরপর ওঁর পার্টনার হয়ে আমি থাকব নাকি মনে করেছেন! আমি আলাদা ভাবে ব্যবসায় নামব।

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এবার আমরা চলি মিস্টার দত্ত। আবার হয়ত বিরক্ত করতে আসতে পারি। চিত্তরঞ্জনবাবুর বাড়ি এখান থেকে কতদূর?

নিশ্চয় আসবেন। এই রাস্তারই শেষ প্রান্তে।

দুজনে রাস্তায় নামল।

কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর শৈবাল বলল, আমরা এখন কোথায় চলেছি?

চিত্তরঞ্জনবাবুর বাসায়। কিউলানগুলো একবার দেখা দরকার।

ওরা নির্জন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল।

জায়গাটা বেশ, কি বলো ডাক্তার?

চমৎকার। একবার এসে কিছুদিন এখানে—ওই দেখ—

শৈবালের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাসব দেখল গল্প করতে করতে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুজাতা ও মহিমারঞ্জন আসছেন। ওঁরাও এবার এদের দেখতে পেলেন।

মহিমারঞ্জন চেঁচিয়ে বললেন, কোথায় চলেছেন?

চিত্তরঞ্জনবাবুর ওখানে।

আমরাও ওখানে যাব।

দু দল কাছাকাছি হলেন।

বাসব বলল, কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?

বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সাউথ পয়েণ্টে গিয়ে দেখি আমার ভাগ্নেপ্রবর চিত্তরঞ্জনবাবুর মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে ব্যস্ত রয়েছে। আমি মশাই এসব বাড়তে দিতে চাই না। মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে কথা পাকাপাকি করে ফেলতে চাই।

ভাস্করের প্রতি তিনি কত স্নেহশীল এই কথাতেই বুঝতে পারা যায়।

বাসবের সঙ্গে সুজাতার খাওয়ার টেবিলেই আলাপ হয়েছিল, কিন্তু কোন দরকারি কথা হয়নি।

মিস্টার হালদার, আপনি ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একটু এগিয়ে যান। আমি সুজাতাদেবীর সঙ্গে গোটাকতক কথা যেতে যেতে সেরে নিতে চাই।

বেশ তো।

মহিমারঞ্জন শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে এগোলেন।

আপনাকে গোটাকয়েক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই সুজাতাদেবী, আশা করি, সঠিক উত্তর দেবেন।

বলুন?

আপনার এই জীবন ভাল লাগে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুজাতা বলল, অনেক কিছু হারিয়ে আমি এই জীবনকে আঁকড়ে ধরে আছি। এখন আমাকে সুখী বলা চলে হয়ত।

সুকুমার দত্ত আপনার কাছে এক বিশেষ প্রস্তাব করেছিলেন, আপনি রাজি হলেন না কেন?

কি বলছেন আপনি! মহিমাবাবু আমার কোন অভাব অপূর্ণ রাখেননি। আমি তাঁকে অন্তর দিয়ে ভক্তি করি।

আমার প্রশ্নগুলি একটু বাঁকা ধরনের হচ্ছে, ক্ষমা করবেন। অংশুমানের বিষয়ে কিছু বলুন?

সে আমাকে সহ্য করতে পারে না। এছাড়া তার বিষয় তো কিছু বলবার নেই।

কথা-বার্তায় তো মনে হয় না, তিনি আপনাকে সহ্য করতে পারেন না!

অত্যন্ত চালাক ছেলে, মনের কথা প্রকাশ করে না। তবে ওর হাবভাব দেখে আমি বেশ বুঝতে পারি।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল।—দেবরাজের হত্যাকারী কে হতে পারে এ-বিষয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন?

ওই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। দেবরাজ আমাদের বাসায় কেন খুন হতে গেল ভগবান জানেন।

আর কোন কথা হল না।

চিত্তরঞ্জনবাবুর বাসার সামনে সকলে এসে উপস্থিত হলেন। গৃহকর্তা পোর্টিকোয় দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন সকলকে। মহিমারঞ্জন বাসব ও শৈবালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বাসব বলল, কিউলান দেখতে এলাম।

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, কিউলানগুলি আমার কাছে থাকার দরুণ এক-এক সময় মনে হচ্ছে, আমিই যেন দেবরাজের মৃত্যুর উপলক্ষ্য।

আপনার সংগ্রহ থেকে কিউলান হারিয়েছেন নাকি?

না; তিয়াত্তরটি ছিল, এখনও আছে। আসুন।

তিনি সকলকে নিয়ে সংগ্রহশালায় গেলেন।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল মূর্তিমান মৃত্যুদূতেরা খাঁচার মধ্যে মন্থর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের সুন্দর চেহারার আড়ালে এত খলতা আছে, দেখে বুঝতে পারা যায় না। বাসব কিউলান সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিল চিত্তরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে।

সকলে ড্রইংরুমে এসে বসলেন।

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, খুবই লজ্জায় পড়ে গেলাম। আপনাদের যে চা খাওয়াব তার উপায় নেই। দীপা কোথায় বেরিয়েছে।

মহিমারঞ্জন বললেন, জানি আমরা—সাউথ পয়েণ্টে গেছে। চায়ের জন্যে এখন ব্যস্ত হবেন না।

আমার গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দিন মিস্টার সেন।—বাসব বলল।

বলুন?

দেবরাজকে আপনি চিনতেন?

ভালভাবেই চিনতাম। মারা যাওয়ার দিনও কয়েকবার এসেছিল আমার কাছে।

কি কথাবার্তা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?

বাড়ি কেনা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল।

এ-বাড়িটা আপনার নয় ?

না। আমি পামগ্রোভ—বলতে বলতে থেমে গেলেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

বিস্মিত গলায় মহিমারঞ্জন বললেন, আপনিও পামগ্রোভ কেনবার মনস্থ করেছেন নাকি ?

হ্যাঁ। দেবরাজ আমাকে ব্যবস্থা করে দেবে বলেছিল। সন্ধ্যার সময় এসে জানালে, পারবে না। সুকুমারবাবু নাকি চড়া দাম হেঁকেছেন। এই নিয়েই কথায় কথায় তার সঙ্গে আমার বচসা হয়ে গেল। রাত্রে আমার এখানেই তার থাকার কথা ছিল। রেগে চলে গেল পামগ্রোভে রাত কাটাতে।

আরেকটা প্রশ্ন করছি কিছু মনে করবেন না, দেবরাজের সঙ্গে আপনার মেয়ের কি খুব ভাল আলাপ ছিল ?

ভাল আলাপ কি বলছেন! দীপা কোনদিন দেবরাজের সঙ্গে একটা কথাও বলেছে কিনা সন্দেহ, তাছাড়া দেবরাজ অতি সজ্জন প্রকৃতির ছিল। দীপার সম্বন্ধে কখনও তাকে উৎসুক হতে দেখিনি।

আপনার কথা বোধহয় শেষ হল মিস্টার ব্যানার্জী ? মহিমারঞ্জন বললেন, যে জন্যে এসেছি এবার আমি সেকথা বলব চিত্তরঞ্জনবাবুকে।

আমার ভাগ্নে ভাস্করকে দেখেছেন তো ? চৌকোশ ছোকরা। আমার ফার্মেই কাজ করে, উঁচুপদে। আপনার আপত্তি না থাকলে মণিদীপাকে তার হাতে দিতে পারেন।

অভাবিত এই প্রস্তাব শুনে সচকিত হলেন চিত্তরঞ্জনবাবু, কথাটা পরিপাক করতে একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, এ আমার সৌভাগ্য হালদার মশাই। ভাস্করকে আমার বিলক্ষণ পছন্দ, আপত্তির প্রশ্নই উঠতে পারে না।

প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন, আনন্দিত হলাম। এবার কলকাতায় গিয়ে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে নিন। মেয়ে দিচ্ছেন, পাত্র সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে হবে বৈকি !

ও-কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। মেয়ের জন্যে আমার বেশ চিন্তা ছিল। আমার মত গেঁত লোক···তাকে সৎপাত্রে দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আপনি আমাকে অসম্ভব হাল্কা করে দিলেন।

মণিদীপা বাড়ি ফিরেছিল ; ড্রইংরুমে প্রবেশ করবার পূর্বমুহূর্তে শুনতে পেল, মহিমারঞ্জন ভাস্করের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবে রাজি হলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। সে আর দাঁড়াল না। আবার বাগান পেরিয়ে রাস্তায় এল। ভাস্কর খুব বেশি দূরে এগিয়ে যায়নি তখন, মণিদীপা প্রায় দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

তাকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে ভাস্কর বলল, ফিরে এলে···?

ক'দিনেই অত্যন্ত দ্রুতলয়ে আলাপ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে।

তোমার মামা বাবার সঙ্গে,কথা বলছেন।

বলতে দাও।

কি কথা বলছেন বলতো?

বাঃ আমি কি করে বলব।

ঘাড় হেলিয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে মণিদীপা বলল, ওঁরা আমাদের বিয়ের কথা নিয়েও তো আলোচনা করতে পারেন।

ভাস্কর ঝটিতে মণিদীপার একটা হাত চেপে ধরল। আনন্দের এক প্রবল শিহরণ ওর শিরায় শিরায় বয়ে চলল।

দীপা—

কি হল?

না, বলছিলাম, চল, আবার সাউথ পয়েণ্টে গিয়ে বসি।

পরের দিন বাসব লক্ষ্ণৌ গেল মীরচান্দানির সঙ্গে দেখা করতে। শৈবাল রইল রন্‌গাঁও-এ। বাসবের কীর্তিকলাপের কথা তাঁর অজানা ছিল না, তবু তিনি ওকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারলেন না।

বাসব পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পড়বার পর বলল, খুনের মোটিভ কি বুঝতে পেরেছেন?

আপনি নিজেই বোঝার চেষ্টা করুন না, আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেবেন ভাবতে পারিনি। বুঝতে পারা যাচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান না। আমি সুপারের কাছেই যাচ্ছি। মনে হয়, তা আপনার কাছে খুব সুখকর হবে না!

কাষ্ঠহাসি হেসে ইন্সপেক্টার বললেন, অসহযোগিতার কথা বলছেন কেন? এই জটিল ব্যাপারে আপনি তদন্তে এসেছেন, এতে বরং আমি খুশি হয়েছি। কি করতে হবে বলুন?

মনে মনে হেসে বাসব বলল, এখন কিছু করতে হবে না, ভবিষ্যতে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবেন, তাতেই হবে।

আরো দু-চার কথার পর সে ওখান থেকে বিদায় নিল।

শৈবাল খাওয়া-দাওয়ার পর একাই বেরিয়েছিল, জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখে আসবার জন্যে। ঘণ্টা দুয়েক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসার পথে একটা জিনিস আবিষ্কার করল। পামগ্রোভের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল—ওর দৃষ্টি পড়ল বাউণ্ডারি-ওয়ালের এধারে ঘন ঝোপ, একটা সেগুনগাছকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আর ঝোপের নাম-না-জানা লতার পাতায় পাতায় অসংখ্য কিউলান ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শৈবাল শিউরে উঠল, এখান থেকেই কি একটিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দেবরাজকে খুন করবার জন্যে! ও আর সেখানে দাঁড়াল না, ছুটল বাসবকে সংবাদ দিতে।

বাসব তখন চিন্তিত মনে ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। শৈবালের মুখ থেকে কিউলানদের কথা শুনে বলল, তোমার আবিষ্কার আমার কাজে লাগবে ডাক্তার। বিকেলে গিয়ে দেখে আসতে হবে। এদিকে কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

কি রকম?

আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, দেবরাজকে খুন করার কোন মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার পয়েণ্টগুলো শুনলে তুমিও আমাকে সমর্থন করবে। সেদিন রাত্রে দেবরাজ পামগ্রোভে শুতে যে এসেছিল, তা মহিমারঞ্জন ছাড়া আর কারুর জানা ছিল না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় একথা অনেকেই জানতে পেরেছিল, তা হলেও কিউলানদের সাহায্যে দেবরাজকে হত্যা করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ সেই গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে থেকে কিউলান সংগ্রহ করে, সকলের অগোচরে বিছানায় ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয় অবাস্তব। খুনের পদ্ধতি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, হত্যাকারীকে অনেক আগে থেকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সে কিউলানের চাকের সন্ধান করেছিল আগেই। সেখান থেকে পোকা সংগ্রহ করে এনে মহিমারঞ্জনের বিছানায় ছেড়ে রেখেছিল। বিছানায় শোবার পরই যাতে—

উত্তেজিত গলায় শৈবাল বলল, তুমি বলতে চাও, হত্যাকারী মহিমারঞ্জনকে খুন করতে চেয়েছিল?

একজ্যাক্টলি! নইলে তুমি ভেবে দেখ ডাক্তার, এ-রকমটা হবার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পাবে না। নিঃসন্দেহে দেবরাজ গৌন চরিত্র, এখানে আসবার আগে তার সঙ্গে কারুর পরিচয় ছিল না। এখানেও সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হয়েছিল তাও নয়। কারুর স্বার্থে সে হানি ঘটায়নি। এ-কথাও জোর গলায় বলা যায়, কারুর স্বার্থের সে প্রতিবন্ধক ছিল না। তবে—

একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না ভাই।

কোন্ বিষয়ে?

তুমি বলছ, দেবরাজ কারুর স্বার্থে হানি ঘটায়নি। আমি তো দেখতে পাচ্ছি, একই স্বার্থে সংশ্লিষ্ট তিনটি লোককে সে লেজে খেলিয়েছে। মহিমারঞ্জন পামগ্রোভ কিনতে চাইলেন, সে বাড়িটা তাঁকে পাইয়ে দেবে বলে কথা দিল। আবার একই পার্ট প্লে করল সে মিঃ দত্ত ও চিত্তরঞ্জনবাবুর কাছে। সুতরাং একটা মোটিভ প্রো করেনি কি?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, পয়েণ্ট তুমি রেজ করেছ বটে, ধোপে কিন্তু টিঁকবে না ডাক্তার। তোমার কথামত যদি ধরেও নেওয়া যায়, বাড়ি

বিক্রির ব্যাপারে দেবরাজের চতুরতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনজনের মধ্যে কোন একজন তাকে খুন করেছেন—তা হলেও তো সেই বিশেষ ব্যক্তির পামগ্রোভের অধিকারি হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ির মালিক হলেও অনুমান করা যেত স্বত্ব লিখিয়ে নিয়ে খুন করা হয়েছে। দেবরাজ দালাল ছিল—সুতরাং বাড়ি পাওয়ার লোভে দালালকে খুন করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। যা হোক আমি একটা লিস্ট তৈরি করেছি, পড়ে দেখ।

বাসব পকেট থেকে কয়েক ভাঁজ কাগজ বার করে শৈবালের হাতে দিল।

শৈবাল একাগ্র মনে পড়তে আরম্ভ করল ঃ

মহিমারঞ্জন— ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে দেবরাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তিনি নিজের ঘরে রাতের মত তাকে আশ্রয় দিয়ে পাশের ঘরে চলে যান। যাবার আগে দেবরাজের সঙ্গে পামগ্রোভ নিয়ে কিছু কথা-কাটাকাটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুজাতা দেবীকে নিয়ে মিঃ দত্তর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড সেই ঘটনার জের হওয়া সম্ভব নয়।

চিত্তরঞ্জন সেন—তাঁর সংগ্রহে কিউলান আছে। পামগ্রোভের কেউ ওই বিষাক্ত পোকাটির সম্পর্কে কিছু জানতেন না। চিত্তরঞ্জনবাবু তথ্যটি প্রকাশ করেন। আপাতদৃষ্টিতে এমন কোন স্বার্থ চোখে পড়ছে না, যাতে জোর করে বলা চলে তিনি দেবরাজকে খুন করেছেন বা মহিমারঞ্জনকে খুন করার পরিকল্পনা করেছেন। তবে মোটা টাকার বিনিময়ে কাউকে কিউলান সরবরাহ করে থাকতে পারেন।

সুজাতা—নোংরা পরিবেশ থেকে তুলে আনলেও এঁকে প্রায় স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন মহিমারঞ্জন। তিনিও মহিমারঞ্জনকে যোগ্য সম্মানই দিয়ে থাকেন। নইলে সুকুমার দত্তর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহজেই সরে পড়তে পারতেন। দেবরাজকে খুন করার কোন মোটিভ তাঁর থাকা সম্ভব নয়। মহিমারঞ্জন তাঁকে বৈভবে ডুবিয়ে রেখেছেন এবং উপরোক্ত কারণে সুজাতার পক্ষে মহিমারঞ্জনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ঘটনা।

অংশুমান—বাপের দুর্বল চরিত্রকে ইনি ভাল চোখে দেখেন না। স্থানে অস্থানে রাগে ফেটে না পড়লেও, সুজাতাদেবী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সহযোগিতামূলক নয়। বাপের পাপ কাজের সহায়ক বলে নিশিকান্তকে ইনি ঘৃণা করেন। এক অজানা কারণে ভাস্করবাবুকেও সহ্য করতে পারেন না। তবু তিনি যে মহিমারঞ্জনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, একথা নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়া চলে না। কারণ বৃদ্ধ মহিমারঞ্জন আর কতদিন বাঁচবেন। তিনি মারা যাবার পর স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত সম্পত্তি এঁর হাতে আসবে এবং সুজাতা-

দেবীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। সুতরাং মার্ডার করবার মত বিরাট রিস্ক অংশুমান নিতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না।

নিশিকান্ত—মহিমারঞ্জনের এই বন্ধুটি কিন্তু ভীতু ও লোভী বলে মনে হয়। সব সময় মহিমারঞ্জনের মন জুগিয়ে চলে কিছু লাভের আশায় সুতরাং যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ছে, তাকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার মত বোকা তিনি নন।

অপরূপ সরকার—স্থান বদল করে তিনি এঁদের সঙ্গে এখানে দৈবাৎ চলে এসেছেন। বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী লোক। এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে নাক গলাবার কোন স্বার্থ থাকতে পারে বিশ্বাস করা যায় না।

ভাস্কর— মামার আশ্রিত এই ছেলেটি অত্যন্ত সরল এবং প্রাণবন্ত। অংশুমানের সমস্ত অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করে। মামাকে খুন করার পরিকল্পনা তার থাকা উচিত নয়। মামা না থাকলে অংশুমান যে তাকে এখনকার মত রাজার হালে রাখবে না তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। সে চিত্তরঞ্জনবাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছে। তাদের বিয়ের কথাও পাকাপাকি হয়ে গেছে।

মণিদীপা—চিত্তরঞ্জনবাবুর অনেক কাজে সে সাহায্য করে। এমনকি পোকা-মাকড় পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনে দেয়। তার মন অত্যন্ত পরিষ্কার। স্বার্থের কথা চিন্তা করলে মহিমারঞ্জনের উত্তারাধিকারী অংশুমানের দিকেই সে ঝুঁকতে পারত।

সুকুমার দত্ত—অত্যন্ত ঘোরাল চরিত্রের লোক তিনি। প্রচুর বিত্তের অধিকারি। ইচ্ছে করলেই একটি সুন্দরী নারী তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। তবু অনিচ্ছুক সুজাতাদেবীকে তিনি মহিমারঞ্জনের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। ওই নিয়ে দুজনের মধ্যে বিবাদ এবং তাঁর পামগ্রোভ ত্যাগ। একই বাড়ি কেনার জন্য দুজনের জেদ। স্বাভাবিক ভাবে এ সন্দেহ জাগতে পারে মনে, তিনি মহিমারঞ্জনকে হত্যা করার পরিকল্পনা হয়ত করেছিলেন। ভাগ্য সহায়ক হওয়ায় নিরপরাধ দেবরাজ প্রাণ দিয়েছে।

পড়া শেষ করে শৈবাল বলল, একমাত্র সুকুমার দত্ত ছাড়া আর কাউকে তো সন্দেহভাজন বলে মনে হচ্ছে না। তবে তিনি এতটা এক্সপোজড হবার পরও খুন করার ঝুঁকি নেবেন কি?

বাসব বলল, অনেক সময় তাও হয় ডাক্তার। ধর, তোমার ও আমার মধ্যে মনোমালিন্য আছে। সকলেই জানে একথা। তুমি আমাকে কৌশলে খুন করে বসলে। লোকে কিন্তু প্রথমে তোমাকে মোটেই সন্দেহ করবে না। সকলের ধারণা হবে, খোলাখুলি ভাবে যার সঙ্গে ঝগড়া আছে, তাকে তুমি কখনোই খুন করতে পার না। এ তো দারুণ বোকামি। হতে পারে

সুকুমারবাবু এই মনস্তত্ত্বের সুযোগ নিয়েছিলেন।

বটেই তো! আমি সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দিক লক্ষ্য রাখছি। দেখা যাক অদূরে ভবিষ্যতে কি হয়।

এরপরের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত ঘটল।

বাসব চিত্তরঞ্জনবাবুকে গিয়ে অনুরোধ জানাল, তিনি যেন আজ বিকেলে আরেক দিনের মত পামগ্রোভের সকলকে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এও জানিয়ে দিল, হত্যা-রহস্যের তদন্তের সুবিধার জন্যই এই অনুরোধ। কোন মূল্যেই কথাটা ফাঁস করা চলবে না। চিত্তরঞ্জনবাবু বাসবের প্রস্তাবে রাজি হলেন। এবং তখুনি আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন গিয়ে। মহিমারঞ্জন 'আবার, কেন, ইত্যাদি বলে আপত্তি করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত করেননি।

নির্দিষ্ট সময় সকলে পামগ্রোভ থেকে যাত্রা করলেন। মহিমারঞ্জন ও সুজাতা আগে চললেন। ছিমছাম পোশাকে সজ্জিতা সুজাতা। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ওঁদের পিছনে আর সকলে। বাসব ও শৈবাল সবশেষে ভাস্করের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলল।

চিত্তরঞ্জন অতিথিদের সমাদরে গ্রহণ করলেন। লনে পাতা বেতের চেয়ারে সকলে বসলেন ছড়িয়ে। মণিদীপাকে চা খাবারের ট্রে বয়ে আনতে দেখা গেল। এই সময় বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে মিনিট পনেরোর জন্য ক্ষমা করতে হবে।

কোথাও যাবেন নাকি?

আগে থেকে স্থির হয়েছিল। আমি একেবারেই ভুলে গেছি। ইন্সপেক্টর মীরচান্দানি সাউথ পয়েন্টে এখন আমার জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন।

সবিস্ময়ে মহিমারঞ্জন বললেন, সাউথ পয়েন্টে কেন?

সংবাদ পাওয়া গেছে সেদিন দেবরাজ সন্ধ্যার পর একজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সেই ব্যক্তিটির পরিচয় আমাদের জানা দরকার। ওখানে কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। পনেরো মিনিটের বেশি বোধহয় দেরি হবে না। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরবার চেষ্টা করব।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে না নিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা হওয়ার মুখে চিত্তরঞ্জনবাবুর বাড়ি থেকে সকলে ফিরে এলেন। বাসবও সঙ্গে ছিল। ও আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসেছিল ওখানে। সকলের সঙ্গে ভাস্কর অবশ্য পামগ্রোভে ফেরেনি। মাঝপথেই ও দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এখন সে মণিদীপার চোখের ভাষা বুঝতে পারে। ভাস্কর বুঝতে পেরেছিল, ও এখন সাউথ পয়েন্টে তার সঙ্গে বসে গল্প করতে চায়।

বাগানের ধারের বারান্দায় এসে সকলে বেশ ক্লান্ত ভাবেই চেয়ারে বসলেন। মহিমারঞ্জনের হেলান দেওয়া চেয়ারটা খালি রইল। পামগ্রোভে এসে অবধি তিনি ওই চেয়ারটায় বসতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

তিনি রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাজের কিছু সুবিধা করতে পারলেন ?

চরম সুবিধার দিকেই এগোচ্ছি ধীরে ধীরে।

ধীরে ধীরে এগোলে চলবে না,—অংশুমান বলল, যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। এখানে কতদিন আটকে থাকব ? আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করা হল হত্যাকারী যাতে তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে। এদিকে—

নিশিকান্ত বললেন, সুনাম তো আপনার প্রচুর শুনতে পাই, অথচ কার্যক্ষেত্রে তো তেমন কিছু দেখছি না।

বাসব গম্ভীর গলায় বলল, ধৈর্য ধরুন। যা শুনছেন তার ব্যতিক্রম এখানেও হবে না।

অনন্তকাল ধৈর্য ধরে থাকা যায় না মশাই। কি উটকো ঝামেলায় আমরা ফেঁসে রয়েছি বলুন তো ? যা হয় হেস্তনেস্ত করে আমাদের রেহাই দিন।

আঃ, কি হচ্ছে নিশিকান্ত ! দ্রুত গলায় মহিমারঞ্জন বললেন, উনি সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ আছে কি ?

বাসব বলল, দেখুন, আমি ভগবান নই। বা আমার দিব্য চক্ষু নেই যে, ঘটনাস্থলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারব হত্যাকারী কে ? আমাকে বিভিন্ন তথ্য ও সূত্রের উপর নির্ভর করে সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হচ্ছে। তবে এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, হত্যাকারী মুখ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। তাকে যে কোন উপায়ে আমি ধরবই।

মহিমারঞ্জন কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বললেন না। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সকলে দেখলেন, নুড়িঢালা ড্রাইভওয়ের ওপর দিয়ে মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে সুকুমার দত্ত। সেই বিশ্রী ঝগড়ার পর তিনি যে আবার পামগ্রোভে পা দেবেন কেউ ভাবেনি।

চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এসেছিল। বাগান ও বারান্দার মধ্যেটায় আবছা ভাব বিরাজ করছিল। অপরূপ সরকার উঠে গিয়ে আলোটা জ্বাললেন। মহিমারঞ্জনের চেয়ার তখনও খালি ছিল, রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। বলা বাহুল্য সুকুমার দত্তকে দেখে তাঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিরক্তির ছায়া ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠেছিল মুখের ভাব ও ভঙ্গিতে।

সুকুমার নির্বিকার মুখেই বারান্দায় উঠে এলেন।

মহিমারঞ্জন সিগারেটের টুকরোটা বাগানে ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক গলায়

বলবার চেষ্টা করলেন, কিছু বলবে নাকি ?

হাওয়া খেতে এখানে আসিনি, এটা ঠিক।

আবার কি বলতে চাও ? তোমার মত লোককে আর বেশি প্রশ্রয় দিতে চাই না।

সুকুমার গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি মনে করেন, আপনার সঙ্গ পাবার জন্য আমি লালায়িত ? আমার মনোভাব যদি সেরকম হত, তাহলে আপনাকে খোসামোদ করে চলতাম। নিজের সম্পর্কে আপনার উঁচু ধারণা থাকতে পারে, তবে তা সকলের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না স্মরণ রাখবেন।

তোমার মুখে কোন উপদেশ শোভা পায় না। নিজের চরিত্র আগে সংশোধন কর।

চরিত্র ! হালদারমশাই, আপনি আমাকে অবাক করলেন। নিজে ওপেনলি বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছেন, অথচ চরিত্রের খুঁত বার করতে পশ্চাদপদ নন—চমৎকার !

তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে উঠল অংশুমান,—মিস্টার দত্ত, প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা আছে ! আপনি নিজেকে ভাবেন কি ? সংযত ভাষায় কথাবার্তা না বললে---

কি করবে ? মারবে নাকি ?

অংশুমানকে বাধা দিলেন মহিমারঞ্জন, তুমি চুপ কর অংশু, কথা হচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে। কথা বাড়ালেই কথা বাড়বে দত্ত, যা বলতে এসেছ শেষ কর।

সুকুমার বললেন, সেদিন বলেছিলেন, কলকাতায় ফিরে আপনি ব্যবসায়ের অংশ আলাদা করে নেবেন ! আমার আপত্তি ছিল না, এখনও নেই। আমি বলতে এসেছি, কলকাতা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। খুঁটিনাটি সমস্ত কথা এখানেই শেষ করে নিতে চাই, ওখানে গিয়ে শুধু সেপারেশন ডিডটা তৈরি হবে।

সবিস্ময়ে মহিমারঞ্জন বললেন, তা কি করে সম্ভব। এখানে কোন কাগজ পত্র নেই, সেগুলো না দেখে কথাবার্তা হবে কিভাবে ? আমি তো বুঝতে পারছি না, এত তাড়াতাড়ি করবার কি আছে ?

আপনি বুঝতে পেরেও যদি না-বোঝার ভাণ করেন, আমি নাচার। তবে নিজের স্বার্থে আমায় ডিটেণ্ড করতেই হবে। এখানে আর কতদিন থাকতে হবে বলা যায় না। আমি ম্যানেজারকে লিখেছি কাগজ-পত্রের নকল পাঠাতে, আগামীকালই হয়ত চলে আসবে।

এখানে এ-সমস্ত করতে যাওয়ার কোন মানে হয় না, স্রেফ আমাকে বিরক্ত করবার জন্য তুমি এই কাণ্ড করতে চলেছ।

আপনার সম্পর্কে আমার আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাড়াতাড়ি করতে আসার জন্য যদি কেউ দায়ী হয়, তবে সে আপনারই ছেলে।

অংশুমান আকাশ থেকে পড়ল—আমি—

হ্যাঁ, তুমি। তোমারই নেগ্লিজেন্সে ছ'লাখ টাকার একটা কণ্ট্রাক্ট হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে, কয়েকদিন আগেই সংবাদ আমি পেয়েছি। কাজেই এইভাবে নিজের ক্ষতির মাত্রা আমি আর বাড়তে দিতে চাই না।

সেকি!

মহিমারঞ্জন হতবাক হয়ে যান।—অংশু, দত্ত যা বলছে·

না, মানে আসল কথা হল কিন্তু··।—অংশুমান ইতস্তত করতে লাগল।

সুকুমার দত্তর মুখের ওপর হাসি ঝলসে উঠল,—ওর ইতস্তত ভাব দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। তাছাড়া এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন না।

তিনি পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বার করে মহিমারঞ্জনের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

মহিমারঞ্জন হাতে নিলেন চিঠিটা। কোটের বুকপকেট থেকে চশমা বার করে চোখে দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

উপস্থিত আর সকলে নিজের নিজের চেয়ারে নিশ্চলভাবে বসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই অপ্রীতিকর কথাবার্তায় সকলে সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে মহিমারঞ্জনের খালি হেলান দেওয়া চেয়ারটায় সুকুমার দত্ত বসলেন। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সুজাতার দিকে দৃষ্টি হানলেন বারকয়েক। সুজাতা ভ্যানিটি ব্যাগ কোলে নিয়ে ভ্রু-কুঁচকে বসে রয়েছে।

চিঠি পড়া শেষ করে মহিমারঞ্জন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। বাসব বিদ্যুদ্বেগে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে সুকুমার দত্তর হাত ধরে প্রচণ্ড টান দিল।

টাল সামলাতে না পেরে সুকুমার কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। লোহার রেলিঙে ঘষটানি লেগে তাঁর কপালের ইঞ্চি-দুয়েক চামড়া উঠে গেল, তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন।

বাসবের কাণ্ডকারখানায় সকলে হতবাক।

কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়তে ঝাড়তে সুকুমার দত্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এরকম রসিকতা আমি পছন্দ করি না। বড়রকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারত, সে খেয়াল আপনার ছিল?

বরং বলুন, চরম অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করলাম।

বাসব হাত প্রসারিত করে বলল, দেখতে পাচ্ছেন—

সকলে আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন, সুকুমার যে চেয়ারে বসেছিলেন, তার হাতলের ওপর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে একটা কিউলান।

মৃত্যুদূত যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। তার নক্সা-কাটা পিঠের ওপর আলো পড়ায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

পোকাটাকে দেখার পর সকলে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ ছিলেন। তারপর হুড়মুড় করে যে-যার চেয়ার ছেড়ে সরে এলেন নিরাপদ দূরত্বে। মৃত্যুকে সকলেই ভয় পায়। ওই ভয়াবহ জীবটির দংশনে কেউই জীবনের পরপারে যেতে চায় না। চেয়ারের হাতল থেকে কিউলান তখন কুশানে নেমে পড়েছে। সকলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন মহিমারঞ্জন। উত্তেজিত গলায় বললেন, মেরে ফেল ওটাকে, দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে দুশ্চিন্তার সীমা থাকবে না। কখন কাকে কামড় দেবে ঠিক নেই।

তাঁর কথা শুনে কেউ এক ইঞ্চি এগিয়ে গেলেন না। বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়, অতি ক্ষুদ্র একটা পোকা, তবু তাকে মারতে কারুর সাহস হচ্ছে না।

অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে সুকুমার দত্ত হাঁপাচ্ছিলেন। হাত-পা তাঁর কাঁপছিল। তিনিও চিৎকার করে উঠলেন, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন কি! শেষ করে দিন পোকাটাকে।

কিউলান কুশনের ওপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এগিয়ে আসতে লাগল সকলের দিকে। পায়ে পায়ে পেছুতে লাগলেন সবাই। বাসব নির্বিকার মুখে পোকাটার গতিবিধি-নিরীক্ষণ করছিল। এই সময় শৈবাল এগিয়ে গিয়ে জুতোর তলায় পিষে ফেলল ওটাকে। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু কেউই নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন না। সকলের এক ভয়, তাঁর চেয়ারের হাতলে যদি একটা কিউলান দেখা যায়!

অপরূপ সরকার বললেন, কি ভয়ানক! ভাগ্যিস সময় মত পোকাটাকে বাসববাবু দেখে ফেলেছিলেন, নইলে—

মহিমারঞ্জন বললেন, মৃত্যুর এত কাছাকাছি থাকার কোন অর্থ হয় না। কাল সকালেই বাড়ি বদল করতে হবে। বাগান থেকেই কিউলানটা উঠে এসেছে বারান্দায়।

বাসব বলল, আপনি ভয় পাবেন না মিস্টার হালদার। বাড়ি বদল করবার কোন প্রয়োজন নেই। বাগানে একটাও কিউলান খুঁজে পাবেন না। প্রকৃত ব্যাপার হল, কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে পোকাটাকে ওখানে ছেড়ে দিয়েছিল।

বলেন কি? মহিমারঞ্জন বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে।

আর সকলে বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন।

হ্যাঁ। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমি দেখতে না পেলে মিস্টার দত্তর মৃত্যু রোধ করা যেত না।

সুকুমার দত্ত প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

গম্ভীর গলায় বললেন, আমাকে মারবার জন্য এতবড় চক্রান্ত আপনি করতে

পারলেন মিস্টার হালদার ?

নিশ্চয় না। আমার সম্পর্কে তোমার এই উক্তি উইথড্র করা উচিত। আমি জানব কিভাবে তুমি এখানে আসবে। তুমি আসবার পর চেয়ারের কাছে গেলাম কখন ? রেলিংয়ের কাছেই তো দাঁড়িয়ে আছি।

মহিমারঞ্জনের কথার উত্তরে সুকুমার দত্ত আর কিছু বলতে পারলেন না। ইন্সপেক্টর মীরচান্দানিকে এই সময় দেখতে পাওয়া গেল বাগানের গেটের সামনে। তিনি বাসবকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। বাসব গেটের সামনে উপস্থিত হতেই ইন্সপেক্টর বললেন, এই অচল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে চাই মিস্টার ব্যানার্জী। এখুনি আমি চিত্তরঞ্জন সেনকে হাজতে নিয়ে যাব।

সেকি! কোন সূত্র পেয়েছেন কি ?

আপনার মত কেতাবী প্রথায় আমি তদন্ত করি না,—ইন্সপেক্টরের কথায় শ্লেষের আমেজ,—বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলে রহস্যের কিনারা কি হয় মশাই ? কিউলানের আদি-অন্ত জানা আছে সেনমশাইয়ের এবং তাঁরই সংগ্রহে আছে অসংখ্য ওই মারাত্মক পোকা। তিনি দেবরাজকে ফলো করে এ-বাড়িতে এসেছিলেন। একটা পোকা জানলা গলিয়ে সহজেই ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছেন। আমি অনেক চিন্তা করে তাঁর সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

কিন্তু একটা মোটিভ তো থাকা চাই ?

মোটিভ আছে বৈকি! পূর্বশত্রুতা ছিল। কিম্বা এই বাড়ি নিয়ে ঝগড়া পাকিয়ে ওঠার পরই—

ওয়ারেণ্ট সঙ্গে এনেছেন নাকি ?

না। আগে চাপ দিয়ে কথা বার করি, তারপর—

শুনুন মিস্টার মীরচান্দানি, ওঁকে থানায় নিয়ে যাবেন না। আপনি ভুল পথে যাচ্ছেন। আমি প্রমাণ করে দেব, উনি খুন করেননি—শুধু আমাকে দিন চারেক সময় দিতে হবে।

আপনি বললেই কথাটা আমায় মানতে হবে ?

গলায় জোর দিয়ে বাসব বলল, সে আপনার ইচ্ছে। তবে আপনি নিজে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারলে আমি খুশি হতাম। একজন নিরপরাধ ভদ্রলোককে হ্যারাস করার দায়িত্ব অনেক, সে-কথা নিশ্চয় আপনার অজানা নেই ? মোটিভকে এত হাল্কা চোখে দেখবেন না। দেবরাজকে হত্যাকারী খুন করতে চায়নি, সম্পূর্ণ অবস্থা বিপাকে পড়ে সে মারা পড়েছে। জানলা দিয়ে পোকাটা গলিয়ে ফেলার যে কথা বলছিলেন না ? তাও সম্ভব নয়, এই ঠাণ্ডার জায়গায় কেউ জানলা খুলে শোয় না।

মীরচান্দানি বিব্রত হলেন,—তাহলে বলছেন—

আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে, চারদিন আর অপেক্ষা করতে হবে। আপনি এখুনি শহরে ফিরবেন কি ? একটা লিফ্‌ট চাই। একটু অপেক্ষা করুন।

বাসব ফিরে এল বারান্দায়। শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, ডাক্তার, আমাকে এখনি শহরে যেতে হচ্ছে, দিন তিনেক পরে ফিরব। মিস্টার হালদার, আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মহিমারঞ্জন বিস্মিত গলায় বললেন, আমাকে—

আপনি যদি চান হত্যাকারী ধরা পড়ুক, তাহলে আপত্তি করবেন না। সমস্ত বুঝিয়ে বলব পরে। তাড়াতাড়ি উপযোগি জামা-কাপড় সঙ্গে নিয়ে নিন।

মহিমারঞ্জন আর আপত্তি করলেন না। সুজাতাকে নিম্ন গলায় কি বললেন। সুজাতা উঠে গেল ওখান থেকে। ফিরে এল মিনিট দশেক পরে, ছোট একটা সুটকেশ হাতে নিয়ে। দুজনে জিপে এসে বসবার পর গাড়ি ছেড়ে দিলেন ইন্সপেক্টার। তাঁকে চিত্তরঞ্জন সেনের বাড়ির দিকে আর যেতে দেখা গেল না, শহরের পথ ধরলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রশ্ন করলেন, লক্ষ্ণৌ-এ যেতে চান, না আর কোথাও ?

বাসব বলল, লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা যাব। মিঃ হালদারের জন্য প্রথম শ্রেণীর কোন হোটেলে ঘর রিজার্ভ করে দেবেন। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওঁর ওপর দৃষ্টি রাখতে ভুলবেন না যেন।

বিপন্নভাবে মহিমারঞ্জন বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকুন মিস্টার হালদার।

কলকাতায় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটল বাসবের।

হোমিসাইড স্কোয়াডের মিঃ সামন্ত ওকে আশাতীতভাবে সাহায্য করলেন। ব্যাঙ্কে যে এনকোয়ারি ছিল, তাঁর সহযোগিতা না পেলে সফল হওয়া যেত না। একটি বাড়ি একরকম বে-আইনীভাবে খানাতল্লাসী করা সম্ভব হল তাঁর দাপটে।

হাসি মুখেই চতুর্থ দিন মহিমারঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে বাসব রনগাঁও ফিরল, তখন বেলা দশটা ; সকলে বারান্দায় বসেছিলেন।

অপরূপ সরকার প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এবার এখান থেকে মুক্তি পাব মিস্টার ব্যানার্জী ? কেস সল্‌ভ হয়ে গেছে ?

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বাসব বলল, আমি বিশেষ সুবিধা করতে পারলাম না। তবে আপনারা কালই বোধহয় এখান থেকে রওনা হতে পারবেন, ইন্সপেক্টার চিত্তরঞ্জন সেনকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন।

এই কথায় কেউ কোন মন্তব্য করলেন না।

এলোমেলভাবে কথাবার্তা চলতে লাগল। ক্রমে সময় হয়ে হল দুপুরের আহারের, সকলে উঠলেন।

বাসব সুজাতাকে জানাল, খিদে না হওয়ার দরুণ ও খাওয়ার টেবিলে

উপস্থিত থাকতে পারবেন না। পরে এক গেলাস গরম লেবুর জল খেয়ে নেবে।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

সকলে আবার বারান্দায় এসে বসলেন। বাসব দুপুরে মহিমারঞ্জনকে চোখের আড়াল করেনি, নিজের কাছে কাছে রেখেছে। কথাবার্তা তেমন জমছিল না। নিশিকান্তকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল, তিনি চেয়ারের হাতলে ঘন ঘন চাপ দিচ্ছিলেন। অংশুমান মুখে অস্থিরতা ফুটিয়ে বসেছিল। ভাস্কর দাঁড়িয়েছিল রেলিঙে হেলান দিয়ে। সুজাতা ভ্যানিটি ব্যাগ কোলে নিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিল। মহিমারঞ্জন পায়চারি করছিলেন। অপরূপ সরকার সিগারেটের ধোঁয়ার জাল বুনছিলেন। বেশ বুঝতে পারা যায় সকলের মনে একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। শৈবাল সেখানে নেই, বাসবের কথায় সে গেছে সুকুমার দত্ত ও সকন্যা চিত্তরঞ্জনবাবুকে ডেকে আনতে।

একসময় সুজাতা নড়েচড়ে বসে বাসবকে প্রশ্ন করল, এখন আপনার শরীর কেমন আছে ?

এখন ভাল। ট্রেনের ধকলে শরীরে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল।

নিশিকান্তর উসখুস ভাব ও গম্ভীর মুখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পায়চারি বন্ধ করে মহিমারঞ্জন প্রশ্ন করলেন, নিশি, তোমার কি হয়েছে বলত ? মুখের অবস্থা এমন অন্ধকার কেন ?

নিশিকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—আমার সুটকেশ থেকে কিছু কাগজপত্র চুরি গেছে ভাই।

চুরি গেছে !

আজই চুরি গেছে, গতকাল রাত্রেও সুটকেশে সেগুলো দেখেছিলাম।

অপরূপ সরকার বললেন, আপনিও আশ্চর্য লোক মশাই ! এসেছেন হাওয়া বদল করতে, দরকারি কাগজপত্র ট্যাঁকে বেঁধে না আনলে কি চলত না ?

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে নিশিকান্ত বললেন, সঙ্গে করে যদি এনেই থাকি, তাই বলে চুরি যাবে নাকি ?

বাসব হাই তুলল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমি জানি কে চুরি করেছে।

সকলে সাগ্রহে ওর দিকে তাকালেন।

নিশিকান্ত বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি জানেন ?

বললাম তো, জানি। যাক, ওঁরা এসে পড়েছেন⋯ইন্সপেক্টারও ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছেন দেখছি।

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, শৈবালের পিছু পিছু সুকুমার দত্ত, মণিদীপা ও চিত্তরঞ্জন সেন আসছেন। জিপ থেকে নামছেন ইন্সপেক্টার মীরচান্দানি। গোটা কয়েক চেয়ার আনানো হল, আগন্তুকরা আসন গ্রহণ করলেন।

মীরচান্দানি বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ইন টাইম এসেছি

বোধহয় ?

জাস্ট ইন টাইম। বাসব সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আপনারা সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন, এবার আমি নিজের কর্তব্য শেষ করতে পারি। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমার কাছে সমস্ত রহস্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি জানতে পেরেছি, কে খুন করেছিল। হত্যাকারীর নাম বলার আগে কিছু ভূমিকার প্রয়োজন আছে, তা আগে সেরে নিতে চাই। আপনাদের প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই, দেবরাজকে খুন করার জন্য কোন চক্রান্ত হয়নি। সে বেচারা ভাগ্যদোষে মারা পড়েছে। হত্যাকারী আসলে মিস্টার হালদারকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে চেয়েছিল।

আমাকে !!!—মহিমারঞ্জনের গলা কেঁপে উঠল।

হ্যাঁ, আপনাকে। আপাতদৃষ্টিতে আপনাকে হত্যা করার কোন সঙ্গত কারণ অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। অর্থ-ঘটিত ব্যাপারে যে এই চক্রান্ত, তাও নয়। মোটিভ অন্যত্র মুখ লুকিয়ে আছে। আসল কথায় আবার ফিরে আসা যাক। সেদিন যে দেবরাজ এই বাড়িতে রাত কাটাবে, তা কারুর জানা ছিল না। রাত কাটালেও পার্টিকুলার ওই ঘরে সে থাকবে এমন নিশ্চয়তা কখনই ছিল না। সে দৈবাৎ এসে পড়ায় এবং সকলে ঘুমিয়ে পড়ায় কাউকে না ডেকে মিস্টার হালদার তাকে নিজের সুসজ্জিত ঘর ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বোধহয় সে বিছানায় শুয়ে পড়বার পরই কিউলান তাকে কামড়ে ধরে। সুতরাং যে বিছানায় নিশ্চিতভাবে মিস্টার হালদারের শোবার কথা আছে, সেখানে দেবরাজকে হত্যা করার জন্য কিউলান ছেড়ে রাখা হবে না নিশ্চয়। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, মিস্টার হালদার স্বয়ং কোন কারণে দেবরাজকে হত্যা করার জন্য কিউলানের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই প্রশ্নকে সঙ্গত প্রসঙ্গত প্রশ্ন হিসেবে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না। কারণ তিনি বোকা নন, নিজের ঘরে কাউকে খুন করার দায়িত্ব কখনই নিতে চাইবেন না। আমার অনুমান যে সঠিক, তা প্রমাণ হয়ে গেল কিউলানের দ্বিতীয় আবির্ভাবে। সেদিন সকলে যে-যার চেয়ারে বসেছিলেন। মিস্টার হালদারের চেয়ার খালি ছিল, তিনি রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিস্টার দত্তর আসবার কথা ছিল না, তিনি হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। বসেছিলেন ওই চেয়ারে। আমি সতর্ক না থাকলে, নিশ্চিতভাবে সেদিন তিনি মারা পড়তেন। এখন আপনারা বুঝতে পারছেন, ফাঁদটা পাতা হয়েছিল কার জন্য। মিস্টার দত্ত এসে না পড়লে, মিস্টার হালদার চেয়ারে বসতেন এবং সকলের সামনেই মারা পড়তেন। এই জন্যই আমি তাঁকে চোখের আড়াল করতে চাইনি। দুবার হত্যাকারী বিফল হয়েছে, তৃতীয়বার সফল হতে পারে। আমার অনুপস্থিতিতে যাতে এই কাণ্ড না ঘটে, তাই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম শহরে। এবং আজ সমস্ত দিন তাঁর কাছে কাছেই থেকেছি।

যে কোন কারণেই হোক, কলকাতায় হত্যাকারী এ-কাজ করতে চায়নি। হয়ত ডাইরেক্ট সন্দেহ তার ওপর পড়তে পারে, এই বিবেচনা করে সে পিছিয়ে ছিল। চিত্তরঞ্জনবাবু নিজের পোকার কালেকশন দেখাবার জন্য সকলকে আহবান করেছিলেন। সেখানেই হত্যাকারী কিউলানের সন্ধান পায়, এবং চিত্তরঞ্জনবাবুর মুখ থেকে জানতে পারে তার ভয়াবহ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। মিস্টার সেন যদি জানতেন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে একজনের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছেন, তাহলে বোধহয় কিউলান সম্পর্কে কিছু বলতেন না। সম্পূর্ণ কোয়ান্সিডেন্স বলতে হবে, হত্যাকারী আবিষ্কার করে এক জায়গায় পোকাগুলি চাক বেঁধে আছে। সেখান থেকে গোটা কয়েক কিউলান সে সংগ্রহ করে নেয়। পরে সেই জায়গাটি ডাক্তারও দেখে ফেলে। পোকা সংগৃহীত হবার পর হত্যাকারী কিভাবে মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছিল আপনারা শুনেছেন।

বাসব থামল।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন। সকলের দৃষ্টি বাসবের ওপর নিবদ্ধ। ও সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, সর্বাগ্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই নাটকীয় লীলার জন্য তৎপরতা। ও-বিষয়টি নিয়ে আমি প্রথমেই চিন্তা করে দেখেছি। মোটিভ কী? মোটিভ জানতে পারলে রহস্য সরল হয়ে যায়। অথৈজলে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন বলতে গেলে অভিজ্ঞতার জোরেই অবলম্বন পেয়েই আমি মোটিভ বুঝতে পারলাম। বলা বাহুল্য চিনতে পারলাম হত্যাকারীকে। মিস্টার হালদার, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল?

বলুন?

আপনার বন্ধু নিশিকান্তবাবুর কি হ্যাণ্ডসাম ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকা সম্ভব?

প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন মহিমারঞ্জন। আর সকলের একই অবস্থা।

নিশিকান্ত নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল, কোন প্রতিবাদ করতে গিয়েও করলেন না বোধহয়।

না।

কেন?

ইতস্তত করে মহিমারঞ্জন বললেন, ওর আর্থিক অবস্থা কোনদিনই ভাল নয়। মানে · দেখুন, এসব বিষয় নিয়ে ·

থামবেন না - আপনার মত লোকের কুণ্ঠা শোভা পায়না মিস্টার হালদার। পরিষ্কার করে সমস্ত কিছু বলুন।

গত কুড়ি বছর ধরে নিশিকান্ত আমার সঙ্গে আছে। তার সমস্ত খরচ আমি চালিয়ে থাকি। এমনকি প্রতিদিন আহারপর্বটা সে আমার সঙ্গেই সেরে থাকে। রাত্রে শুধু শুতে যায় নিজের বাড়ি। ওর কোন সাইড ইনকাম নেই—কোন প্রপার্টি নেই।

অথচ আমি যদি বলি ওঁর এক লাখ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, প্রতি মাসে কয়েকবার মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে—তাহলে আপনার উত্তর কি হবে মিস্টার হালদার ?

এক লাখ ! অসম্ভব।

নিশিকান্ত এতক্ষণে কথা বললেন—বেশ রুষ্ট কণ্ঠেই বললেন, এসবের অর্থ কি ? আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে কি নেই, তা নিয়ে এত কথা হচ্ছে কেন ?

কথা হত না যদি সমস্ত ঘটনার মূল সূত্র ওখানে নিহিত না থাকত। এত টাকা উনি পেলেন কোথা থেকে, এর উত্তর জানবার জন্য মিস্টার হালদার নিশ্চয় আগ্রহী ? আগ্রহ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, যে ক্ষেত্রে ওঁর কোন আয়ের ব্যবস্থা নেই, আপনার অন্নে প্রতিপালিত। কিছুক্ষণ আগে নিশিকান্তবাবু বলছিলেন, ওঁর সমস্ত কাগজপত্র হারিয়েছে। সেজন্য উনি খুব চিন্তিত। আসল কথা হল, কোন কাগজপত্র নয়, হারিয়েছে ওঁর ব্যাঙ্ক বুক। এখন বলতে দ্বিধা নেই ব্যাঙ্ক-বুকখানা আমি ওঁর বাক্স থেকে চুরি করেছি।

নিশিকান্ত চিৎকার করে উঠলেন।

কেন আপনি এই অনধিকার চর্চা করেছেন ? আপনাকে আমি পুলিসে দিতে পারি জানেন ?

চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আপনি যে ঘৃণ্য কাজ করেছেন, তার বিচার কে করবে ?

আমি কোন ঘৃণ্য কাজ করিনি।

যে বন্ধু আপনাকে খাইয়ে-পরিয়ে দুনিয়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, তার সঙ্গে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এমন এক সূত্র ধরে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যার চেয়ে নোংরামি আর হয় না। বাকবিতণ্ডা করে লাভ নেই। কথা বাড়ালেই কথা বাড়বে। আবার আমি নিজের খেই ধরতে চাই। কলকাতায় গিয়ে পুলিসের সাহায্যে আমি নিশিকান্তবাবুর ঘন ঘন অর্থ-প্রাপ্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলাম। জানা গেছে প্রতিবার একজনই তাঁকে টাকা দিয়ে গেছে। আপনারা জানতে চান তাঁর নাম ?

বাসব সকলের মুখের উপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। উৎকণ্ঠার ছাপ প্রত্যেকের মুখে। চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

এ প্রসঙ্গ না উঠলেই ভাল ছিল। উপায় নেই, সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে আমি বাধ্য। নিশিকান্তবাবুকে নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা দিতেন অংশুমানবাবু।

মহিমারঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বললেন, অংশুমান। কেন ?

আমি ! অংশুমানের গলাতেও বিস্ময়ের আঁচ।

অস্বীকার করবার পথ আমি সেরে রেখেছি। পুলিসের কাছে কিছুই অসম্ভব নয় বোধহয় জানেন ? নিশিকান্তবাবুর নামে যে সমস্ত চেক আপনি

ইস্যু করেছিলেন, তার অধিকাংশ আমি ব্যাঙ্কের রেকর্ড থেকে দেখেছি।

তুমি নিশিকান্তকে এত টাকা দিয়েছ অংশু? মহিমারঞ্জন গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

অংশুমান ইতস্তত করতে লাগল।

বাসব বলল, চুপ করে থাকবেন না। আপনি বললে আর আমার আপত্তিকর কথা ... বলতে হয় না।

অংশুমান কিছু বলতে পারল না, মাথা নত করে বসে রইল।

আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে ওঁর জীব আড়ষ্ট হয়ে আসছে। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। বাসব বলল, অত্যন্ত নোংরা ব্যাপার! এ প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে না হলেই ভাল হত। কিন্তু এমনই যোগাযোগ, ওই নোংরা প্রসঙ্গের অবতারণা না করলে রহস্যের উপরকার আবরণ উন্মোচন করা যাবে না। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন মিস্টার হালদার। সুজাতাদেবীকে আপনি স্ত্রী হিসাবে একরকম গ্রহণ করলেও, তিনি আপনাকে যোগ্য সম্মান দিতে পারেননি। বৃদ্ধ সহচরের চেয়ে তরুণ প্রেমিককে তিনি বেশি পছন্দ করেছিলেন। অংশুমানবাবু মুখে যতই বিতরাগ দেখান না কেন, বাপের উপপত্নীকে অনেকদিন আগেই নিজের সহচরী হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরিস্থিতি অসম্ভব ভারি হয়ে উঠল। প্রায় একমিনিট কারুর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না। তারপর ফেটে পড়লেন মহিমারঞ্জন।

অংশু তুমি ·· তোমার

উত্তেজনার দরুণ তাঁর মুখ দিয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু বেরোল না।

অংশুমান কিছুই বলতে পারল না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বসে রইল।

তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে উঠল সুজাতা।

মিথ্যে কথা -সমস্ত মিথ্যে কথা!

সুকুমার দত্ত গলা ছেড়ে হাসলেন; হাসি থামবার পর টেনে টেনে বললেন, সতীপনা দেখাবার কারণ বুঝতে পারা গেল। আমিও ভাবছিলাম বুড়ো হাড়ে কি এত রস পাচ্ছ তুমি! তখন তো জানি না, বাপ পদপল্লবমুদারম হয়ে পড়ে আছে. আর তুমি ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়ে চলেছ।

মহিমারঞ্জন অসীম বলে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সহজ গলায় বললেন, মিস্টার ব্যানার্জী, আপনি নিজের কথা শেষ করুন।

বাসব বলল, একটি পরিবারের সমস্ত সুখ-শান্তি কর্তব্যের খাতিরে আমাকে নষ্ট করে দিতে হল। আমি মর্মাহত। যাহোক, বাকি কথাটা এবার শেষ করে নেব। প্রথম প্রথম বোধহয় সুজাতাদেবী ও অংশুমানবাবু মিস্টার হালদারের চোখ বাঁচিয়ে এখানে-ওখানে দেখা করতেন। তারপর নিশিকান্ত-বাবুর সঙ্গে একটা রফা হয়ে যায়। টাকার বিনিময়ে তিনি নিজের বাড়ি ওঁদের

ব্যবহার করতে দিতেন। এই ভাবেই চলছিল। চলতে থাকলে আজকের এই পরিস্থিতির অবতারণা হত না। জেমস জয়েস বলেছেন, 'মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট নয়। নিজের সুখের পরিধিকে অকারণে বাড়াতে গিয়ে ঘোর বিপত্তি ডেকে আনে।' এখানে অক্ষরে অক্ষরে সেরকম হয়েছে। সুজাতাদেবী অধৈর্য হয়ে উঠলেন। মিস্টার হালদারকে সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। পরিকল্পনা দানা বাঁধল মাথায়। মিস্টার হালদার না থাকলে তরুণ অংশুমানকে নিয়ে তাঁর জীবন অসম্ভব আনন্দে কাটবে এই চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেন। কলিকাতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি নানা কারণে। এখানে এসে কিউলানের কথা শুনলেন। মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুতের তরঙ্গ অনুভব করলেন। এই সুবর্ণ সুযোগকে গ্রহণ না করা বোকামি। তারপর—

বাসবকে বাধা দিল সুজাতা।

আপনি কি সমস্ত বলছেন। কিসের পরিকল্পনা—কিসের সুবর্ণ সুযোগ?

এখনো প্রতিবাদ করার ভাষা আছে। আমি অবাক হচ্ছি! আপনারা শুনুন, সুজাতাদেবী কিউলানের সাহায্যে মিস্টার হালদারকে পথ থেকে সরাতে গিয়ে দেবরাজকে হত্যা করেছেন।

আরেকবার বিস্ময়ের ঝড় উঠল। মহিমারঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। অংশুমানের চোখে আগুনের হল্কা। সে তাকিয়ে রইল সুজাতার দিকে। আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না সুজাতা, দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শুধু গুমরোনো শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে, না—না—না আমি কিছু করিনি, আমি কিছু জানিনা—

বাসব নিজের আসন ত্যাগ করল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সুজাতার সামনে। ঝটিতে তার কোলের ওপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিল। ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা পেটমোটা শিশি বার করে বলল, আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর মধ্যে আছে।—আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ইন্সপেক্টর। বিশ্রামের জন্য নিজের ঘরে যাচ্ছি। আপনি নিজের কর্তব্য শেষ করুন। এস ডাক্তার।

বাসব ও শৈবাল স্থান ত্যাগ করল। স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে অবশ্য নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক-বুক ও সুজাতার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাওয়া পেটমোটা শিশিটা টেবিলের ওপর রেখে এল। পেটমোটা শিশিটার দিকে তাকিয়ে সকলে শিউরে উঠলেন। তার মধ্যে গোটা পাঁচেক কিউলান গাদাগাদি করে রয়েছে। শুঁড় উঁচিয়ে মৃত্যুদূতেরা শিশির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ডাউন অমৃতসর মেল লক্ষ্ণৌ ছেড়েছে বেশ কিছুক্ষণ হল। ভাস্কর ও মণিদীপা

এসেছিল স্টেশনে বাসব ও শৈবালকে ট্রেনে তুলে দিতে। মহিমারঞ্জনের সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি। পুলিস সুজাতাকে নিয়ে যাবার পরই তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে অবস্থান করছেন। আত্মগ্লানিতে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে হয়ত। যাকে প্রাচুর্যের সাগরে শুধু ডুবিয়ে রাখেননি, নিজের হৃদয় পর্যন্ত দান করেছিলেন, সেই সুজাতা তাঁর সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল! বাসবের সঙ্গে দেখা না হলেও ভাস্করের মারফৎ চেক পাঠাতে তিনি ভুলে যাননি। কামরায় আরেকজন পাঞ্জাবী যাত্রী ছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন পত্রিকার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে। বাসব একটু হেলে বসল বার্থে। সিগারেট ধরাল একটা।

শৈবাল জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, সুজাতাদেবী ফ্রয়েডের একটা জীবন্ত একজাম্পল। তবে অংশুমানবাবু কম পারভাটেড নন। বাপের রক্ষিতাকে—। আচ্ছা, তুমি সন্দেহ করলে কিভাবে?

সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রতি আমার কোন দৃষ্টিই ছিল না। তার মত মেয়ে যে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে, কে ভাববে বল?

তবে? .

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। বেশ, শোন: সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরও আমিই মোটেই বুঝতে পারছিলাম না হত্যার মোটিভ কি। অথচ হত্যার মোটিভ বুঝতে না পারলে হত্যাকারীকে চিনে ওঠা কোন মতেই সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে আমি সকলের ঘর সার্চ করার কথা স্থির করে ফেললাম। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার কারণ হল, হত্যাকারী একবার অকৃতকার্য হয়েছে। আবার সে মিঃ হালদারকে মারবার জন্য সচেষ্ট হবে। একই পদ্ধতি যদি অনুসরণ করে, তবে তার ঘরে কিউলানের সন্ধান পাওয়া যাবে। এবং কিউলান যার ঘরে থাকবে, সেই হবে হত্যাকারী।

আমি ঘর সার্চ করবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করেছিলাম তোমার মনে আছে? সকলে চিত্তরঞ্জনবাবুর বাড়িতে রইলেন, সাউথ পয়েন্টে যাবার নাম করে আমি চলে এলাম পামগ্রোভে। শ'পাঁচেক চাবি আমার কাছে আছে তুমি জান। ঘরগুলির তালা খুলতে অসুবিধা হল না। কিন্তু যা খুঁজতে গিয়েছিলাম পেলাম না। কোন গুরুতর সূত্রও পাওয়া গেল না। তবে নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক-বুক দেখে মন সজাগ হয়ে উঠল। তিনি এত টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে? তবে কি এই টাকার সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাবে! কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। গেলাম কলকাতা। ব্যাঙ্ক-বুকের নম্বর নোট করে নিয়ে গিয়েছিলাম। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের সামন্তর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলাপ হল। তাঁর সহযোগিতায় ব্যাঙ্কে গিয়ে অনুসন্ধান শেষ করলাম। চেকগুলি দেখে বুঝতে

পারলাম নিশিকান্তকে একানাগাড়ে অংশুমান টাকা দিয়ে যাচ্ছে।

কেন? অকারণে কেউ কাউকে টাকা দেয় না। বিশেষ করে আজকের যুগে। নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ আছে। কারণটা কি তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে মনে করে নিশিকান্তর বাড়ি গেলাম সামন্তকে সঙ্গে নিয়ে। পুরনো আমলের একতলা বাড়ি। কড়া নাড়তেই চাকর দরজা খুলে দিল। পুলিস দেখে সে বেচারা বেশ ভড়কে গেল। তাকে জেরা করতেই জানা গেল, অংশুমান ও সুজাতা এখানে নিয়মিত আসে নিজেদের কদর্য খেয়ালকে চরিতার্থ করতে। সেও মোটা বকশিস পায় অংশুমানের কাছ থেকে। ঘরগুলো সার্চ করলাম তারপর। ওদের দুজনের ব্যবহৃত প্রচুর জিনিসপত্র দেখতে পাওয়া গেল যত্রতত্র। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম নিশিকান্ত নিজের বাড়ি ব্যবহার করতে দেওয়ার বিনিময়ে মোটা টাকা পেয়ে থাকেন। সন্দেহের তালিকা থেকে তাঁকে বাদ দিতে হল। তাঁর অপরাধ অর্থের লোভে তিনি হালদারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জীব।

বাসব থামল।

সিগারেটের টুকরোটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে, হাই তুলে আবার আরম্ভ করল, আমার মন সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল। মোটিভ আর চোখের আড়ালে নেই। হালদার বেঁচে না থাকলে অনেক সুবিধা, মুখ লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে আর কিছু করতে হবে না। বুক ফুলিয়ে নোংরামি করবার অবকাশ আসবে। হত্যার পরিকল্পনা করছে কে? অংশুমান না সুজাতা—না, দুজনেই?

ফিরে গেলাম রনগাঁও। দ্বিতীয়বার কিউলানের আবির্ভাব যখন হয়েছিল, তখন একথা অবধারিত সত্য যে পোকাটা সংগ্রহ করা আছে। প্রতিবার সকলের সতর্ক চোখ এড়িয়ে ধরে আনা নিশ্চয় রিস্ক। অথচ আমি সেদিন অংশুমান ও সুজাতার ঘরে পোকার সন্ধান পেলাম না কেন? তবে কি পোকা ঘরে নেই, সব সময় নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখা হয়! এই কথা মনে হওয়ার পরই একটা সম্ভাবনা আমার মনে রেখাপাত করল। সুজাতাকে দেখতাম সমস্তক্ষণ ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে থাকতে। বাড়ির বাইরে যাবার সময় মেয়েরা ব্যাগ নিয়ে যায়। বাড়িতে থাকাকালীন ওটা বয়ে বেড়াবার কোন অর্থ হয় না। ওর মধ্যেই কিউলান অবস্থান করছে কি? আমি আরো লক্ষ্য করেছিলাম, শুধু খেতে যাবার সময় ব্যাগটা হাতে থাকে না। ওই সময় কার্যোদ্ধার করতে হবে। তোমরা খেতে গেলে—আমি অসুস্থতার ভাণ করলাম। আবার ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে সুজাতার ঘরে ঢুকলাম। ভ্যানিটি ব্যাগটা ছিল বালিশের তলায়, খুলতেই রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পেট মোটা শিশিটার মধ্যে জীবন্ত শয়তানদের দেখতে পেলাম। আবার যথাস্থানে রেখে দিলাম ব্যাগটা। নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক-বুক সরিয়েছিলাম তাঁকে

শুধু নাকাল করবার জন্য। তারপর যা ঘটেছে, তা সমস্তই তোমার চোখের ওপর।

শৈবাল বলল, তোমার কি মনে হয়, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে অংশুমানও আছে?

কোন প্রমাণের ওপর বেস করে বলছি না। আমার ধারণা, সে সুজাতার ভয়ংকর পরিকল্পনার কথা জানত না।

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছিল।

কোন্ স্টেশন ডাক্তার?

টাইম টেবিলের পাতা উল্টে শৈবাল বলল, ফয়জাবাদ।

বাসব আবার সিগারেট ধরাল।

ত্রিকোণ ত্রিতাল

সবুজের মেলা।

যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু সবুজের মেলা।

জানলার কাছ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনল বাসব। ডান হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটে দীর্ঘ টান দিল তারপর।

পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে দেরাদুন এক্সপ্রেস।

কামরায় বিশেষ ভিড় নেই। সিক্সবার্থ ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট, অথচ যাত্রী মাত্র ওরা তিনজন। বাসব নিজে, শৈবাল ও সোমা।

শৈবালই প্রস্তাব করেছিল, চল, কোথাও ঘুরে আসি। কিছু ছুটি পাওনা হয়ে গেছে, পুজোর অবকাশে··

বাসব সিগারেটের টিনটা খুলতে খুলতে বলেছিল, পুজোর সময় ট্রেনে চড়া মানে ভিড়ের দৌলতে চিঁড়েচ্যাপ্টা হওয়া। সে-ভ্রমণে আনন্দ নেই ডাক্তার। তার চেয়ে পুজোর পর ভিড় কমে গেলে যাওয়া যেতে পারে।

বেশ, সেই ভাল। কোথায় যাওয়া যায় বল?

গতবার তো সমুদ্রের তীরে গিয়েছিলাম। এবার উঁচুতে ওঠা যাক। দেরাদুন চল।

মন্দ কি, দেরাদুন যাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

দেরাদুন যাওয়া প্রোগ্রাম যখন পাকাপাকি হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় সোমা দর্শন দিল সেখানে।

গলায় তার প্রচুর অসন্তোষ।—খুব যে পাহাড়ে বেড়াবার প্রোগ্রাম হচ্ছে—

আলোচনাটা শৈবালের বাড়ির বাইরের ঘরে বসেই হচ্ছিল।

পুজোর পর আমরা দেরাদুন যাব ভাবছি।

খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমাদের আলাপ এত চুপি চুপি হচ্ছিল কেন? আমাকে বাদ দেবার তালে আছ বুঝি?

তোমাকে···মানে··

কোন কথা শুনতে চাই না। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। সেলফিসের মত আমাকে বারবার বাদ দিয়ে যেতে তোমাদের বিবেকে আটকায় না?

হুঁ। খুবই গম্ভীর প্রশ্ন।—বাসবের উচ্চ হাসিতে ঘর প্রায় ফাটো-ফাটো অবস্থা।—দাম্পত্য-কলহকে নিশ্চয়ই তুমি প্রশ্রয় দিতে চাইবে না। সোমাও চলুক এই ট্রিপে আমাদের সঙ্গে।

এরপর—

এরপর ওরা পুজো কাটিয়ে, একদিন দুন এক্সপ্রেসে চেপে বসল।

কি হে, দার্শনিকের মত কি এত ভাবছ ? শৈবাল প্রশ্ন করল।

ভাবছি না, দেখছি। দেখ ডাক্তার, চতুর্দিকের শান্ত শ্যামল শোভার চে আমার উগ্র প্রাকৃতিক দৃশ্যই বেশি পছন্দ। তোমার—?

শৈবাল হেসে বলল, আগে আমি তোমার ভাষায় শান্ত শ্যামল দৃশ্য পছন্দ করতাম, কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র।

এখন স্বতন্ত্র কেন ?

এখন আমি বিবাহিত ভাই।

বাসবের দিকে তাকিয়ে সোমা বলল, বুঝতে পারছেন না ? আমা পাহাড়ের দেশে বাড়ি, কাজেই আমার মন রাখবার জন্যে উগ্র প্রাকৃতিক দৃশে ওঁকে মন বসাতে হয়েছে অনন্যোপায় হয়ে, এই কথাই বলতে চাইছে আপনার বন্ধু।

তাই নাকি ডাক্তার ?

নইলে ভাই ঘনঘোর দাম্পত্য-কলহ জমে উঠবে। দাম্পত্য-কলহ যত মিষ্টিই হোক না কেন, তবু কোন্ ভদ্রসন্তান তাকে প্রশ্রয় দিতে চায় বল।

বাসব অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরোটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিল।

বলল, আমি কিন্তু এখন সোমার পক্ষে। তুমিই বল না, কে কবে ধানক্ষেত আর গমক্ষেত দেখতে যায়, অথচ পাহাড় দেখবার জন্য লোকে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটোছুটি করে। এই যেমন আমরা দেরাদুন চলেছি। ইচ্ছে করলে কি বর্ধমানে কোন ধানক্ষেত দেখতে যেতে পারতাম না ?

শৈবাল বলল, তোমার কথার উত্তরে অনেক কথা ভিড় করে আসছে ঠোঁটের আগায়, কিন্তু বলব না। তোমরা দলে ভারি, আমার চুপ করে থাকাই ভাল।

ওভাবে লেজ গুটিয়ে পালালে চলবে না। আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেব, দার্জিলিং, সিমলা, নৈনিতালের অপূর্ব দৃশ্যাবলী যে শুধু মানুষের মনকে মাতিয়ে তোলে তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে কারুর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়

কি রকম ?

প্রমাণ স্বরূপ তুমি আমাকে ধরতে পার। শ্রীমান বাসব বানার্জী অ্যানাটমির ছাত্র ছিলেন, অথচ এখন তিনি, তোমাদের ভাষায় একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। এই ব্যতিক্রম কি করে সম্ভব হল জান ? হিমাচল প্রদেশের পাহাড়গুলো তার প্রথম জীবনের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধামা চাপা দিয়ে দিল বলে।

অধৈর্য গলায় শৈবাল বলল, পরিষ্কার করে কিছু বলবে কি ?

মনে হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং গল্পের গন্ধ পাচ্ছি আমরা। অল্প একটু হেসে সোমা বলল।

ইন্টারেষ্টিং কিনা জানি না। তবে আমার জীবনের প্রথম কেস। এই কেসটা হাতে না এলে বোধহয় আমি তোমার কর্তার মত ডাক্তারই হতাম।

এর সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ক কি ?

কুলুভ্যালি যদি আমি না যেতাম ডাক্তার, তাহলে আমার জীবনের সেই প্রথম কেসটা আমি মোটেই হাতে পেতাম না। বলাই বাহুল্য তোমরা বুঝতে পারছ, সেই কেসের সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

সোমা বলল, বলুন না গল্পটা। আমরা শুনি।

দুন এক্সপ্রেস তখন কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

বাসব জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ফয়জাবাদ। ও জানলার বাইরে থেকে মুখ সরিয়ে এনে, বার্থের ওপর রাখা টিন থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বি-এস-সি পাশ করবার পর কি খেয়াল চাপল, মেডিকেল কলেজে নাম লেখালাম। তখন আমি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। বাবা বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছিলেন। মা গত হয়েছিলেন আমার ছোটবেলাতেই। অভিভাবকশূন্য জীবন কাটছিল আমার। তবে বাবা না থাকলেও প্রাচুর্য ছড়িয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িখানাই শুধু নয়, ব্যাঙ্কেও প্রচুর টাকা জমা ছিল আমার নামে। অন্য কেউ এই প্রশ্রয়ের মধ্যে পড়লে কি হত জানি না, আমি কিন্তু নিজের পড়াশোনা নিয়মিত চালিয়ে গেলাম। সেবার বড় মামা এলেন, দিল্লী থেকে কলকাতায়। তাঁর নাম শুনে থাকবে, অতুলপ্রসাদ মুখার্জী। লিয়াকৎ আলী খাঁ যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন অর্থ-দপ্তরের তিনিই ছিলেন বিখ্যাত জয়েন্ট সেক্রেটারি। যাই হোক, তিনি কলকাতার কাজ সেরে, ফেরার সময় আমাকে দিল্লী নিয়ে চললেন। তখন লম্বা একটা ছুটি ছিল, কাজেই কলেজ কামাইয়ের কোন ভয় ছিল না। দিল্লী পৌঁছে-

বাসব দিল্লী পৌঁছল এক বর্ষা-মেদুর দিনে।

ও যে এই প্রথম এখানে এল তা নয়, আরেকবার ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে এসেছিল দিল্লী। কি আনন্দেই যে সময় কেটেছিল, আজও ভাবলে সুখাবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসে বাসবের।—ওর জীবনের পরিপূর্ণ দিনগুলি।

অতুলবাবুর পরিকল্পনা কিন্তু অন্যরকম ছিল। দিল্লীর এই প্রচণ্ড গরমে বাসবকে তিনি অকারণে টেনে আনেননি। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওকে সঙ্গে নিয়ে কুলুভ্যালি যাওয়ার।

অনেকদিন কাজ থেকে ছুটি নেন নি অতুলবাবু। নিজের কর্মনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সরকারের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্যে ব্যস্ত থেকেছেন।

স্ত্রী রত্নময়ী বলেছেন, কাজ আর কাজ! ছুটি বুঝি তোমাকে মোটেই নিতে নেই?

অতুলবাবু সিগারের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছেন, কত বড় দায়িত্ব আমার

ঘাড়ে, তা তো তুমি বুঝবে না। যখন-তখন ছুটি কি নিলেই হল।

যখন-তখন! গত পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে ক'বার তুমি ছুটি নিয়েছ শুনি?

নিইনি অবশ্য। তবে—

তবে আবার কি? মনে হচ্ছে ইংল্যান্ডের রাজা ভারতের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে?

মৃদু হাসলেন অতুলবাবু।

বললেন, খুব রেগে গেছ মনে হচ্ছে? বেশ, ছুটি নিচ্ছি আমি। ছুটিতে কি করবে, কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি?

হ্যাঁ, কুলুভ্যালি যাবার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে রয়েছে আমার।

রত্নময়ী বললেন, এখন যদি তুমি ছুটি নাও, তাহলে বড় একটা দলের সঙ্গে আমরা ওখানে যেতে পারি।

ক্রমে মিঃ মুখার্জী স্ত্রীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, কয়েকজন পদস্থ কর্মচারির স্ত্রীরা সপরিবারে কুলুভ্যালি যাবার পরিকল্পনা করেছেন। রত্নময়ীও ওই দলে স্বামীকে নিয়ে ভিড়ে পড়তে চান।

মন্দ পরিকল্পনা নয়।

অতুলবাবু রাজি হলেন।

রত্নময়ীর অভিযোগ মিথ্যে নয়। সত্যিই তো, কতদিন ধরে এক নাগাড়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। একঘেয়ে জীবন যে ক্রমেই বিস্বাদ হয়ে আসছে, একথা কি কিছুদিন থেকেই অনুভব করছেন না মিঃ মুখার্জী?

ঠিক হল, কুলুভ্যালিতে ওঁরাই কেবল যাবেন না। বাসবও যাবে সঙ্গে। বাপ-মা-মরা ছেলেটাকে বহুদিন কাছে পাননি দুজনে। এই অবকাশে, এই যোগাযোগ ভালই হবে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় আরেকটা সুযোগ এসে গেল। একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে কলকাতায় গেলেন অতুল মুখার্জী। কাজ শেষ করে ফেরার পথে বাসবকে দিল্লী নিয়ে এলেন।

মানালি।

কুলুভ্যালির এই মনোরম শহরটিকে হিমালয় পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে চারদিকের ধবধবে সাদা তুষারপুঞ্জ আর জমাট নেই, গলছে—অতি ধীরে ধীরে গলছে। পাইন গাছের শাখায় শাখায় বরফের সমারোহ। টপ টপ করে জল পড়ছে সেখান থেকে।

মানালি কুলুর প্রাণকেন্দ্র।

অবশ্য কয়েক বছর আগেও মানালিকে শহর না বলে পাহাড়িয়া গ্রাম বললেই ঠিক বলা হত। অথচ এখন, প্রগতিশীল জীবনযাত্রার সমস্ত সুব্যবস্থাই এখানে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই শৈলাবাসটিকে খুঁটিয়ে দেখবার সমস্ত রকম ব্যবস্থাই ভারত সরকার করে রেখেছেন।

এখানে রেল নেই। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ মোটরের পথ ধরেই।

সম্প্রতি এক দীর্ঘ হাইওয়ে নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এখানে।

এমনই যোগাযোগ, হাইওয়ে নির্মাণের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদেব সান্যালের চাকরি-জীবনও শেষ হয়ে গেল। সেণ্ট্রাল পি-ডব্লু-ডি'র প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর অবশ্য তিনি আর বাংলা দেশে ফিরে গেলেন না। বাঁকুড়ার সুবিখ্যাত সান্যাল পরিবারের সন্তান বিষ্ণুদেব নিজের দেশের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ছোট ভাইয়ের নামে দানপত্র করে দিয়ে মানালিতেই বাড়ি করলেন।

সারাজীবন ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে, শেষ জীবনটা মানালিতে কাটাবার জন্যে স্থির নিশ্চিত হলেন তিনি। আজ তাঁর অর্থের অভাব নেই, বাকি দিন ক'টা সুখেই কাটবে তাঁর।

বহু অর্থ ব্যয় করে বিরাট বাড়ি তৈরি করেননি তিনি।

একজন রিটায়ার ইংরেজ রেঞ্জারের কাছ থেকে এই বাংলোটি কিনেছিলেন। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বেশ কিছু দূরে, পাহাড়ের সম্পূর্ণ গা ঘেঁসে এই বাংলোটি।

সবে ভোর হয়েছে।

উত্তর দিকের কাচের পাল্লা দেওয়া ঢাকা বারান্দায় বসে পাইন গাছের সারির দিকে তাকিয়েছিলেন বিষ্ণুদেব সান্যাল। প্রতিদিন এই সময় এখানেই বসে বসে তিনি প্রাকৃতিক শোভা দেখে থাকেন।

এক সময় তাঁর পাহাড়ি চাকর মান্নু চা দিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বিষ্ণুদেব বললেন, তোর দাদাবাবু বেরিয়ে গেছেন ?

গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে মান্নু বলল, না।

ডেকে দে একবার।

বিষ্ণুদেবের ওই একটি মাত্র ছেলে। রণদেব। পৃথিবীতে নিজের বলতে আর কেউ নেই তাঁর।

রণদেব খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি। ম্যাট্রিকের দরজা পার হয়েই সরস্বতীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সে শেষ করেছে। আগে খেয়ে আর ঘুমিয়েই স্রেফ সময় কাটাচ্ছিল সে। স্নেহশীল বিষ্ণুদেব একটি মাত্র ছেলের এইরকম জীবনযাত্রায় মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও মুখে কিছুই প্রকাশ করেননি কোনদিন। তাঁর ভরসা ছিল, বয়স আরো কিছু বাড়লেই রণদেবের দায়িত্ব নিয়ে কিছু কাজকর্ম করবার ইচ্ছে জাগবে।

বিষ্ণুদেবের অনুমান মিথ্যে হয়নি।

মানালিতে স্থায়িভাবে বসবাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই রণদেব এক বিরাট

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলে বসেছে। অর্থ সাহায্য অবশ্য বিষ্ণুদেবই করেছিলেন। পৃথিবীর নানা দেশের টুরিস্টদের দৌলতে এখন দোকানটি খুবই ভাল চলছে।

রণদেব এসে দাঁড়াল।

বয়স তার আটাশ-উনত্রিশের মধ্যেই। লম্বায় প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ। গায়ের রঙ ফরসা ঘেঁসা। মুখের রেখায় রেখায় একটা মিষ্টিভাব। মাথায় ঘন কালো চুল।

তার দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুদেব বললেন, দোকানে বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

শোন, যা বলতে তোমায় ডেকে পাঠালাম। কাল দিল্লী থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি এখানে বেড়াতে আসছেন—দিন কুড়ি থাকবেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থাটা ভালভাবে করে দিতে হবে।

ক'জন আসছেন তাঁরা?

জন দশেক বোধহয়।

আমাদের এই ছোট বাড়িতে জন দশেক অতিথিকে রাখা যাবে না।

তা তো আমি জানিই। বিষ্ণুদেব বললেন, কিন্তু তারা যখন আমাকে ভরসা করেই এখানে বেড়াতে আসছেন, তখন তাঁদের থাকার ব্যবস্থাটা তো করে দিতে হবে। তাঁরা অবশ্য লিখেছেন, হোটেলে অ্যাকোমোডেশন করে রাখতে। ওখানেই উঠবেন। আমি এ-ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করছি না। আচ্ছা, ফ্লোরা কটেজটা এখন খালি আছে না?

দিন দশেক থেকে খালি রয়েছে দেখছি।

বিষ্ণুদেবের বাড়ির কাছেই ফ্লোরা কটেজ। এক শিক্ষিত গাড়োয়ালি ভদ্রলোক, এখানে আগত মানালি-পরিদর্শকদের এই বাড়িটি ভাড়া দিয়ে থাকেন। কাঠের দেওয়াল বিশিষ্ট ফ্লোরা কটেজ শুধু দর্শনীয়ই নয়, বাস করার পক্ষেও প্রচুর আরামদায়ক।

তাহলে তো কোন অসুবিধা রইল না। ওই বাড়িখানা আজই তুমি ভাড়া করে ফেল।

বেশ।

আর কিছু না বলে দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল রণদেব।

বাজারের মাঝামাঝি জায়গায় তার বিরাট দোকান। মানালির সবচেয়ে চালু দোকান। এখানে গরম কাপড় থেকে আরম্ভ করে কর্ণফ্লেক অবধি সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়।

রণদেব যখন দোকানে এল তখন ক্রেতাদের প্রচুর ভিড়।

বেলা ন'টায় এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি খোলা হয়। দোকানে যে ক'জন লোক কাজ করে তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। তাদেরই একজনের কাছে

চাবি থাকে। সেই দোকান খোলে।

রণদেব দোকানে এসেই নিজের কাউণ্টারে চলে গেল।

ক্রেতাদের চাহিদা মেটাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দশটা বাজল ক্রমে।

ওয়াল ক্লকটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে রণদেব টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। এক্সচেঞ্জে নম্বর বলে যোগাযোগ করে নিল নির্দিষ্ট জায়গায়।

হ্যালো—মিস্টার রাই আছেন বাড়িতে?

তারের অপরপ্রান্ত থেকে ভারি গলা ভেসে এল, সামশের রাই কথা বলছি।

গুড মর্ণিং মিস্টার রাই। আমি দেব।

মর্ণিং দেব। কি খবর বল?

আপনার ফ্লোরা কটেজটা দিন কুড়িকের জন্যে ভাড়া নিতে চাই। কয়েকজন অতিথি আসছেন দিল্লী থেকে!

ফোনে এসমস্ত কথা হয় না দেব। চলে এস এখানে।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রণদেব।

ফ্লোরা কটেজের পাশের বাড়িটাতেই মিঃ রাই থাকেন।

নিজের বাড়ি। আগে তিনি মিলিটারি ক্যাপ্টেন ছিলেন। এক জিপ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। সেই দুর্ঘটনার চিহ্ন এখনও তাঁর শরীরে বিদ্যমান। ডান পাটা টেনে টেনে চলেন।

রণদেব এগারটার সময় পেঁছাল তাঁর বাড়িতে।

কলিংবেল পুস করল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বছর বাইশ বয়সের মেয়েটি। সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যও জড়িয়ে রয়েছে তার শরীরের খাঁজে খাঁজে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল রণদেবের দিকে।

মিস্টার রাই বাড়ি আছেন?

বাবা, এইমাত্র জরুরী কাজে বেরিয়ে গেলেন।

ও!

আপনি কি মিঃ সান্যাল?

হ্যাঁ।

বাবা যাবার আগে বলে গেছেন, আপনি এলে বলে দিতে তিনি দুপুরে কোন সময়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

আমি তাহলে এখন চলি। তাঁকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

রণদেব গেটের দিকে ফিরে চলল।

মেয়েটিও কয়েক পা এগিয়ে গেল।

বলল, চলে যাচ্ছ যে?

ঘুরে দাঁড়াল রণদেব।

কাজ যখন হল না, তখন ফিরে তো যেতেই হবে।

আর অকাজ? সেই প্রসঙ্গেই না হয় আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললে?

রণদেব আবার ফিরে এল মালার কাছে।

মৃদু হেসে বলল, একটু আগে তৃতীয় কেউ যদি এখানে উপস্থিত থাকত, তাহলে সে মোটেই বুঝতে পারত না যে তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

খুব দুঃখ, না? মালা মাথা হেলিয়ে বলল, তুমি তো চাও দুনিয়া-শুদ্ধ লোক আমাদের কথাটা জেনে ফেলুক?

এ অঞ্চলের কারুর কি এখনও জানতে বাকি আছে!

রণদেব আবার গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

একি, সত্যিই চললে নাকি?

হুঁ। দোকানে কাজ আছে। সন্ধ্যার পর আসব।

নির্দিষ্ট দিনে দিল্লী থেকে এলেন সকলে।

বড় একটা স্টেশন ওয়াগন থেকে সকলে যখন ফ্লোরা কটেজের সামনে এসে নামলেন, তখন বিষ্ণুদেব সান্যাল সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। রণদেব নিজেদের ফিয়েট বেশ কিছু মাইল এগিয়ে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

গাড়ি থেকে একে একে নামলেন, সস্ত্রীক গৌতম সুদ, অরবিন্দ দত্ত, প্রভাত কাঞ্জিলাল, তাঁর মেয়ে রিয়া, সস্ত্রীক প্রশান্ত রায়, সস্ত্রীক অতুল মুখার্জী এবং বাসব।

প্রথম দিন কেউই ফ্লোরা কটেজ থেকে বেরুলেন না।

দিল্লী থেকে এতখানি পথ অতিক্রম করে আসায় সকলেই ক্লান্ত। বিছানায় আশ্রয় করেই প্রথম দিনটা কাটিয়ে দিলেন সকলে। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন আহারে আমন্ত্রণ জানালেন সকলকে বিষ্ণুদেব সান্যাল।

বিরাট কিছু আয়োজন করেননি তিনি। কিন্তু সকলে তৃপ্তি-সহকারে খেলেন।

খাওয়ার পর সকলে ড্রইংরুমে এসে বসতে না বসতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল।

কাচের শার্সির মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অরবিন্দ দত্ত বললেন, আকাশের যে রকম অবস্থা তাতে সহজে বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না।

শীতও পড়বে চেপে।—প্রভাত কাঞ্জিলাল বললেন।

পাহাড়ি দেশের এই এক অসুবিধা, একবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে আর থামতে

চায় না। হয়ত হপ্তা খানেক ধরে চলবে। তাছাড়া শীত

অতুল মুখার্জীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গৃহকর্তা বিষ্ণুদেব সান্যাল বললেন, শুধু বৃষ্টি নয় মিস্টার মুখার্জী, এই বৃষ্টিই কিছুক্ষণের মধ্যে তুষারে পরিণত হতে পারে।

গরম কালেও বরফ পড়ে নাকি?

অনেক দিন ধরে তো রয়েছি। এখানকার খামখেয়ালি জল-হাওয়া লক্ষ্য করছি। বৃষ্টি হতে হতে এখানে যে কোন সময় তুষার পড়াটা বিচিত্র নয়।

একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে প্রশান্ত রায় বললেন, কাগজে পড়েছি এক এক সময় এখানে এত তুষারপাত হয় যে, এখানকার সম্পূর্ণ জীবন-যাত্রা অচল হয়ে পড়ে নাকি?

এ তো সাধারণ ঘটনা।

রিয়া এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার বলল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানকার মানুষ এই শোচনীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও মরে না। তারা এই ঝড়-ঝাপটাকে সম্পূর্ণ সইয়ে নিয়েছে।

তুমি ঠিকই বলেছ মা—বিষ্ণুদেব বললেন, এখানকার মানুষ অত্যন্ত সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী। তবে একবার এইরকমই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে, আমি একজনকে কাঁচা বরফের মধ্যে ডুবে যেতে দেখেছিলাম।

কি রকম? সকলে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

অতুল মুখার্জী বললেন, ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়ে কেউ বরফের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল বোধহয়?

না। সুস্থ সবল একটি মেয়েকে বরফের মধ্যে তলিয়ে যেতে কাউকে সাহায্য করতে দেখেছিলাম।

বলেন কি? একজন একটি মেয়েকে বরফের মধ্যে পুঁতে ফেললে। —বিস্ময়ে নুয়ে পড়লেন কাঞ্জিলাল।

আপনি দেখলেন অথচ বাধা দিলেন না তাকে?—দ্রুত প্রশ্ন করলেন প্রশান্ত রায়।

বাধা দিয়েছিলাম। আমার কপালের ডান পাশের ক্ষতচিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন? বাধা দেওয়ার ফলস্বরূপ এটা সৃষ্টি হয়েছে।

মিসেস কাঞ্জিলাল বললেন, ঘটনাটা শোনবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ততা বোধ করছি মিস্টার সান্যাল। খাপছাড়া ভাবে নয়—পুরো গল্পটা বলুন।

বিষ্ণুদেব সকলের দিকে তাকালেন।

সকলেই তাঁর মুখ থেকে গল্পটা শোনবার জন্যে ব্যগ্র রয়েছেন মনে হল।

তিনি আরম্ভ করলেন, বছর একুশ আগেকার কথা। আমি তখন সি. পি. ডব্লু. ডি'র একাউণ্টসে রয়েছি। পদমর্যাদা বিরাট কিছু নয়। ক্লার্কদের এক

ধাপ ওপরে কাজ করি। সেবার উত্তরপ্রদেশে আমাদের কাজ হচ্ছিল। দৈবাৎ কয়েকদিন ছুটি পেয়ে গেলাম। আমরা কয়েকজন সহকর্মী মিলে ঠিক করলাম এই ছুটিটা কুলুভ্যালিতে গিয়ে কাটিয়ে আসব। কুলুতে এখনকার মত তখন এতরকমের সুখ-সুবিধা ছিল না। উঠলাম সরকারি ডাকবাংলোতে।

মিঃ সান্যাল থামলেন।

সিগার ধরিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, বেশ দিনগুলো কাটছিল। সেদিন এক গাড়োয়ালি বস্তিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খুব পরিচ্ছন্ন এদের জীবনধারা। আমি একলাই ছিলাম, অন্যান্যরা মানালিতে ছিল। সেদিনও ছিল ঠিক আজকের মত দিন। তবে বৃষ্টি পড়ছিল না, ঝির ঝির করে তুষার পড়ছিল। শীতও ছিল প্রচণ্ড। ওয়েস্টেডের ট্রাউজার আর পাটুর অলেস্টারে নিজেকে মুড়ে রেখেছিলাম আমি। মাথা বাঁচাচ্ছিল ফেল্টের হ্যাট। ক্রমেই অলেস্টারের ওপর বরফ জমে উঠছিল। গাড়ওয়ালদের গ্রাম থেকে দ্রুতপায়ে আমি নিজের আস্তানার দিকে ফিরে আসছিলাম। চারিধার নির্জনতায় খাঁ খাঁ করছিল—কেউ কোথাও নেই। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল আমার। কিন্তু খুব বেশি দূরে এগিয়ে যেতে পারলাম না। তুষারপাত তীব্র হল। রাস্তার দু'পাশে ওয়ালনট গাছের সারি। আমি একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিট দশেক দাঁড়িয়েছিলাম বোধহয়। হঠাৎ শুনতে পেলাম কাছাকাছিই কারা যেন কথা কইছে।

সিগার নিভে গিয়েছিল।

বিষ্ণুদেব সান্যালের বলার ভঙ্গিটাও চমৎকার।

সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। মিঃ সান্যাল আর সিগার ধরালেন না। অ্যাসট্রের ওপর সিগারের অর্ধদগ্ধ টুকরোটা রেখে, তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, কথাবার্তা কানে আসতে আমার একটু সাহস হল। আমি একলা নেই তাহলে এখানে, আরো লোক আছে। প্রথমে আমি কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি। শুধু মনে হয়েছিল দুটি নারী ও পুরুষের মধ্যে ইংরাজিতে কথা হচ্ছে। হঠাৎ একটা আর্ত-চিৎকার আমাকে সচকিত করে তুলল। আমি গাছের তলায় ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শব্দ লক্ষ্য করেই অবশ্য গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, একজন বলিষ্ঠ লোক আমার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের গলা চেপে ধরেছে। তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে মেয়েটি ছটফট করছে। আমি আর কাল বিলম্ব না করে লোকটির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লাম। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে এক ঝটকায় আমাকে মাটিতে ফেলে দিল। মেয়েটি তখন কোনরকমে গাছ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হয়ত তার পালাবার ক্ষমতাও ছিল না। আমার আক্রমণকারীর মুখ বারেকের জন্যে দেখতে পেলাম, সে আমার মাথায় প্রচণ্ডভাবে কি একটা

দিয়ে আঘাত করার পূর্বক্ষণে ···

তারপর ?—ঘরের সকলে উৎকণ্ঠার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তারপর আমি বোধহয় মিনিট কুড়িক আচ্ছন্নের মত পড়েছিলাম। আচ্ছন্ন ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে যাবার পর দেখি উপুড় হয়ে পড়ে আছি। কপালের একপাশ কেটে গেছে। ব্যথায় টনটন করছে। রক্তের সঙ্গে বরফের মাখামাখি। কোনরকমে উঠে বসলাম, উঠে বসতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা আমার মনে থাকবে।

দেখলাম, আমার আক্রান্তকারীর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আর সেই মেয়েটির অর্ধেকটা বরফের মধ্যে ডুবে গেছে। শুধু তাই নয়, সে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে চোরা বরফের ফাঁকে। মেয়েটির বোধহয় জ্ঞান নেই, কারণ খাড়াভাবে নেমে গেলেও সে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে রয়েছে। আমি হাঁচড়-পাঁচড় করে ওঠবার চেষ্টা করলাম। বাঁচাতে হবে মেয়েটিকে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা করলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তারপর চোখের সামনেই মেয়েটি তলিয়ে গেল বরফের সেই মরণ-ফাঁদে। বলতে যতই সময় লাগুক না কেন, ঘটনাটা ঘটল কিন্তু এক লহমার মধ্যে।

বিষ্ণুদেব সান্যাল রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, কিভাবে যে আমি নিজের আস্তানায় ফিরে এসেছিলাম, তা এখন বর্ণনা করা শক্ত। তবে কাউকেই কোন কথা বলতে সাহস হল না। ক্ষত সম্বন্ধে বললাম, পড়ে গিয়ে কেটে গেছে। পুলিসকেও খবর দিলাম না। কাজটা অবশ্য অন্যায় হয়েছিল! খবর দিলাম না এই কারণে, পুলিস যদি আমাকেই সন্দেহ করে বসে। একটু সুস্থ হয়েই আবার ঘটনাস্থলে গেলাম। একটা দুর্নিবার কৌতূহল আমাকে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। কাল যে এখানেই এক মর্মন্তুদ ইতিহাস রচিত হয়েছে, আজ তা কে বলবে। যেখানে মেয়েটি বরফের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল, আমি তার কাছাকাছি গেলাম না। বিশ্বাস কি, আমিও যদি তলিয়ে যাই। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার হাত দশেক দূরে কালো মত কি একটা পড়ে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিলাম। কালো চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। বোধহয় সেই মেয়েটির। অনিচ্ছার সঙ্গে ব্যাগটা খুললাম। প্রসাধনের কিছু টুকিটাকি জিনিস ছাড়া, একটা নোটবইও রয়েছে। নোটবইটার মলাটের উল্টোদিকের স্বচ্ছ ফ্ল্যাপের তলায় একখানা ফটোগ্রাফ। লাবণ্যময়ী তরুণীর ফটোগ্রাফ।

এরপর আপনি কি করলেন ?—সামশের রাই-এর ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। আজকের মধ্যাহ্ন আহারে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিঃ সান্যাল।

নোটবইটা নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। নেড়েচেড়ে দেখলাম। মেয়েটির নাম সরোজ মেহারা। আগ্রার একটা ঠিকানাও পাওয়া গেল। কিন্তু আর

কিছু বুঝতে পারা গেল না। কারণ প্রায় সমস্ত নোটবইটায় দৈনিক কেনা-কাটার হিসেব ছাড়া আর কিছু লেখা নেই।

আরো দুটো দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন আমি বাজারে বেরিয়েছিলাম—লক্ষ্য করলাম এক জায়গায় ভীষণ হট্টগোল হচ্ছে। প্রচুর লোক জড়ো হয়ে কি যেন দেখছে। আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। দেখলাম দেওয়ালে একটা পোস্টার লাগান রয়েছে। সকলের দৃষ্টি সেই পোস্টারের দিকে। আমি পোস্টারের দিকে তাকালাম। একি! অবাক হতে হল আমাকে। বেশ লম্বা-চওড়া পোস্টারখানা। স্থানীয় ও ইংরাজি ভাষায় লেখা পোস্টারটার মাঝখানে একটি মেয়ের ছবি। ছবিটি আর কারুর নয়, সেই মেয়েটির। পুলিসের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, মেয়েটি দিন তিনেক হল নিজের নবজাত শিশুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। কোন সহৃদয় নাগরিক এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিলে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।

রহস্য আরো ঘনীভূত হল। আমি ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলাম। ফিরে এলাম হোটেলে। ঠিক করলাম এই উটকো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করব না আর। আমাদের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। ফিরে এলাম আগ্রায়।

এতক্ষণ গল্পই শুধু শুনছিলেন মিঃ গোতম সুদ।

এবার বললেন, আপনি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাননি বোধহয়?

না। যদি হত্যাকারী সম্বন্ধে আমার কোন সঠিক ধারণা থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আমি পুলিসকে গিয়ে সমস্ত কথা জানাতাম।

একটা ধারণা কিন্তু আপনার ছিল?—বাসব বলে উঠল।

কি ধারণা?

আপনি হত্যাকারীর মুখ দেখতে পেয়েছিলেন। এই মুখের বর্ণনা পুলিসের কাছে দিলে বোধহয় ভাল হত।

আমি তো আগেই বলেছি, আমার কি রকম ভয় ধরে গিয়েছিল। ভয়ের কারণ হল, যদি পুলিস মনে করে আমিই এই যজ্ঞের একমাত্র পুরোহিত, তখন?

আপনার ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। তবু আপনি ইচ্ছে করলে, নিজের নাম-ঠিকানা না দিয়ে পুলিসকে সমস্ত লিখে জানাতে পারতেন।

পারতাম। কিন্তু পারিনি। আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির ওপর বোধহয় পর্দা পড়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

বিষ্ণুদেব সান্যালের গল্পে সকলে এমনভাবে হারিয়ে গিয়েছিলেন যে, বৃষ্টি কখন থেমে গেছে সেদিকে কারুর খেয়াল নেই। ঘড়িতে অনেকগুলো ঘণ্টাধ্বনি হল এই সময়। সকলকে বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন করে দিল।

গোতম সুদ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মিস্টার সান্যালের বর্ণনা-ভঙ্গি চমৎকার। আশা করি এটা গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের একটা

গল্প উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করতে পারলে, এই বয়সেই আমি রোমাঞ্চকর গল্পের লেখক হবার চেষ্টা করতাম।

বিষ্ণুদেব বললেন, কিন্তু আমি আপনাদের যা বললাম তা সত্যি—বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সকলেই তখন যে যার কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

কেন বোঝা গেল না, কারুর মুখেই কথা নেই।

একে একে সকলে বিদায় নিলেন।

পরের দিন।

তখন সকাল সাড়ে সাতটা।

ফ্লোরা কটেজের অতিথিরা চায়ের টেবিলে একত্রিত হয়েছেন।

চা খেতে খেতে নানা রকম আলোচনা চলেছে। এক সময় বিষ্ণুদেব সান্যালের গল্পের কথা উঠল। অরবিন্দ দত্ত বললেন, আমার তো বিশ্বাস হয় না, মিঃ সান্যাল যা কিছু বলেছেন তা সমস্তই সত্যি। আপনাদের কি মত?

প্রশান্ত রায় বললেন, বিশ্বাস করতে তো আমারও মন চাইছে না। তবে এরকম ডাহা মিথ্যে কথা কেউ কি এইভাবে বলতে পারে?

এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে মিঃ সুদ বললেন।

আবার গল্প?

অতুল মুখার্জী বললেন, তাৎপর্যময় গল্প হলে বলতে পারেন।

মিঃ সুদ বললেন, তাৎপর্য আছে বৈকি! আমার গল্পটা শুনলেই মিঃ সান্যালের গল্পের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণাটা করতে পারবেন।

তাহলে তো শুনতেই হয়। বলুন।

এক ভদ্রলোকের প্রচুর পয়সা ছিল—মিঃ সুদ বলতে আরম্ভ করলেন, কাজেই কোন কাজকর্ম তিনি করতেন না। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দিয়েই তাঁর দিন কাটত। প্রত্যহ আট ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা আড্ডা চলত। ভদ্রলোক খুব জমাতে পারতেন অর্থাৎ গুল দিতে পারতেন। আড্ডায় বেশির ভাগ সময়টা তিনিই গুলের জাল বিস্তার করে রাখতেন। বন্ধুবান্ধবরা সমস্ত কিছু বুঝতে পেরে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলেও তাঁকে কিছু বলত না। এইভাবে দিন কাটছিল। একদিন ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, তুমি একটু গুল দেওয়া কমাও দেখি।

গুল! কেন?

তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তোমার কথা শুনে আড়ালে-আবডালে কি রকম হাসাহাসি করে, সে-খবর তুমি রাখ?

হাসাহাসি করে নাকি?

করেই তো। তুমি যখন গুল দিতে আরম্ভ কর, তখন তো মাত্রা বজায় থাকে না।

ওরা ধরে ফেলেছে আমি গুল মারি! তাই তো, কি করা যায় এখন?

এখন তোমার প্রধান কর্তব্য হল গুল মারা ছেড়ে দেওয়া।

তা কি পারব? এতদিনের অভ্যাস—

একদিনে পারবে না জানি—স্ত্রী বললেন, একটু একটু করে ছাড়তে হবে। যেমন ধর, গল্প করতে করতে কোথাও তুমি গুলের মাত্রা ঠিক রাখতে পারলে না, আমি বলে উঠলাম, উ-হুঁ-হুঁ—অমনি তুমি নিজেকে সামলে নিলে।

এ-প্রস্তাব মন্দ নয়।

একদিন আসর বেশ জমজমাট। ভদ্রলোক এক শিকার-কাহিনী ফেঁদেছেন।

তিনি বলছেন, তারপর মাচা থেকে তো আমি নামলাম। রাত তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এই সময় সুন্দরবনের এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আমি ছাড়া আর মানুষ ছিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। বাঘকে আমার ভয় করে না। বাঘ মেরে মেরে আমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। গজ দশেক এগিয়েছি বোধহয়। বাঘের গুরুগম্ভীর নিনাদ কানে এল। আমি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি বিরাট এক বাঘ ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার শরীরটা হবে পঞ্চাশ ফিট আর লেজটা ষাট ফিটের এক ইঞ্চি কম নয়।

স্ত্রী বলে উঠলেন—উঁহু-হুঁ-হুঁ—

ভদ্রলোক বুঝলেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তিনি নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করলেন। বাঘটা গড়াগড়ি খাবার পর উঠে দাঁড়াল, তখন ভাল করে দেখলাম, সব মিলিয়ে লম্বায় সে ফিট সত্তর হবে।

উঁহু-হুঁ-হুঁ—

আরো কয়েক পা এগিয়ে আমাকে অগত্যা চোখে দূরবীন লাগাতে হল। চারদিক ঝাপসা দেখছিলাম। এবার পরিষ্কার দেখতে পেলাম বাঘটাকে। সব মিলিয়ে লম্বায় ফিট পঁয়ত্রিশ হবে।

উঁ-হুঁ-হুঁ—

এবার ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি তখন থেকে উঁহু-হুঁ-হুঁ করে যাচ্ছ, এর মানেটা কি? তুমি কি বলতে চাও আমি তিন ফিটের একটা শেয়াল মেরেছিলাম?

সুদের গল্প শুনে সকলে হেসে উঠলেন।

কাঞ্জিলাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আপনি বলতে চান এই বাঘ শিকারের গল্পের মতই মিঃ সান্যালের গল্পটা অতিরঞ্জিত? কিন্তু—

তাঁর কথা শেষ হল না, দ্বারপ্রান্তে বিষ্ণুদেব সান্যালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

ঘরের সকলেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

মিঃ সান্যাল দরজার কাছ থেকে সরে, ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, মনে হচ্ছে আপনাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আমিই।

না…মানে… কালকে আপনি যে গল্পটা বলেছিলেন, আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করছিলাম। কোনরকমে কথাটা শেষ করলেন প্রশান্ত রায়।

আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, আপনারা কালকের গল্পটা আমার মনের কল্পনা হিসেবেই ধরে নিয়েছেন। যাক, বেড়াতে বেরুবেন নাকি? আমি আমার বড় গাড়িটা নিয়ে এসেছি।

কোন্ দিকে যাওয়া যায় বলুন?

যে কোন দিকে। যে কোন দিকের নৈসর্গিক দৃশ্যই আপনাদের মুগ্ধ করবে। যান, সকলে গিয়ে তৈরি হয়ে আসুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

মিঃ কাঞ্জিলাল ছাড়া আর সকলে উঠে পড়লেন। যে যার ঘরের দিকে চলে গেলেন, তৈরি হয়ে আবার ফিরে আসবার জন্যে।

আপনি যাবেন না?

না, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

মিঃ সান্যাল সিগার ধরিয়ে বললেন, ও। আচ্ছা, ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করলে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হবেন না?

না, না, বলুন?

রিয়া আপনার মেয়ে? তার বিয়ের কি ব্যবস্থা করছেন?

বিয়ে! এখনো কিছু করিনি।

কিন্তু ও-বিষয়ে তো আপনাকে এখন ভাবতে হবে।

প্রভাত কাঞ্জিলাল বিষ্ণুদেব সান্যালকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। রিয়ার বিয়ের কথা আমার এবার ভাবা উচিত। আপনার হাতে কোন পাত্র আছে নাকি?

আছে বলেই তো প্রসঙ্গটা তুললাম।

বেশ তো, সম্বন্ধটা করে দিন না। আপনি তো জানেন, রিয়া আমার একমাত্র মেয়ে। আমার যা কিছু আছে সমস্তই তার।

টাকাটাই বড় কথা নয় মিস্টার কাঞ্জিলাল। আপনার লক্ষ্মী-প্রতিমার মত মেয়েটিকে যে-কেউ বৌ করার জন্যে লুফে নেবে।

আপনি কিন্তু এখনও বলেননি ছেলেটি কে?

আমারই ছেলে রণদেব। আমি রিয়াকে বৌ করতে চাই মিস্টার কাঞ্জিলাল।

রণদেব!

আপনার কথাটাই আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, রণদেব আমার একটি মাত্র ছেলে। আমার যা কিছু আছে সমস্তই তার।

মিঃ কাঞ্জিলাল বিষ্ণুদেব সান্যালের হাত চেপে ধরলেন।

বললেন, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ রাজি আছি মিস্টার সান্যাল।

আপনি আমাকে বড় রকম একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালেন। আজ রিয়ার মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হত।

তাঁর কথার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পরই অন্যান্য সকলে ঘরে ফিরে এলেন।

আর অপেক্ষা না করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ সান্যাল।

কাঞ্জিলাল অবশ্য গেলেন না। তিনি অসুস্থ।

সন্ধ্যা নামার আগেই বিষ্ণুদেব সান্যাল ফিরে এলেন।

সকলকে নিয়ে প্রচুর ঘুরেছেন।

কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছেন। এই তাঁর স্বভাব, এখানে পরিচিত কেউ এলে হাজার শারীরিক অসুবিধা হলেও তাদের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরিয়ে আনবেনই।

অতিথিদের ফ্লোরা কটেজে ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

পার্লারেই দেখা হল রণদেবের সঙ্গে। ও বই পড়ছিল। দোকান বন্ধের দিনে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকাই ওর স্বভাব। মিঃ সান্যাল ওর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি অবধি এগিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় থমকে দাঁড়ালেন।

ফিরে এলেন। ছেলের সামনে একটা কোচে বসলেন।

রণদেব মুখ তুলে চাইল।

বিষ্ণুদেব বললেন, আমাদের এই বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, না দেব?

বিস্মিত গলায় রণদেব বলল, হবেই তো। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ যখন এ বাড়িতে নেই—

কিছুদিন ধরে বারবার আমারও এই কথা মনে হচ্ছে। কি করব ভাবছিলাম। এতদিনে তার সমাধান পেলাম।

তুমি যেন বিশেষ কিছু বলতে চাইছ বাবা?

তুমি মিস্টার কাঞ্জিলালের মেয়ে রিয়াকে দেখে থাকবে?

দেখেছি।

বেশ মেয়েটি। ওকে বৌ করে আনলে এবাড়ির নির্জনতা অনেকটা ঘুচবে।

বৌ?—উঠে দাঁড়াল রণদেব।

বেশ দেখতে মেয়েটিকে। তোমার অপছন্দ হবার কথা নয়।

এখন আমি নিজের বিয়ের কথা ভাবতেও পারছি না।

তুমি ভাববে কেন? তোমার বিয়ের কথা ভাবব আমি। পুত্রবধূ ঘরে আনব আমি।

কিন্তু····

বিষ্ণুদেব সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন।

কিসের কিন্তু?

নিজের সংকোচটা কোনরকমে কাটিয়ে ফেলেছে রণদেব।

উনি আবার পরিষ্কার গলায় বললেন, আমি এখন তোমার আপত্তির কারণটা কি জানতে চাই ?

মানে · রিয়াদেবীকে আমার

পছন্দ নয় ! রিয়ার মত সুন্দরী মেয়ে ক'টা দেখা যায়। তাছাড়া আমি যেক্ষেত্রে পছন্দ করেছি—

তোমার ও আমার পছন্দের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক বাবা।

রাগে সারা মুখ লাল হয়ে উঠল বিষ্ণুদেবের।

তিনি বললেন, আমি কাঞ্জিলালকে একরকম কথা দিয়ে ফেলেছি।

কথা দেবার আগে তুমি আমার মতামত তো নাওনি।

দেব !!

বাবা।

তুমি তাহলে রিয়াকে বিয়ে করতে চাও না ?

তুমি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছ বাবা। কাঞ্জিলালবাবুর মেয়ের চেয়ে আর ভাল মেয়ে যে নেই, তা তো নয়।

আছে। অনেক আছে। কিন্তু রিয়ার মত মেয়েই বা আমরা সচরাচর ক'টা দেখতে পাই ? আমি বুঝতে পারছি না, তুমি এই বিয়েতে আপত্তি করছ কেন ?

আমিও বুঝতে পারছি না বাবা, তুমিই বা এ ব্যাপারে এত জেদ করছ কেন ?

প্রায় এক মিনিট গুম হয়ে রইলেন বিষ্ণুদেব সান্যাল। তারপর বললেন, অযথা আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি পরিষ্কার জানতে চাই, কাঞ্জিলালকে দেওয়া কথার মূল্য তুমি আমাকে রাখতে দেবে কিনা ?

রণদেব কিছুই বলল না। মনের মধ্যে প্রচুর অস্বোয়াস্তি নিয়ে চুপ করে রইল।

তিনি আবার বললেন, চুপ করে থাকলে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাব না।

ওখানে আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।

নেই ! তাহলে আমার কথাটাও শুনে রাখ। এই বিয়েতে মত না দিলে, আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচনে আমাকে হয়ত নতুন করে ভাবতে হবে।

রণদেব কোন কথা না বলে পার্লার থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

রাতটা অভুক্ত অবস্থায় কেটে গেল রণদেবের।

সামান্য বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বাবা যে এই ধরনের কথা বলতে পারেন, তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল ওর। তীব্র অভিমানে রণদেব ক্রমেই নুয়ে পড়ছিল।

বিষ্ণুদেব সান্যালের সময়ও কাটছিল শোচনীয় মানসিক আতান্তরে। তিনিও কাল রাত্রি থেকে অভুক্ত আছেন।

পিত্তি-রক্ষার জন্যে শুধু এক গেলাস গরম লেবুর জল খেয়েছিলেন।

তিনি কোনদিন কল্পনা করেননি, তাঁর কথা এইভাবে উপেক্ষা করবে রণদেব। কেন ও এরকম করল? অন্য কোন মেয়েকে কি···

ওই ব্যাপারের পর বাপ ও ছেলেতে আর দেখা হয়নি।

ভোর সাড়ে সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল রণদেব।

কুলু উপত্যকায় ভোর সাড়ে সাতটার সময় ঝকঝকে আলোর সমাবেশ হয় না। আলোর ইসারা প্রকাশ পায় মাত্র। বাজার খোলে প্রায় দশটার সময়। তবু দোকানের উদ্দেশে রণদেব রওনা হল।

দোকানের বড় পাল্লাটা খুলে ভেতরে ঢুকল ও।

নিওন লাইটগুলো জ্বালল। হালকা রুপালী আলোয় ভরে গেল বিরাট দোকানখানা। রণদেব রোজকার মত আজও দক্ষিণের দেওয়ালে টাঙ্গান রামকৃষ্ণদেবের বিরাট অয়েলপেন্টিং-এর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, কাউন্টারের অপরপ্রান্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

দোকানের কর্মচারিদের আসতে এখনও বেশ কিছুক্ষণ বাকি। তারা এসে শো-কেসের ওপরকার কাঠের আবরণ সরিয়ে দেবে। দোকানটা ঝাড়া-মোছা করবে। ঝকঝকে রূপ নিয়ে নবজন্ম লাভ করবে আবার 'মডার্ন ভ্যারাইটি'।

সেগুন কাঠের কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ মনে বসে রইল রণদেব।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিল ও নিজেই জানে না। একসময় কাউন্টারের ওপর ঠক ঠক শব্দ হতে ও মুখ তুলল।

কখন এসে দাঁড়িয়েছে মালা। একটা আটানি নিয়ে কাউন্টারের ওপর ঠুকছে।

রণদেব তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অল্প একটু হেসে মালা বলল, আট আনার টফি—

এখনও দোকান খোলেনি।

দোকান না খুললে বুঝি টফি আমার খেতে নেই?

রণদেব কিছু না বলে কাউন্টারের ওপর রাখা জারের মধ্যে থেকে এক মুঠো টফি তুলে নিয়ে মালার দিকে এগিয়ে ধরল। এতক্ষণে ওর থমথমে মুখের ওপর দৃষ্টি পড়েছে মালার।

সে বলল, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন?

প্রশ্নটা এড়িয়ে রণদেব বলল, এত সকালে তুমি দোকানে এলে যে?

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল খুব ভোরে। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, তোমার দোকানে আলো জ্বলছে! চলে এলাম।

ও।

কিন্তু বললে না তো তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন ?

এমন কিছু হয়নি।

হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে। —মালা ওধার থেকে কাউন্টারের এধারে এল।—বল না কি হয়েছে ?

রণদেব পূর্ণ দৃষ্টিতে মালার দিকে তাকাল। উৎসুক, অনিন্দ্য মুখখানা।

বলল, বাবা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন।

বিয়ে ? একটা বড় রকম নেমন্তন্ন পাকিয়ে উঠছে বল ?

ঠাট্টা নয় মালা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক এ বিষয়ে বাবার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। তিনি চান আমার বিয়ে হোক রিয়ার সঙ্গে—

রিয়া ?

দিল্লী থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মিস্টার কাঞ্জিলাল। রিয়া তাঁরই মেয়ে। তুমি বোধহয় দেখে থাকবে তাকে। আমি অবশ্য এই বিয়ের প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছি।

নাকচ করে দিয়েছ ?

হুঁ। মালা—

বল।

আমরা দুজনেই গ্রোনাপ। চল না, আজই রেজিস্ট্রি করে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি ?

কি বলছ তুমি! ওতে তোমার বাবা মনে কষ্ট পাবেন।

তুমি এই কথা বলছ মালা! বাবার অন্যায় জেদকে মুখ বুজে সয়ে নেব, এই কি তুমি মনে-প্রাণে চাও। আমাদের এতদিনকার এই গভীর আন্তরিকতার মূল্য এক কপর্দকও নয় ?

কিন্তু—

রণদেব মালার খুব কাছে সরে গেল, কাঁধে হাত রাখল।—না, আর কোন কিন্তু নয়। এখানকার সমস্ত মায়া কাটিয়ে আমরা দুজন আজই এখান থেকে চলে যেতে পারি—অনেক দূরে। কলকাতায়।

ওরা দুজন কথায় এত তন্ময় হয়েছিল যে, দোকানে আরেকজন লোক এসেছে সেদিকে খেয়াল নেই। আগন্তুক অরবিন্দ দত্ত। তিনি দোকানে ঢুকেই ওদের একাগ্রভাবে কথা বলতে দেখে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ফিরে যেতে পারলেন না, তাঁর জুতোর শব্দে ওদের চটকা ভাঙল।

অরবিন্দ দত্তকে দেখে রণদেব তাড়াতাড়ি মালার কাছ থেকে সরে এল।

মালা কিছুটা বিব্রতভাবেই মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

অরবিন্দ দত্তর মুখের রেখায় রেখায় অপ্রস্তুতের ভাব। তিনি দরজার কাছ থেকে কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এলেন।

বললেন, সুপ্রভাত।

সুপ্রভাত। বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

হ্যাঁ। সকালে একটু বেড়ান আমার চিরকালের অভ্যাস। দোকানটা খোলা রয়েছে দেখে ঢুকে পড়লাম।

ভালই করেছেন। বসুন। চা খাবেন নাকি ?

চা ? কিন্তু এত সকালে চা·

সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। স্টোভ আছে। আমি নিজেই চা তৈরি করে থাকি।

তাহলে তো কোন কথাই নেই। খেতে পারি এক কাপ।

আমি এবার যাই। মালা ধীর গলায় বলল।

যাবে। বেশ।

মালা চলে গেল।

রণদেব স্টোভ জ্বালতে ব্যস্ত হল।

দুর্ঘটনার সংবাদটা পাওয়া গেল পরের দিন সকালে।

তখন সাড়ে সাতটা।

ফ্লোরা কটেজের তখন সবে চা-পর্ব শেষ হয়েছে। ড্রইংরুমে সকলে অলস আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। ঠিক এই সময় বিষ্ণুদেব সান্যালের গাড়োয়ালি ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করল। চোখে তার কাতরতার চিহ্ন।

হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ।

কাগজটা সে অতুল মুখার্জির হাতে দিল।

মিঃ মুখার্জি কাগজের ভাঁজ খুলতেই, দ্রুত হাতে লেখা কয়েকটা লাইন চোখে পড়ল। চিঠি তিনি পড়লেন। তাঁর মুখ ভয়ে নীল হয়ে উঠল। তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করে মিঃ সুদ প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার মিস্টার মুখার্জি ?

খুবই গুরুতর ব্যাপার মিস্টার সুদ। বিষ্ণুদেব সান্যাল মারা গেছেন।

মারা গেছেন !!

ঘরের মধ্যে গুঞ্জনের উত্তাপ দেখা দিল।

এই অভাবনীয় সংবাদে সকলে স্তম্ভিত হলেন।

যে লোক গতকাল সকলের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে গল্প-গুজোব করেছেন— আজ আর তিনি নেই ! এই রকমই হয়। কার যে কখন ওপারের ডাক পড়ে কেউ বলতে পারে না। সকলকে তৈরি থাকতে হয়। হয়ত বিষ্ণুদেব সান্যাল তৈরি ছিলেন --হয়ত ছিলেন না।

কি হয়েছিল তাঁর ? কে চিঠি লিখেছে ? কাঞ্জিলাল প্রশ্ন করলেন।

রণদেব লিখেছে। কাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বাবা হার্টফেল করেছেন।

আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়। চলুন, ও-বাড়ি যাওয়া যাক।

কথা ক'টা শেষ করে মিঃ মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর দেখাদেখি আর সকলে যে যার আসন ছাড়লেন।

ঘটনাস্থলে পেঁছিতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগল না তাঁদের। বিষ্ণুদেব সান্যালের শোবার ঘরের দরজার সামনে মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়েছিল রণদেব। ডাঃ বাসুদেবও দাঁড়িয়েছিলেন একপাশে। তিনি সান্যালের পারিবারিক চিকিৎসক।

রণদেব মুখ তুলল। তার চোখের কোলে কোলে তখনো জল।

দরজার গোড়ায় এসে সকলে দাঁড়ালেন। রণদেবের দিকে যেন চাওয়া যাচ্ছে না। ও আবার নিজের মাথা নত করল। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল খাটের ওপর। পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন বিষ্ণুদেব সান্যাল। চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন।

অরবিন্দ দত্ত ডাঃ বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, করনারি থ্রম্বসিস্ নাকি?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, ব্লাডপ্রেসারের রুগী ছিলেন উনি। থ্রম্বসিস্ বলেই তো আমার ধারণা।

বাসবও এসেছিল সকলের সঙ্গে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ও খাটের কাছে এগিয়ে গেল। বিরাট মেহগনি খাট—পুরু বিছানার ওপর বিষ্ণুদেব সান্যাল শুয়ে রয়েছেন। বুক অবধি তাঁর ক্যামেল উলের ভারি কম্বলটা টানা। মনে হচ্ছে না উনি মারা গেছেন—যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বাসব ওঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখল। তারপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ঘরের চারদিকে। মাঝারি সাইজের ঘরখানা। একধারে পর পর তিনটে জানলা। জানলাগুলো বন্ধ। ঘরে আসবাবের বাহুল্য নেই। খাট ছাড়া, টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা আলনা, বুককেশ, তাছাড়া আছে হিটার, ঘরের এককোণে টেবিলের ওপর প্যাড, কলম, খান দুই বই আর, রয়েছে কেরোসিনের চিমনি দেওয়া একটা বাতি।

বাসব সমস্ত খুঁটিয়ে দেখছিল।

কিছুদিন আগে ওদের মেডিকেল হোস্টেলে একজনের টাকা চুরি যায়। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল—পুলিস চুরির কোন কিনারাই করতে পারেনি। পুলিস হার মানলে, বাসবই একটা ছোট্ট সূত্রের সাহায্যে চোরকে ধরতে পেরেছিল। চোর ওদেরই একজন সহপাঠী।

সেই থেকে প্রতিটি ব্যাপারই খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এখানেও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর মনে কেমন খটকা লাগল। তাই

বাসব এগিয়ে এল মৃতদেহ ভাল করে দেখবার জন্যে। এবং ওই সঙ্গে চারপাশটায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। খাট থেকে টেবিলের দূরত্ব হাত আড়াই। টেবিলের ওপর যে কেরোসিনের বাতিটা রাখা ছিল, তার কাচের চিমনির প্রায় শেষপ্রান্তে গোল কালো একটা দাগ! দাগটা বোধহয় বাতির আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

বাসব টেবিলের ওপর থেকে মেঝের দিকে নিজের দৃষ্টি নামিয়ে আনল। মেঝেয় কার্পেট পাতা। জুট কার্পেট। টেবিলের কাছেই মেঝের ওপর একটা দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে রয়েছে।

বাক্সটা তুলে নিল বাসব। পুড়ে কুচকুচে কালো হয়ে উঠেছে। একপাশটা ভাঙা, একটাও কাঠি নেই বাক্সর মধ্যে। চিন্তিত মুখে আবার মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল। দাড়িগোঁফ কামানো মসৃণ মুখ। শুধু নাকের তলাটা ফুলো ফুলো। সূক্ষ্ম পোড়া দাগও রয়েছে কয়েকটা।

বাসব দরজার দিকে ফিরল। ঘরের ওই একটি মাত্র দরজা।

সকলে এতক্ষণ অবাক হয়ে বাসবের কার্যকলাপ দেখছিলেন। তাঁরা অবশ্য জানতেন, অতুল মুখার্জির এই তীক্ষ্ম বুদ্ধিশালী ভাগ্নেটি কখনো কখনো ভীষণ খেয়ালি হয়ে ওঠে।

বাসব ডাঃ বাসুদেবের সামনে এসে বলল, আপনি লক্ষ্য করেছেন, সান্যালের নাকের তলাটা একটু ফুলে উঠেছে?

হ্যাঁ।

এও বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবেন, ফুলে ওঠা জায়গাটার ওপর কয়েকটা পোড়া দাগও রয়েছে?

লক্ষ্য করেছি।

এরকম কেন হয়েছে বলতে পারেন?

একটু ভেবে নিয়ে বাসুদেব বললেন, আমার ধারণা, তাঁর সর্দি হয়েছিল। বেশি মাত্রায় সর্দি হলে নাকের তলা ফুলে ওঠা বিচিত্র নয়। আর আমরা যাকে পোড়া দাগ বলে অনুমান করছি, তা বোধহয় অত্যধিক রুমাল ব্যবহারের জন্য ঘসটানি লেগে সৃষ্টি হয়েছে।

সকলে উৎকর্ণ হয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন।

বাসব ডাক্তারের উত্তরের ওপর কোন মন্তব্য না করে, রণদেবের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, এই ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল?

রণদেব নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছিল। বাসবের কার্যকলাপ বিস্মিত হয়ে দেখছিল। বলল, বাবা কখনো দরজায় ছিটকিনি বন্ধ করে ঘুমোতেন না।

এতক্ষণে অতুল মুখার্জি কথা বললেন, বাসব, আমি বুঝতে পারছি না, এত কাণ্ডকারখানা করে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?

তাঁর গলায় বিরক্তির আমেজ।

মামার বিরক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাসব বলল মিস্টার সান্যাল, পুলিসে খবর দিন। আপনার বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি।

স্বাভাবিক ভাবে হয়নি!

না। আমার দৃঢ় ধারণা, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

পুলিসে খবর দেওয়া হল।

বিষ্ণুদেব সান্যাল যে সত্যিই খুন হয়েছেন, এ কথায় কেউই আস্থা রাখতে পারছিলেন না। বাসবের ধারণা যে মিথ্যে, এই ধারণাই সকলের মনে দৃঢ়ভাবে রেখায়িত হয়েছিল। কিন্তু একটা খটকা যখন লেগেছে, তখন পুলিসে খবর না দিয়ে উপায় নেই।

খবর পেয়েই ইন্সপেক্টর চামন ডোগরা ঘটনাস্থলে এলেন।

ডোগরার বয়স বছর ছত্রিশের মধ্যেই। গৌরবর্ণ ও দীর্ঘদেহী। বিরাট গোঁফজোড়া তাঁর চেহারাকে আরো গুরুগম্ভীর করে তুলেছে।

তিনি মৃতদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে, বারান্দায় ফিরে এলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে সকলে অপেক্ষা করছিলেন সেখানে।

ডোগরা বললেন, মিস্টার সান্যাল যে স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি, খুন হয়েছেন, এ ধারণা আপনাদের মনে এল কিভাবে?

কেউ কোন কথা বলবার আগে বাসব বলল, আমি মৃতদেহের চতুর্দিকের অবস্থা লক্ষ্য করে এই অভিমত প্রকাশ করেছি।

আপনার পরিচয়?

অতুল মুখার্জি বললেন, আমি ভারতসরকারের অর্থ দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি। ও আমার ভাগ্নে। বাসব ব্যানার্জি। ডাক্তারি পড়ে।

ও। একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডোগরা বললেন, তারপর, মৃতদেহের চতুর্দিকে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, তা নিশ্চয়ই আমাকে জানাতে আপনার আপত্তি নেই মিস্টার ব্যানার্জি!

নিশ্চয়ই না। বাসব বলল, তবে আপনি আমার অভিমতটা গল্পের আকারে শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবেন না।

তাই নাকি! তাহলে যেভাবে বললে আমি বিশ্বাস করব, সেইভাবেই বলুন।

কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বডি মর্গে পাঠান। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট পেলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু আমি আপনার কথার ওপর নির্ভর করে তো মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠাতে পারি না। আপনি একজন দায়িত্বশীল লোকের ভাগ্নে। তবু আপনাকে জানিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি, পুলিসকে মিছিমিছি হ্যারাস

করার দায়িত্ব অনেক —

বাসব বলল, আমি একজন ছাত্র বলে বোধহয় আপনি আমার কথার গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। যাই হোক, আমি আমার মামাকেই অনুরোধ করছি, তিনি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠাতে আপনাকে অনুরোধ করুন।

তুই কি বলছিস আমি··, অতুল মুখার্জি কথাটা শেষ করলেন না।

এখন তুমি ইতস্তত করলে বড়রকম একটা কেলেঙ্কারির ওপর চিরদিনের মত পর্দা পড়ে যাবে মামা।

কিন্তু···

আমি বলছি মিস্টার সান্যাল খুন হয়েছেন। একথা পরে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

রণদেব বলল, যদিও বিশ্বাস হয় না। তবু মিস্টার ব্যানার্জি যখন এত জোর দিয়ে বলছেন, তখন বাবার মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠানই ভাল।

আর কোন কথা চলে না।

গম্ভীর মুখে ইন্সপেক্টর ডোগরা মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন।

বাসব বলল, আর দুটো প্রশ্ন করব আমি মিস্টার সান্যাল।

বলুন ?

এ বাড়িতে লাইট থাকা সত্বেও আপনার বাবার ঘরের টেবিলের ওপর ওই কেরোসিনের বাতিটা রাখা রয়েছে কেন ?

বাবা ঘুমোতে যাবার সময় বেডরুম-ল্যাম্প জেবলে রাখার চেয়ে কেরোসিনের আলো জেবলে ঘুমানো বেশি পছন্দ করতেন।

আচ্ছা, কাল রাত্রে কোনরকম শব্দ পেয়েছিলেন ?

কি ধরনের শব্দ ?

এই ধরুন, পটকা ফাটানো গোছের শব্দ ?

না। কাল রাত্রে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি গেছে--ঝড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু কথা শুনিনি।

বাসব আর কিছু বলল না।

অন্যমনস্কভাবে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

পরের দিন।

সন্ধ্যা তখন ছ'টা।

বিষ্ণুদেব সান্যালের মৃত্যুর পর পুরো ছত্রিশটা ঘণ্টা কেটে গেছে।

'ফ্লোরা কটেজে'র প্রতিটি প্রাণী উৎকণ্ঠার প্রান্তসীমায় এসে অপেক্ষা করছেন। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট কি বলে কে জানে। অতুল মুখার্জি

ভাগের কাণ্ডকারখানায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন। ওকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে বার বার আক্ষেপ করছেন স্ত্রীর কাছে।

রণদেব মূক হয়ে রয়েছে। আজ ও কত একলা।

সাড়ে ছ'টা আন্দাজ সময় চমন ডোগরা এলেন।

ইন্সপেক্টার ডোগরার মুখে কালকের মত এখন আর সে অবজ্ঞার ভাব নেই, বরং সারা মুখে একটা মোলায়েম হাসি খেলা করছে।

তিনি ঘরে প্রবেশ করেই, বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত ইয়ং ম্যান, আপনার প্রতি আমার ব্যবহার গতকাল মোটেই আশাপ্রদ হয়নি।

বাসব মৃদু হেসে বলল, মনে হচ্ছে আমার কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে।

হ্যাঁ। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সার্জনদের অভিমত —মিস্টার সান্যাল হার্টফেল করে মারা যাননি। তাঁকে দম আটকে মারা হয়েছে। পাকস্থলিতে গ্লিসারিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, নাকের মধ্যে ও শ্বাসনলীর চতুর্দিক পুড়ে গেছে। তাঁরা স্থির করতে পারেননি এ রকমটা হয়েছে কিভাবে।

ঘরের সকলে স্তব্ধ হয়ে ইন্সপেক্টারের কথা শুনলেন।

অসংলগ্ন গলায় রণদেব বলল, শেষপর্যন্ত তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল বাবা খুন হয়েছেন! আমি এখন কি করব?

আপনি অস্থির হবেন না মিস্টার সান্যাল। ইন্সপেক্টার বললেন, আপনার মনের অবস্থা অনুমান করে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। এ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। যাইহোক, এবার আমাকে হত্যা-তদন্ত আরম্ভ করতে হবে। এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁরা সকলেই মৃত মিস্টার সান্যালের বিশিষ্ট বন্ধু, সে-ক্ষেত্রে সকলকেই আমার প্রয়োজন হতে পারে।

মিঃ কাঞ্জিলাল বললেন, এই শোচনীয় ব্যাপারে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি ইন্সপেক্টার। ভাবতেও পারা যায় না মিস্টার সান্যাল খুন হতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আপনাকে এই ব্যাপারে যথাযোগ্য সাহায্য করবেন।

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলার আগে মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই। ইন্সপেক্টার বাসবের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

বলুন।

এখানে নয়। আসুন যে-ঘরে মিস্টার সান্যাল খুন হয়েছেন সেই ঘরে যাওয়া যাক।

বিষ্ণুদেব সান্যালের শয়ন-কক্ষটি পুলিসের পক্ষ থেকে শিল করা ছিল।

ইন্সপেক্টার ডোগরা শিল ভেঙে তালা খুললেন। বাসবকে নিয়ে তারপর প্রবেশ করলেন ঘরে। শূন্যতায় ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে।

একদিন এই ঘরখানা হাসি উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত ছিল আর আজ—এই রকমই হয়।

ডোগরা সিগারেট ধরালেন।

কেসটা এগিয়ে ধরে বললেন, চলে নাকি ?

না।

এবার বলুন, আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন মিস্টার সান্যাল খুন হয়েছেন ?

চারটে জিনিস লক্ষ্য করে –বাসব বলল, সেই চারটে জিনিসের প্রতি আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম. টেবিলের ওপর কেরোসিন তেলের ল্যাম্পটা দেখছেন ? আবার ল্যাম্পের চিমনির ওপরের দিকে ধোঁয়ায় কালিপড়া কালো রিং পড়া চিহ্নটা লক্ষ্য করুন। দ্বিতীয়, ঘরের দরজা-জানলা সমস্ত বন্ধ ছিল। তৃতীয়, মৃত মিস্টার সান্যালের নাকের তলায় খুব ছোট ছোট পোড়া দাগ।

আর চতুর্থ ?

বাসব পকেট থেকে দেশলাইয়ের সেই বাক্সটা বার করে বলল, চতুর্থ, এই পোড়া ভাঙা দেশলাইটা। আমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম এই ঘরের কার্পেটের ওপর থেকে। আপনি দেশলাইটা শুঁকে দেখুন।

ইন্সপেক্টার দেশলাইটা শুঁকে বললেন, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে।

এবার নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন, আমি কিভাবে বুঝতে পেরেছিলাম মিস্টার সান্যাল খুন হয়েছেন ?

না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমি মোটেই ধরতে পারিনি।

বাসব হালকা গলায় বলল, মিস্টার সান্যালকে জেলিগনাইট চার্জ করে মারা হয়েছে।

জেলিগনাইট !

হ্যাঁ। চারিধারের অবস্থা এবং দেশলাইয়ের বাক্সটা শুঁকে আমার এই ধারণাই মনে এসেছিল। পরে আমার সবসময়ের সঙ্গী সূক্ষ্ম বস্তুকে পরীক্ষা করার যন্ত্র দিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা পরীক্ষা করতেই আমার ধারণা সত্যতায় রূপ নিল।

কিন্তু জেলিগনাইট বস্তুটা কি ?

একরকম তেজযুক্ত গ্যাসের সমষ্টি। নাইট্রো গ্লিসারিস, পোটাসিয়াম, উডমিল প্রভৃতি দিয়ে এই মারাত্মক বস্তুর জন্ম হয়।

ঘন ঘন কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়ে ইন্সপেক্টার ডোগরা বললেন, আপনার কথাই মানলাম, কিন্তু কিভাবে জেলিগনাইট প্রয়োগ করা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আপনি কোন থিওরি খাড়া করেছেন কি ?

করেছি। আমার থিওরি হল, সকলের অলক্ষ্যে বাড়িতে প্রবেশ করে হত্যাকারী মিস্টার সান্যালের সঙ্গে গল্প-গুজব করছিল। এখানে ধরে নিতে হবে, মিস্টার সান্যাল হত্যাকারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সে দিন রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। ঝড় ওঠার পরই হত্যাকারী মিস্টার সান্যালের কাছ থেকে বিদায় নেয়, তাঁকে ঘুমোবার পরামর্শ দিয়ে। তবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে সে কেরোসিন ল্যাম্পের চিমনির ওপর জেলিগনাইট ভরা দেশলাইটা রেখে আসে। ঘরে আর কোন আলো ছিল না। তাই হয়ত মিঃ সান্যাল ঘুম-জড়ানো চোখে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেননি। মুখ আটকানো থাকার দরুণ ধোঁয়া প্রথমে চিমনি থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি। কালো রং-এর একটা রিং ফর্ম করেছিল শুধু। ক্রমে আগুনের হল্কায় জেলিগনাইট সমেত দেশলাই তেতে উঠে ফেটে পড়ে। ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুণ তেমন ছড়ায়নি। ঘুমন্ত অবস্থাতেই এই ভাবে মারা গেলেন মিঃ সান্যাল।

চমৎকার। ইন্সপেক্টর ডোগরা বাসবের পিঠ চাপড়ে বললেন, এই বয়সে এতখানি বুদ্ধিমত্তা সচরাচর দেখা যায় না। এখন কিভাবে কাজে এগুতে হবে বলুন।

এখন আপনার প্রধান কাজ হল সকলের কাছ থেকে এজাহার নেওয়া, তারপর অন্য কথা।

এজাহার তো নেবই। তবে—বেশ।

ডোগরা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাসবও।

বারান্দায় তখনো সকলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুধু সংখ্যায় একজন বেশি। তিনি সামশের রাই।

রণদেবের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টার বললেন, আপনাকে এবার আমি গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই মিস্টার সান্যাল। আর সকলে অনুগ্রহ করে ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন। মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি যাবেন না। আপনি এখানেই থাকুন।

বাসব ও রণদেব ছাড়া আর সকলে ড্রইংরুমে চলে গেলেন।

দুর্ঘটনার দিন রাত্রে আপনি ক'টায় দোকান থেকে বাড়ি ফেরেন?

দশটার পর।

প্রত্যহ এই সময় বাড়ি ফিরতেন নিশ্চয়ই?

না, প্রতিদিন আমি আটটার সময় দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতাম।

সেদিন এত দেরি হবার কারণ?

মন ভাল ছিল না। দোকান বন্ধ করে ওখানেই বসেছিলাম।

যদিও ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও মন খারাপের কারণটা জানতে চাই।

একটু ইতস্তত করে রণদেব রিয়াকে বিয়ে করা-সংক্রান্ত যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল, তা একে একে বলে গেল।

মিস কাঞ্জিলালকে বিয়ে করতে না চাওয়ার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে?

আমি অন্য একজনকে বিয়ে করতে চাই।

তার নাম বলতে আপনার বোধহয় আপত্তি নেই।

আপত্তি কিসের! মিঃ রাইয়ের মেয়ে মালাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

হুঁ। একটু থেমে ইন্সপেক্টার আবার প্রশ্ন করলেন, তাহলে রাগারাগির দরুণ দুর্ঘটনার দিন রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে আর মিঃ সান্যালের সঙ্গে দেখা করেননি?

না, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

মিঃ সান্যালের স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু আছে, সমস্তই এখন তাহলে আপনিই পাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

মালাদেবীকেও বিয়ে করার ব্যাপারে আর কোন অসুবিধা রইল না, কি বলেন?

অ্যাঁ···মানে—

আপনি এবার যেতে পারেন। প্রশান্ত রায়কে গিয়ে পাঠিয়ে দিন।

রণদেব দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

তারপরই ঘরে প্রবেশ করলেন প্রশান্ত রায়।

লম্বা তাঁকে বলা চলে না। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। সাধারণ ধাঁচের মুখের গড়ন। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করব মিস্টার রায়। ইন্সপেক্টার বললেন।

বেশ তো, আমি সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

মৃত মিঃ সান্যালকে আপনি কতদিন থেকে জানতেন?

তাঁর নাম আমি অনেকদিন থেকেই জানি। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ হয়েছে বছর দশেক।

কি সূত্রে আলাপ হয়?

উনি সি. পি. ডব্লু. ডি-র পদস্থ কর্মচারি ছিলেন। আমিও উপস্থিত একই বিভাগে ওই পদেই আছি। বছর দশেক আগে মিঃ সান্যাল যখন কাজ থেকে অবসর নিলেন, তখন তাঁকে খুব ভাল ভাবে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়। সেই ফেয়ারওয়েল পার্টিতেই আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ হয়। তারপর ক্রমেই অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে।

হঠাৎ আপনারা এখানে বেড়াতে এলেন কেন?

হঠাৎ নয়। বেশ কিছুদিন থেকেই আমরা কয়েকজন ঠিক করে রেখেছিলাম মানালিতে বেড়াতে আসব। এবার একই সঙ্গে সকলে ছুটি পেলাম, তাই—

ও। আচ্ছা, এই হত্যার ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ হবে বলুন।

আপনি শুনেছিলেন, মিঃ সান্যাল নিজের ছেলের সঙ্গে মিঃ কাঞ্জিলালের

মেয়ের বিয়ে ব্যবস্থা করছিলেন ?

শুনেছিলাম

তাহলে এও শুনে থাকবেন, তাঁর ছেলের এ-বিয়েতে মত ছিল না। বাপ ও ছেলেতে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে এই ব্যাপার নিয়ে ?

শুনেছি।

এখন আপনার কি মনে হয়, রাগের মাথায় রণদেববাবু এই অঘটন ঘটাতে পারেন না ?

চমকে উঠলেন প্রশান্ত রায়।

বললেন, রণদেব! না, না—তার পক্ষে একাজ অসম্ভব।

হুঁ। দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যা থেকে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আপনার কর্মধারা কি ছিল ?

বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে আমি নিজের ঘরে চলে যাই। ডিনারের আগে পর্যন্ত ঘরেই থাকি। তারপর ডিনার সেরে সাড়ে ন'টা আন্দাজ সময় শুয়ে পড়ি।

খাওয়ার টেবিলে সকলকেই উপস্থিত দেখেছিলেন ?

একটু ভেবে নিয়ে প্রশান্ত রায় বললেন, না। মিঃ সুদ আর অরবিন্দ দত্ত খাওয়ার টেবিলে সে-সময় ছিলেন না।

এবার আপনি যেতে পারেন মিস্টার। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

প্রশান্ত রায় চলে যাবার পর ইন্সপেক্টার ডোগরা সিগারেট ধরালেন।

বললেন, কি রকম প্রশ্ন হচ্ছে ?

বাসব বলল, খুব ভাল। এ ধরনের প্রশ্নেই বেফাঁশ কথা বেরিয়ে পড়ে।

এরপর একে একে ডাকা হল, অতুল মুখার্জি, মিঃ কাঞ্জিলাল, মিঃ সুদ, অরবিন্দ দত্তকে।

সকলের উত্তরে কোন নতুনত্ব ছিল না। প্রশান্ত রায়ের কথাগুলোই সকলে আওড়ে গেলেন বলতে গেলে। শুধু খাওয়ার টেবিলে অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসেবে মিঃ সুদ বললেন, তার শরীর ভাল না থাকায় তিনি না খেয়েই শুয়ে পড়েন। আর অরবিন্দ দত্ত খেতে গিয়েছিলেন সকলের খাওয়া হয়ে গেলে। কারণ তিনি একটা জরুরী চিঠি লেখায় ব্যস্ত ছিলেন।

সামশের রাইকে কোন প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করলেন না ইন্সপেক্টার।

সবশেষে এল রিয়া। রিয়া কাঞ্জিলাল।

অনিন্দ্যসুন্দর না হলেও আকর্ষণীয় মুখশ্রী তার। একহারা। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের ওপর।

ডোগরা মেয়েটিকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি মর্মাহত মিস কাঞ্জিলাল। অনন্যোপায় হয়েই—

আপনি সঙ্কোচ করবেন না ইন্সপেক্টার,—রিয়া পরিষ্কার গলায় বলল, আপনার যদি কোন প্রশ্ন আমাকে করবার থাকে তো স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।

হ্যাঁ, গোটাকয়েক প্রশ্ন আমি আপনাকে করব। দুর্ঘটনার আগে সন্ধ্যাবেলায় আপনি সারাক্ষণ ফ্লোরা কটেজেই ছিলেন ?

হ্যাঁ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই বেড়াতে বেরুইনি। বই পড়ছিলাম।

তারপর ? অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার পরই কি আপনি শুয়ে পড়েছিলেন ?

না, খাওয়া-দাওয়ার পর শার্সি আঁটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি-পড়া দেখছিলাম। হঠাৎ —

হঠাৎ কি—বলুন ?

হঠাৎ দেখলাম গায়ে বর্ষাতি মুড়ে একজন লোক সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ফ্লোরা কটেজে এসে ঢুকল !

আপনি এতে অবাক হয়েছিলেন ?

নিশ্চয়ই। এই ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যে ওই সময় কোন আগন্তুকের আগমন বিস্ময়কর নয় কি ?

আগন্তুকটি কে ছিলেন ?

চিনতে পারিনি, দোতলা থেকে তার মুখ আমি দেখতে পাইনি।

তখন কত রাত হবে ?

বোধহয় সাড়ে দশটা হবে ?

অসংখ্য ধন্যবাদ মিস কাঞ্জিলাল। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

রিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আকাশে পাতাল ভাবছে বাসব।

যদিও এই হত্যা-রহস্য তদন্তের দায়িত্ব ওর নয়। তবু এই গোলযোগ নিষ্পত্তি হোক, এই ইচ্ছাই বাসবের মনে সদাসর্বদা জাগরুক। খুব ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিসের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া ওর স্বভাব। আর সেই তীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি থাকার দরুণই ও সকলের ধারণাকে উল্টে প্রমাণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে যে বিষ্ণুদেব সান্যালের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—তাঁকে খুন করা হয়েছে।

এই গভীর রাত্রে বাসব আরো গভীর ভাবে মাথা ঘামাচ্ছে, যদি কোন নতুন সূত্রের সন্ধান পায়। তাহলে ইন্সপেক্টার ডোগরার তদন্তে অনেক সুবিধা হবে। চাই কি সমস্ত রহস্য দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

বাসব ভাবতে থাকে।

স্বার্থহীন ভাবে কেউ কাউকে এত সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে হত্যা করতে পারে না। মিঃ সান্যালকে হত্যা করে হত্যাকারী প্রচুর লাভবান হয়েছে

সন্দেহ নেই। কিন্তু লাভের আকারটা কি? হত্যার মোটিভ জানতে পারলেই হত্যাকারীকে ধরা সহজ হবে—এ সত্য অজানা নয় বাসবের। তাই ও এত ভাবছে। যদি চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মোটিভের কোন সন্ধান পাওয়া যায়।

এক সময় দুটো বাজল।

বারান্দায় ওয়ালক্লকটায় জলদগম্ভীর শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসবের মাথার মধ্যে ঝিলিক খেলে গেল। আশার পরিপূর্ণ ঝিলিক। মোটিভের সন্ধান মনে হচ্ছে যেন পাওয়া গেল। বাসব বিছানার আহ্বান আর উপেক্ষা করতে পারল না। চিন্তাযুক্ত মনের ওপর হাল্কা ভাবের প্রলেপ পড়তেই ঘুম নেমে আসছে দু'চোখে।

বাসব বিছানায় আশ্রয় নিল।

কিছু বেলা হলে সকলে বেড়াতে বেরুলেন।

ফ্লোরা কটেজের অতিথিরা দলবদ্ধ হয়ে মানালির পথে নেমে পড়লেন।

বাসব গেল না। ওর হাতে এখন অনেক কাজ। এই অবসরে কাজগুলো গুছিয়ে রাখতে না পারলে, পরে অনেক অসুবিধা হবার সম্ভাবনা।

ঘণ্টা দুয়েক পরে সকলে বেড়িয়ে ফিরলেন।

বাসব তখন নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ পড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ বেড়ানোর দরুণ সকলেরই চনচনে খিদে পেয়েছিল। কাজেই জাঁকিয়ে ব্রেকফাস্ট হল। ব্রেকফাস্টের পর সকলে যে যার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

বাসব অলস ভাবে উঠে দাঁড়াল।

ও একবার ওদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল। করাঘাত করল বারান্দার শেষপ্রান্তের ঘরখানার দরজায়। একবার করাঘাতেই দরজা খুলে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ দত্ত।

তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, বাসব তুমি—?

আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত আছেন?

ব্যস্ত! কই না।

আমি গোটা কয়েক কথা বলতে চাই আপনাকে।

কি কথা?

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে-কথা বলা যায় না।

এস, ভেতরে এস।

দরজার গোড়া থেকে সরে গেলেন অরবিন্দ দত্ত। বাসব ঘরে প্রবেশ করল।

বস। এইবার বল।

বাসব একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা

হয়েছে মিঃ সান্যাল সাড়ে দশটা থেকে বারোটার মধ্যে মারা গেছেন।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আমরা মিস কাঞ্জিলালের মুখে শুনলাম, তিনি একজন আগন্তুককে রাত সাড়ে দশটার সময় সেদিন এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলেন। সেই আগন্তুকটি কে সে-বিষয়ে আপনার মতামতটা জানতে চাই।

আমার মতামত! আমি তার কি জানি!

জানেন বইকি! বেশ, আমি ব্যাপারটা আরো সরল করে দিচ্ছি। সেদিন রাত্রে ডিনার টেবিলে আপনি আর মিস্টার সুদ অনুপস্থিত ছিলেন। পুলিসকে আপনারা দুজনেই অবশ্য বলেছেন যে, আপনারা নিজের নিজের ঘরে ছিলেন। কিন্তু তার কোন জোরালো সাক্ষী খাড়া করতে পারেননি।

তুমি বলতে চাও আমি--

হ্যাঁ, আমি ঠিক ওই কথাই বলতে চাই। মিস্টার সুদ সম্বন্ধে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আপনি ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়েছিলেন এবং ফিরেছিলেন সাড়ে দশটার পর।

অরবিন্দ দত্ত নিজের চেয়ার থেকে উঠে বাসবের কাছে এগিয়ে এলেন।

গলায় শ্লেষ ঢেলে দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে এইভাবে প্রশ্ন করছ কেন বলতো? তুমি কি শার্লক হোমসের মত এই খুনের তদন্ত হাতে নিয়েছ নাকি?

বাসব গায়ে শ্লেষ না মেখে বলল, এমনও তো হতে পারে পুলিসের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

হয়েছে নাকি! বেশ—বেশ—কিন্তু তাই বলে তুমি অন্যায় কিছু বললেই যে আমি মেনে নেব, তা ভেবে নিচ্ছ কেন?

আপনি তাহলে সেদিন রাত্রে বাইরে যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। কিন্তু সে কথাকে মিথ্যে প্রমাণিত করছে আপনার ভিজে রেন-কোটটা।

দেওয়ালে টাঙ্গান ভিজে রেন-কোটটার দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠলেন অরবিন্দ দত্ত।

এই বুদ্ধি নিয়ে শার্লক হোমস্ হবার শখ। বৃষ্টি কাল সকালেও হয়েছে! আমি সেই সময় রেন-কোটটা ব্যবহার করেছিলাম।

আর এই ভ্যানিটি ব্যাগটা। এটাকে কোন্ যুক্তি দিয়ে কাটাবেন?

বাসব নিজের গায়ের শালের তলা থেকে একটা কালো রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ বার করেছে ততক্ষণে। ব্যাগটা দেখেই অরবিন্দ দত্তর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

তিনি অসংলগ্ন গলায় বললেন, তুমি—তুমি ব্যাগটা কোথায় পেলে?

যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে! আমি ভাবলাম, এটাকেও বুঝি অস্বীকার করে যাবেন।

মানে⋯তুমি⋯

আজ কিছুক্ষণ আগেই আমি ব্যাগটা এই ঘর থেকে নিয়ে গেছি। আপনাদের অনুপস্থিতিতে এই বাড়ির প্রত্যেকের মালপত্র আমাকে সার্চ করতে হয়। দেখছেন, উনিশ বছর ধরে কত যত্নে ভ্যানিটি ব্যাগটা বিষ্ণুদেব সান্যাল নিজের কাছে রেখেছিলেন।

অরবিন্দ দত্তর মুখের রঙ পাল্টে গেছে।

তিনি আমতা আমতা করে বললেন, এই ব্যাগটার সঙ্গে মিস্টার সান্যালের মৃত্যুর কোন যোগ নেই।

নেই নাকি! বাসবের গলায় এবার বিদ্রূপ, আমার থিওরি ক্রমেই কারেক্ট হয়ে উঠছে মিস্টার দত্ত। এই ব্যাগটাই উনিশ বছর আগে, বরফের মধ্যে যেখানে মেয়েটি তলিয়ে গিয়েছিল সেখানে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মিস্টার সান্যাল। এটা তাঁর কাছেই ছিল। এখন হঠাৎ এর অবস্থান আপনার কাছে সন্দেহজনক নয় কি? এবার স্বীকার করুন যে সেদিন রাত্রে, আপনি ঝড়-জল মাথায় করে মিস্টার সান্যালের কাছে গিয়ে এই ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

কেন?

মানে ·· আসল ব্যাপার

আমার কাছে সমস্ত খুলে বলুন মিস্টার দত্ত। পুলিসের কানে কথাটা উঠলে আপনার নাজেহাল অবস্থা হবে! কেন আপনি সকলের অলক্ষ্যে ব্যাগটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন? বলুন?

প্রায় মিনিট খানেক কোন উত্তর দিলেন না অরবিন্দ দত্ত।

নিজের কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে আঙুল চালালেন ঘন ঘন।

তারপর নিজের মন স্থির করেই বুঝি বললেন, তোমার কাছে আর কিছু লুকোব না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মিস্টার সান্যাল বলেছিলেন, এই ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ছোট একটা বইয়ের ভেতরে অপূর্বসুন্দর এক মহিলার ছবি ছিল।

হ্যাঁ। মহিলাটির নামও তিনি বলেছিলেন, সরোজ মেহরা।

সরোজের কথা এতদিন পরে আমি যে এইভাবে শুনতে পাব ভাবতে পারিনি। আমার জীবনে সরোজ যেন ধূমকেতুর মত এসেছিল, মিলিয়েও গিয়েছিল ঠিক সেইভাবে। তার জীবনের পরিণতির কথা মিস্টার সান্যালের মুখে শুনতেই আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে লাগল। তাই সকলের অলক্ষ্যে সেদিন রাত্রে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে সরোজের ব্যাগ আর ছবিটা চেয়ে নিতে। তার স্মৃতি-চিহ্নর কিছু নমুনা অন্তত আমার কাছে থাকুক।

আপনি সরোজ মেহরাকে চিনতেন?

চিনতাম! আমি তাকে ভালবাসতাম। শুনতে চাও তুমি সে গল্প?

বললেন।

অরবিন্দ দত্ত বলতে আরম্ভ করলেন—

কানপুর থেকে আগ্রায় বদলি হয়েছে অরবিন্দ।

তখনও ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তরে যোগ দেয়নি সে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের অধীনেই কাজ করছে। স্বাধীন মানুষ অরবিন্দ। তার দু'বছর বয়সে মা-মারা গেছেন। বাবা গত হয়েছেন দশ বছর বয়সে। ভাইবোন ছিল না। মামার বাড়িতে থেকেই সে গ্র্যাজুয়েট হল। সেজমামা উত্তর-প্রদেশের শিক্ষাদপ্তরে এই ভাল চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন।

তারপর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পরিশ্রমী অরবিন্দ ধাপে ধাপে সিঁড়ি পার হবার মত প্রমোশনের পর প্রমোশন পেয়ে আজ চাকরির ক্ষেত্রে বেশ উঁচু পদেই অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বেশ কিছুদিন কানপুরে ছিল। আবার বদলি। এই এক ঝামেলা।

তুফান এক্সপ্রেসেই সে আগ্রা যাচ্ছে। এই ট্রেনটাই বেশ সুবিধার। বেলা প্রায় আটটার সময় কানপুর ছাড়ে। আগ্রায় পেঁছায় বিকেলে। বেশ দিনে দিনেই যাওয়া যায়।

কামরায় আর কেউ ছিল না। আর্দালি আছে অ্যাটেন্ডেট কামরায়। মালপত্র সমস্ত ব্রেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। শীতকাল। চারিধার কুয়াশা করে রয়েছে। জানলার কাচগুলো ফেলে দিয়ে অরবিন্দ একটা বই নিয়ে বসল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে।

বইয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ একাগ্র থাকা গেল না।

চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল ঘুমে। সারারাত ঘুমোবার পর এই সাতসকালে আবার ঘুম! ট্রেনের দুলুনির কেমন মাদকতা আছে। অরবিন্দ বার্থের ওপর টান হয়ে শুলো। ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল টুণ্ডলায়। দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। লক করে শুয়েছিল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল সে।

কামরায় প্রবেশ করল একটি তরুণী। শালোয়ার ও পাঞ্জাবি তার গায়ে। তার ওপর কোট। হাতে ছোট সুটকেশ।

মুখ চোখ শুকনো। রুক্ষ চুলগুলো অবিন্যস্ত।

দ্বিতীয় লোয়ার বার্থটায় বসল সে।

এক সময় তুফান টুণ্ডলা ছাড়ল। মেয়েটি স্থির হয়ে বসে আছে।

আর ঘুমবে না অরবিন্দ। আবার বইটা তুলে নিল।

পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে তুফান। ক্রমে হাতরাস পার হল।

খিদে পাচ্ছে। অথচ মেয়েটির সামনে খাবার বার করে খেতে কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছে অরবিন্দর। অবশ্য পথ চলতে এই ধরনের সেণ্টিমেণ্টকে

প্রশ্রয় দেবার কোন মানে হয় না। তবু সে নিজের এই ভাবকে কোনদিনই জয় করতে পারল না।

শেষে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে গলা খাঁকারি দিয়ে অরবিন্দ বলল, শুনুন—

ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি তাকাল। বলল, বলুন?

আপনি বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবেন, খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে গেছে?

কথাবার্তা উর্দু-হিন্দী মিশিয়ে হচ্ছিল। মেয়েটি যে পাঞ্জাবী সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল অরবিন্দ।

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন।

বলছিলাম, আসুন না, খাওয়া-দাওয়াটা আমরা সেরে ফেলি।

আমার সঙ্গে খাবার নেই।

আমার সঙ্গে আছে।

আপনার খাবার, আমি খেতে যাব কেন?

যা আছে, তাতে দুজনেরই হয়ে যাবে।

মেয়েটি এবার হেসে ফেলল। বলল, আপনি খুব নাছোড়-বান্দা ধরনের লোক দেখছি। আমাকে চেনেন না, জানেন না, অথচ খাওয়াবেন?

খাওয়ালেই বা। আপনাকে চিনি না বটে, তবে আলাপ করলেই পরিচিত হয়ে পড়ব।

তা বটে।

অরবিন্দ বুঝতে পারল, মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। সে আর কথা না বাড়িয়ে টিফিন কেরিয়ারের ঢাকনা খুলল। মেয়েটা এগিয়ে এসে খাবার ভাগ করল। খেতে খেতে গল্প চলতে লাগল। কথায় কথায় মেয়েটি অরবিন্দর পেশা ও গন্তব্যস্থল জেনে নিল।

মেয়েটি অবশ্য তার ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরগুলো এড়িয়ে গেল। শুধু অরবিন্দ জানতে পারল, সে দিল্লী যাচ্ছে।

আগ্রা নিকটবর্তী হচ্ছে।

আগ্রা ক্যেন্টনমেন্টে ট্রেন থামতেই নেমে পড়লাম।

হাসি মুখে অরবিন্দ, চলি, মিস মেহরা। যদি বিরক্ত করে থাকি ক্ষমা করবেন।

মেয়েটির নাম সরোজ মেহরা।

সরোজ সহজ ভাবে বলল, দাঁড়ান, আমিও নামব।

আপনি নামবেন কি রকম? আপনার তো দিল্লী যাবার কথা।

মত পাল্টেছি। এখানেই নামব ঠিক করলাম।

আচ্ছা খামখেয়ালী যাহোক। অরবিন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

সরোজ প্লাটফর্মে নেমে আবার বলল, আমার কাছে কিন্তু টিকিট নেই। আমি টিকিটহীন অবস্থায় ট্রাভ্‌ল করছিলাম।

আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

অরবিন্দ সরোজকে নিয়ে ফাস্টক্লাশ ওয়েটিংরুমে এল।

তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

নির্বিকার ভাবে সরোজ বলল, ব্যাপার আবার কি? দিল্লীতে অনির্দিষ্ট ভাবে যাচ্ছিলাম, না হয় আগ্রাতেই নেমে পড়লাম, এতে আর ক্ষতিবৃদ্ধি কি হল বলুন না?

কিন্তু এ তো কোন কাজের কথা নয়। আগ্রাতে আপনার কোন পরিচিত লোক আছে? উঠবেন কোথায়?

আছে। আপনি।

আমি!!

কেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, একথা অস্বীকার করতে চান নাকি?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় অরবিন্দ। কি বলবে ও?

অগত্যা…স্টেশন থেকে বেরুল অরবিন্দ সরোজকে সঙ্গে নিয়ে।

এরপর সরোজ থেকে গেল ওরই কাছে। কথাটা যত সহজে বলা গেল, সমস্ত ব্যাপারটা তত সহজে রূপ নেয়নি কিন্তু। একটি যুবকের সঙ্গে একটি অবিবাহিত তরুণীর একসঙ্গে বসবাস করাটা শুধু যে দৃষ্টিকটু তাই নয়, অস্বস্তিকরও বটে।

শোভন সমাজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে ওরা বাসা বাঁধল।

অরবিন্দ ধরে নিয়েছিল সরোজের মাথায় কিছুটা গোলমাল আছে। নইলে এভাবে কেউ—যাই হোক। সময় কেটে চলল। দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বাড়ল।

একদিন অরবিন্দ বলল, আমরা তো এবার বিয়ে করে ফেলতে পারি।

না।

কেন?

আমাদের দুজনের বিয়ে হতে পারে না বলে, আর কেন!

কিন্তু…

ওর কথা শেষ হবার আগেই সরোজ সেখান থেকে চলে গেছে।

দিন আরো গড়িয়ে গেছে। অরবিন্দ লক্ষ্য করছে ইদানীং সরোজের শরীর তেমন ভাল নেই। কেমন মনমরা হয়ে পড়েছে। সরোজের হাজার আপত্তি সত্ত্বেও ডাক্তারকে ডাকা হল। ওর শরীর পরীক্ষা করে ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করলেন, সাতমাস প্রেগনেন্সি।

অরবিন্দ অনুনয় করে বলল, এবার আমাদের বিয়েটা করে ফেলতেই হবে।

সরোজ গম্ভীরভাবে বললে, কিন্তু তুমি তো আমায় কোন মতেই বিয়ে করতে পার না।

কেন ?

আমি যে বিবাহিতা।

তুমি বিবাহিতা !

হুঁ। রাত হয়েছে, এখন তুমি শুয়ে পড়। কাল সকালে আমি তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে বলব।

সকালে কিন্তু সরোজকে বাড়ির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। চিরদিনের মত ও অরবিন্দর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

নিজের কাহিনী শেষ করলেন অরবিন্দ দত্ত।

বাসব গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, ধন্যবাদ মিস্টার দত্ত, শেষ পর্যন্ত আপনি যে আমার কাছে অকপটে সমস্ত কথা বলেছেন তাতে খুশি হলাম। ভরসা করা যায়, আপনার কাহিনীর মধ্যে থেকে সূত্র সংগ্রহ করে হত্যাকারীকে কাছে পেতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। এখন আমি আসি—ছবিখানা আমার কাছে থাক।

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

নিজের রুক্ষ চুলগুলো পিছনে ঠেলতে ঠেলতে রণদেব তাকাল মালার দিকে।

মালার মুখও শুকিয়ে রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ হল ও এবাড়িতে এসেছে। কয়েকদিন ধরেই আসছে সাংসারিক বিলি-ব্যবস্থা করবার জন্যে। নইলে রণদেব যেভাবে ভেঙে পড়েছে, তাতে হয়ত ওর খাওয়া-দাওয়াই হত না।

মালা মুখ তুলল। মোলায়েম গলায় বলল, কিছু বলছ না যে ?

কি বলব বল ?

এই····

উঁ !

এইভাবে মনমরা হয়ে থাকলে চলবে না ?

তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছ না মালা। আমি নিজেও জানতাম না যে বাবাকে আমি এত ভালবাসি।

মালা খুব কাছে সরে এল ওর। বলল, তুমি না জানলেও আমি জানতাম, তুমি তাঁকে কত ভালবাসতে। আমাদের দুজনেরই একমাত্র অবলম্বন বাবা—আমাদের যে মা নেই।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন সামসের রাই।

মালা সরে এল রণদেবের কাছ থেকে।

মিঃ রাই বললেন, দেব, খুবই ভেঙ্গে পড়ছ তুমি—কিন্তু এখন ওভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। শক্ত হতে হবে।

আপনি হয়ত ঠিকই বলছেন। কিন্তু একটা কথাকে আমি কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছি না—বাবার মত নির্বিরোধ লোককেও কেউ খুন করতে পারে!

এই কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না মিঃ রাই। বাসব ঘরে এল। ও তিনজনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনাদের তিনজনের সঙ্গেই আমার কিছু কিছু কথা আছে।

কেউ কোন উত্তর দিল না।

ও আবার বলল, প্রশ্নগুলো আমি সকলের সামনে করব না—একে, একে। মিস্টার রাই, আপনি আমার সঙ্গে পাশের ঘরে আসুন।

রাইকে নিয়ে বাসব পাশের ঘরে গেল।

মিনিট কয়েক পরে মিঃ রাই পাশের ঘর থেকে ফিরে এলেন।

বাসব এবার আহ্বান করল মালাকে।

মালার সঙ্গে কথা শেষ হলে সব শেষে ডাকল রণদেবকে।

মিনিট পাঁচেকের বেশি কথা বলল না বাসব রণদেবের সঙ্গে—তারপর ফিরে এল এঘরে! বলল, এখন আমি চলি। কয়েক মিনিটের জন্যে আপনাদের বিরক্ত করে গেলাম। ভাল কথা, সন্ধ্যার সময় আপনারা ফ্লোরা কটেজে উপস্থিত থাকবেন।

কিন্তু,—মালা বলল, হত্যাকারী কে—আমরা সে সম্বন্ধে তো এখনও অন্ধকারে রয়েছি মিস্টার ব্যানার্জি।

থাকাটা খুব স্বাভাবিক। হত্যাকারী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিজেকে সকলের চোখের আড়ালে রেখেছে। তবে আমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর বলেই কিনা জানি না, হত্যাকারী আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তিনজনের চোখেই ব্যগ্রদৃষ্টি।

আপনারা ব্যস্ত হবেন না। যথা সময়েই হত্যাকারীর নাম প্রকাশ পাবে।

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

সন্ধ্যা তখন হয়ে গেছে।

ফ্লোরা কটেজের ড্রইংরুমে সকলে বসে আছেন।

নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলছেন। বাসবও আছে।

মিঃ রাই রণদেব ও মালাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। অতুল মুখার্জি বসতে অনুরোধ করলেন তিনজনকে।

ইন্সপেক্টারও এলেন এই সময়।

একটা কোচে বসতে বসতে বললেন, আজ এই সময় আমি আপনাদের একত্রিত হতে কেন বলেছিলাম, নিশ্চয় আপনারা অনুমান করেছেন ?

কাঞ্জিলাল বললেন, আমি কিন্তু ঠিক ··

বুঝতে পারছেন না। বেশ, আমি আপনাদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলার ভার বাসববাবুকে দিচ্ছি। মিস্টার ব্যানার্জি—

বাসব যেন তৈরি হয়েই ছিল। উঠে দাঁড়াল।

সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আমাদের সামনে এখন একটিমাত্র প্রশ্ন রয়েছে, তা হল মিস্টার সান্যালকে কে খুন করেছে। আমি ওই সম্বন্ধেই আপনাদের কিছু বলতে চাই।

কেউ কিছু বললেন না। সকলে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন।

বাসব বলতে আরম্ভ করল, খুন করা আর ঘটি-বাটি চুরি করা এক নয়। একটি খুনের পিছনে থাকে নিটোল পরিকল্পনা, দুর্জয় সাহস ও প্রচুর স্বার্থ। এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুদেব সান্যালকে যে হত্যা করেছে, সে এই তিনটি সূত্রকে অতিক্রম করে যায় নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে সে ? আমাদের প্রথম থেকে খতিয়ে দেখতে হবে পুরো ব্যাপারটাকে। মিস্টার সান্যাল মারা যাবার আগের দিন আমাদের একটা গল্প বলেছিলেন। আজ এখন আমি আপনাদের আরেকটা সত্য ঘটনামূলক গল্প বলব। অবশ্য গল্পটি পুরোপুরি সত্য হলেও আমি তার আকার খাড়া করেছি কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

সকলে নড়েচড়ে বসলেন।

বাসব আরম্ভ করল, যৌবনে মিস্টার সান্যাল যখন মানালিতে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন সত্যিই তিনি একটি মেয়েকে বরফের মধ্যে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, যে পুরুষটি ওইভাবে মেয়েটিকে হত্যা করল তাকেও তিনি চিনে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে তিনি বার বার দেখেছেন, কিন্তু সে যে হত্যাকারী একথা কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি। কেন করেন নি ? এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই কষ্টকর। হত্যাকারীর অবশ্য ধারণা ছিল তার কুকার্য সচক্ষে দেখলেও সান্যাল তাকে চিনতে পারেন নি। যাই হোক, সময় কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সেদিন মিস্টার সান্যাল গল্পচ্ছলে ঘটনাটা বিবৃত করে এমন একটা ইঙ্গিত দিলেন, যাতে পরিষ্কার মনে হল তিনি হত্যাকারীকে চেনেন, এবং যে কোন মুহূর্তে তার নাম প্রকাশ করে দিতে পারেন। বলাই বাহুল্য এবার আপনারা বুঝতে পেরেছেন হত্যার উদ্দেশ্য কি ?

হত্যাকারী নিজের একটা কু-কাজ ঢাকা দিতে গিয়ে আরেকটা কু-কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু সে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মিস্টার সান্যালকে হত্যা করল।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে চেনা-জানা থাকার দরুণ হত্যাকারীর অজানা ছিল না যে তিনি রাত্রে শোবার সময় কেরোসিনের বাতি জেবলে ঘ্মান— হত্যাকারী এই অভ্যাসটাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগাল।

মিস্টার সান্যাল ঘ্মিয়ে পড়বার পর সার্টারি সিস্টেমের জানলার পাল্লা কোনরকমে খ্লে সে ঘরে ঢোকে, তারপর ল্যাম্পের চিমনির ওপর জেলিগনাইট-ভরা একটা দেশলাইয়ের বাক্স রেখে সরে পড়ে। কিছ্ক্ষণের মধ্যেই জেলিগনাইটের বিস্ফোরণ হয়—মারা যান মিঃ সান্যাল। বিস্ফোরণের শব্দ কিন্তু কার্র কানে যায় নি, কারণ ভীষণ ঝড়-ব্ষ্টি হচ্ছিল সেদিন।

এখানে একটা কথা বলা হয়নি, মারা যাওয়ার আগেই মিস্টার সান্যালের সঙ্গে একজনের দেখা হয়েছিল। সে তাঁর কাছে গিয়েছিল সরোজ মেহরার ছবিখানা চেয়ে নিয়ে আসতে। আপনারা নিশ্চয় ভুলে যান নি, বরফের মধ্যে যে মেয়েটিকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে তার নাম সরোজ।

এই লোকটি ও সরোজ দৈবাৎ পরিচিত হয়ে দ্জনে দ্জনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং একই সঙ্গে আগ্রায় থাকে বেশ কিছ্দিন। মেয়েটির মা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে লোকটি তাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু সরোজ রাজি হয় না, কারণ সে নাকি বিবাহিতা। এবং এর পরের দিনই লোকটির কাছ থেকে চিরদিনের মত অদ্শ্য হয় সরোজ। এখন আপনারা ব্ঝতে পারছেন, কেন মিস্টার সান্যাল খ্ন হয়েছেন? কিন্তু আবার সেই প্রশ্নটাই সমস্ত কিছ্কে ছাপিয়ে মনের মধ্যে চেপে বসছে—হত্যাকারী কে?

মিঃ রায় বললেন, তোমার বোধহয় অজানা নেই হত্যাকারী কে?

আপনার তাই মনে হয় নাকি?

অতুল ম্খার্জি বললেন, বাসব, তুমি কেন ব্ঝতে পারছ না, আমরা ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি। তোমার যদি সত্যি জানা থাকে কে সেই হত্যাকারী, তাহলে তার নাম বলে আমাদের উৎকণ্ঠা দ্র কর।

বাসব আরেকবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, সকলে একটু ধৈর্য ধর্ন। হত্যাকারীর নাম প্রকাশিত হবার আগে আমি আপনাদের একটা ছবি দেখাতে চাই।

ছবি দেখাবেন?—আকাশ থেকে পড়লেন সামসের রাই।

হ্যাঁ। আপনারা শ্ধ্ ছবির মধ্যেকার মান্ষটিকে চেনেন কিনা আমাকে জানান।

বাসব পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বার করে আবার বলল, মিস্টার রায়, দেখ্ন তো এ'কে চেনেন কিনা?

মিঃ রায় এগিয়ে এসে ছবিখানা দেখলেন। বললেন, না।

মিস্টার কাঞ্জিলাল, আপনি?

কাঞ্জিলাল ছবিখানা দেখলেন,—না।

মিস্টার রাই, দেখুন তো ?

সামসের রাই ছবিখানা দেখে বললেন, আজ সকালেই তো আপনি আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে ছবিখানা দেখিয়েছিলেন। তখনই তো বললাম এঁকে চিনি না।

ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ। মামা, তুমি ?

অতুল মুখার্জি ছবিখানা দেখলেন। —না।

মিস্টার সুদ ?

না।

অরবিন্দবাবু, দেখুন তো চেনেন কিনা ?

অরবিন্দ দত্ত ভীতভাবে দেখলেন ছবিখানা। কাঁপা গলায় বললেন চিনি। সরোজ মেহরার ছবি।

মালাদেবী, আপনি সরোজ মেহরা বলে কাউকে চেনেন ?

মালা বিস্মিতভাবে বলল, কই না।

এই ছবিটা দেখুন তো—এই মহিলাটিকে চেনেন কিনা ?

মালা এক নজরে ছবিখানার দিকে তাকিয়েই বলল, চিনি। আমার মা'র ছবি। এছবি তো আপনি আজ সকালেই আমাকে একলা ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি আমার মা'র ছবি পেলেন কোথা থেকে ?

সে-কথায় উত্তর না দিয়ে বাসব বলল, আপনার মা'কে আপনি দেখেছেন ?

না। আমি যখন মাত্র কয়েকদিনের, তখন আমার মা মারা যান। আমি শুধু তাঁর ছবি দেখেছি।

বাসব ইন্সপেক্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, এরকম অদ্ভুত ব্যাপার আপনি কোথাও দেখেছেন ইন্সপেক্টার ? মিস্টার রাই নিজের স্ত্রীর ছবি দেখে চিনতে পারলেন না, অথচ মালাদেবী নিজের মাকে চিনতে ভুল করছে না ! —বিচিত্র নয় ?

ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে বটে—ইন্সপেক্টার বললেন, মিস্টার রাই, আপনি এসম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবেন ?

সামসের রাই-এর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। তিনি তীব্র গলায় বললেন, কি সমস্ত গোলমেলে কথা বলছেন আপনারা। মালা তার মাকে কোনদিন দেখেনি, তার ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

ভুল যে হয়নি তার প্রমাণ,—বাসব বলল, মালাদেবীকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোটা কয়েক প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, আপনি তাঁকে বহুবার সরোজ মেহরার ছবি দেখিয়ে তাঁর মা বলে পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ ছবিখানা যে আপনি তুলেছেন তার স্বীকৃতি স্বরূপ ছবির পিছন দিকে আপনার নাম সই করা রয়েছে। অস্পষ্ট হলেও আমি পড়তে পেরেছি। কাজেই আপনার এখন নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না মিস্টার রাই, আমি

যে শুধু আপনার স্ত্রী হত্যার কথা ও হাসপাতাল থেকে মেয়ে চুরির কথাই জানি তাই নয়, এই কথাগুলোর সঙ্গে যদি আপনার নাম প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই মিঃ সান্যালকে আপনি কিভাবে হত্যা করেছেন, তাও আমার জানা।

কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না মিঃ রাই। তিনি মাথা নত করলেন।

মালা আর্তচিৎকার করে উঠল, বাবা, তুমি···তুমি···

ইন্সপেক্টার এগিয়ে গেলেন সামসের রাই-এর দিকে।

বাসব নিজের কাহিনী শেষ করল।

শৈবাল বলল, খুব কিছু ইণ্টারেস্টিং কেস নয়। সাদা-মাটা একটা রহস্য বলা যায়।

ওই কেসটাই যে তখন আমি সল্‌ভ করতে পেরেছিলাম, এই তো আমার ক্রেডিট ডাক্তার। এরপর থেকেই অবশ্য আমার ডাক্তারি পড়া মাথায় উঠল—আমি রহস্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

একটা কথা,—সোমা বলল, আপনি সামসের রাইয়ের বিরুদ্ধে জোরাল কোন প্রমাণ তো সংগ্রহ করতে পারেননি?

না, তা পারিনি। তবে তাতে অসুবিধা হয়নি, কারণ মিঃ রাই থানায় গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সরোজের নাকি চরিত্র ভাল ছিল না। নিজের বিবাহিত পরিচয়কে লুকিয়ে, মেহরা উপাধির আড়ালে সে বহুজনকে এক্সপ্লয়েট করে বেড়িয়েছে। প্রথমে এসমস্ত কথা জানতেন না মিঃ রাই। একদিন তিনি সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন। হঠাৎ সরোজ বেশ কয়েক মাসের জন্যে অদৃশ্য হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে—ফিরে এল যখন, তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। রাগ সামলাতে পারলেন না তিনি। হাসপাতালে মেয়ের জন্ম হওয়ার পরই সরোজকে তিনি খুন করলেন। তারপরের ঘটনা তোমরা শুনেছ।

শৈবাল বলল, মালা তাহলে অরবিন্দ দত্তর মেয়ে ছিল?

হয়ত।

সোমা বলল, এক হিসেবে মিঃ রাই মহান বলতে হবে। মালার পরিচয় জানা সত্ত্বেও তিনি তাকে মেয়ের মত মানুষ করেছিলেন।

ওখানেই মনস্তত্ত্বের খেলা।—বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, গলা শুকিয়ে উঠেছে, ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাল তো ডাক্তার।

দুন এক্সপ্রেসের গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে আসছে।

সামনে বোধহয় কোন স্টেশন।

ঝিকিমিকি জোনাকি

সন্ধ্যা নামছে।

লয়ালপুর উপত্যকার ওপর ধীরে ধীরে নামছে পিঙ্গল সন্ধ্যা।

বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের যে অংশ লয়ালপুরকে প্রায় ঘিরে রেখেছে, তারই আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হয়েছে অনেক আগে। আর কিছুক্ষণ পরেই রাত্রি নামবে—শীতের দীর্ঘ নিটোল রাত্রি। বিহার যেখানে শেষ হয়ে উত্তরপ্রদেশকে ছুঁয়েছে, সেই সংযোগস্থলেই লয়ালপুর। পাহাড়ে ঘেরা মনোরম দৃশ্যাবলী-সম্বলিত এই উপত্যকাটি, একটি আকর্ষণীয় স্বাস্থ্যকর স্থান হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন।

আগে মাথাগুনতি কয়েকটি পরিবার মাত্র এখানে বাস করত। এখন জনবসতি ক্রমেই ঘন হচ্ছে।

স্কুল ছিলই। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুর্গের এক অর্থবান ভদ্রলোক সম্প্রতি চমৎকার একটি হোটেলের পত্তন করেছেন। আধুনিক সুখ-সুবিধা সমস্তই এই হোটেলে অভ্যাগতরা পেয়ে থাকেন। শীতের মরশুমে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর লোক এখানে আসে বেড়াতে।

লয়ালপুরে আর আছে একটি প্লাইউড ফ্যাক্টরি।

চৌধুরী বিজনেস কন্সার্ন-পরিচালিত এই কারখানাটিতে প্রায় হাজার দেড়েক লোক কাজ করে। এই উপত্যকার একমাত্র যন্ত্রশিল্প।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি গণ্ডগ্রাম থেকে বিপর্যস্ত ভাগ্যের মোড় ঘোরাবার জন্য সদাকান্ত চৌধুরী বেরিয়ে পড়েন অজানা পথে।

তারপর—

তারপর কিভাবে সুদূর বাংলাদেশ থেকে তিনি এই উপত্যকায় এসে পড়েছিলেন, তার ইতিহাস আজ অতীত গর্ভে তলিয়ে গেছে, তবে সদাকান্ত যে তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে পরবর্তী চৌধুরীদেরও নানা ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে এবং আজকেই এই বিরাট প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে তার চরম বিকাশ ঘটেছে বলা চলে।

সন্ধ্যা এখনও হয়নি।

পাহাড়ের ঢালু এক অংশের ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে আসছেন চৌধুরী প্লাইউডের সিনিয়র পার্টনার পুরন্দর চৌধুরী।

পরনে তাঁর খাকি ব্রীচেস।

হাতে ডবল ব্যারেল শর্টগান। কার্টিজের মালাটা ঝুলছে গলাতে।

বয়স চুয়াল্লিশ-প'য়তাল্লিশের মধ্যেই। অপূর্ব সুঠাম চেহারা।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যেন গ্রীক ভাস্কর্যের অপরূপ অ্যাপেলো।

অবশ্য পুরন্দর চৌধুরী উৎরাইয়ের পথটা একাই পার হচ্ছেন না। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মৃগাঙ্ক পালিত।

ফ্যাক্টরির ইনিই প্রধান ইঞ্জিনিয়ার।

যদিও এখন তাঁদের সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের, তবু বন্ধুত্বটা অটুট আছে ঠিক আগেকার মতই। যেমন ছিল বেনারসের ছাত্রজীবনে।

দুই বন্ধুতে ক্রমে সমতল জমিনে নেমে এলেন।

হাঁপাচ্ছিলেন দুজনেই। এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তাঁদের কপালে।

পুরন্দর চৌধুরী পকেট থেকে রুমাল বার করে, কপালটা ভাল করে মুছে নিলেন। বললেন, সারাটা দুপুর পণ্ডশ্রম হল। একটা কিছু চোখে পড়ল না, আশ্চর্য!

হাসলেন মৃগাঙ্ক পালিত।

বললেন পাখি-শিকার করা তো আর তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তোমার দৃষ্টি ছিল বিগ গেমের ওপর। কিন্তু এই সময় বিগ গেমের সন্ধান পাওয়া কি সহজ কথা!

—বিগ গেমের কথা বাদ দাও মৃগাঙ্ক। অন্ততঃ একটা বুনো শুয়োরও তো আমাদের চোখে পড়তে পারত।

—এক একদিন এই রকম ব্যাড লাক যায়।

—কিন্তু খালি হাতে জঙ্গল থেকে শিকারীদের ফিরে যাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

সমতল ভূমি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একটা অ্যাসফাল্টে-মোড়া পথ শহরের কেন্দ্রস্থলকে পেছনে ফেলে, সম্পূর্ণ লয়ালপুর উপত্যকা পার হয়ে— দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মোগলসরাইয়ের কাছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে।

কেন্দ্রীয় পি-ডাবু-ডি পথটির নামকরণ করেছেন বিন্ধ্যাচল হাইওয়ে।

বিন্ধ্যাচল হাইওয়ের ওপর দিয়েই পুরন্দর চৌধুরী ও মৃগাঙ্ক পালিত এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

এক সময় প্রসঙ্গ পাল্টে পুরন্দর বললেন, চল, হাণ্টিং হাউসে যাওয়া যাক।

—কেন?

—আজকের রাতটা ওখানেই দুজনে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? আরপিংটনের কারি দিয়ে চমৎকারভাবে রাতের খাওয়াটা শেষ করা যাবে।

মৃগাঙ্ক বললেন, আরপিংটন হল মুরগীদের রাজা। কিন্তু তবু আমি

তোমার এই লোভনীয় আমন্ত্রণটা গ্রহণ করতে পাচ্ছি না।

শিকারের ওপর আগ্রহ চৌধুরীদের বংশগত।

এমন কি পুরন্দর চৌধুরীর পিতামহ কন্দর্প চৌধুরী বাঘের হাতেই মারা পড়েছিলেন।

তাঁর মত সাহসী শিকারী বড়-একটা দেখা যায় না। তিনি যে এইরকম মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা স্বপ্নের অতীত ছিল এ তল্লাটের সকলের। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বুঝি একেই বলে।

শিকারের সুবিধার জন্যই কন্দর্প চৌধুরীই পাহাড়ের কাছাকাছি বহতা ঝরণার ধারে হাণ্টিং হাউসটি নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। বাড়িটা বেশিদিন ব্যবহার করে যেতে পারেনি, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুই অবশ্য এর প্রধান কারণ। এরপর বেশ কিছুদিন বন্ধই ছিল বাড়িটা। এখন চুটিয়ে ব্যবহার করছেন পুরন্দর চৌধুরী।

পুরন্দর ভ্রূ কঁচকে বললেন, কাল ছুটির দিন, ফ্যাক্টরির তাড়া নেই। তুমি আজ সহজেই রাতটা আমার সঙ্গে কাটাতে পার।

—ভুলে গেলে নাকি কাল দিল্লী থেকে একজন রুমানিয়ান এক্সপার্টের আসবার কথা আছে? ভোরে ফ্যাক্টরিতে পেঁছাতে না পারলে বিশেষ অসুবিধা হবে। তাই—

—মনে পড়েছে বটে। কালই

পুরন্দরের কথা শেষ হল না—দেখা গেল সাইকেল করে একজন তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসেই সে সাইকেল থেকে নামল।

পুরন্দর চৌধুরী বিস্মিত গলায় বললেন, অনিরুদ্ধ, তুমি—?

অনিরুদ্ধ পকেট থেকে একটা খাম বার করে বলল, এই এক্সপ্রেস লেটারটা কিছুক্ষণ আগে এসেছে স্যার। আপনি রাত্রে যদি হাণ্টিং হাউসে থেকে যান, তাই দিতে এলাম।

স্মার্ট, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা অনিরুদ্ধের।

বয়স বছর আটাশ হবে।

বছর দুয়েক ধরে পুরন্দর চৌধুরীর সেক্রেটারির কাজ করে আসছে। সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে সকলেই ওর প্রশংসা করে।

ওর হাত থেকে খামখানা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন পুরন্দর চৌধুরী।

তারপর খামের মুখ ছিঁড়ে বার করলেন চিঠিটা। পাতলা কাগজের ওপর কয়েকটি সুছাঁদ অক্ষর মাত্র।

কে লিখেছে—?

দৃষ্টিটা নিচের দিকে নামালেন পুরন্দর—যেখানে পত্রলেখকের নাম লেখা রয়েছে।

একি!

সুজাতা—সুজাতা তাঁকে চিঠি লিখেছে !!
এতদিন পরে !!!

—পার্নিসাস অ্যানিমিয়া।

ডাঃ সেন কাঁপা গলায় কথাটা আবার উচ্চারণ করলেন।

—ভেতরে ভেতরে যে এমন কঠিন রক্তশূন্যতায় ভুগছেন, তাতো আগে বুঝতে পারা যায়নি। বারান্দার রেলিংটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুজাতা।

বললেন ধরা গলায়, ওঁকে কি বাঁচান যাবে ডাঃ রায় ?

—রোগটা যখন ধরা পড়েছে তখন হয়ত সারিয়ে তোলা যেতে পারে। তবে—

—তবে কি বলুন ?

—শুধু ওষুধপত্রে কাজ হবে না। ওঁকে এখন কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয় এতে তাঁর স্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা—।

—চেঞ্জে ?

—হ্যাঁ। কলকাতা থেকে তাঁকে কিছুদিন বাইরে রাখতে হবে। এখন আমি আসি মিসেস রায়।

ডাঃ রায় বিদায় নিলেন।

সুজাতা ঘরের মধ্যে গেলেন।

আদিত্য রায় শুয়ে আছেন খাটের ওপর। জীর্ণ চেহারা।

উর্ণা একপাশে দাঁড়িয়ে।

স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেখে আদিত্য রায় বললেন, ডাক্তার কি বললে, আমাকে আর বাঁচান যাবে না ?

—কেন যাবে না ? উনি বললেন, তুমি ভাল হয়ে যাবে। শুধু—

—শুধু কি ?

—শুধু তোমাকে কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই—

—তাহলেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাব ?—আদিত্য রায় হাল্কা গলায় বললেন, মিথ্যে তুমি ব্যস্ত হচ্ছ, এখন আমি মরব না। তবে চেঞ্জে নিয়ে যেতে চাও—চল।

সুজাতা একথার উত্তরে কিছু বললেন না।

আদিত্য আবার বললেন, কোথায় চেঞ্জে যাবে ?

—ভাবছি সেই কথাই।

—লয়ালপুরে গেলে কেমন হয় ?

লয়ালপুর ! সুজাতার বুকের ভেতরটা যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—মন্দ কি। অচেনা বিদেশে যাওয়ার চেয়ে তোমার পরিচিত লয়ালপুরে যাওয়াই কি আমাদের পক্ষে ভাল হবে না?

উর্ণা এতক্ষণে কথা বলল, ওখানেই চল মা।

সুজাতা কিছু না বলে মনে মনে কি যেন চিন্তা করলেন।

তারপর টেবিলের ওপর থেকে প্যাড ও কলমটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

অত্যন্ত দ্রুত চোখে পুরো চিঠিটার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেন পুরন্দর চৌধুরী।

সুজাতা আসছে।

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে চেঞ্জে আসছে এখানে। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও লেখেনি সুজাতা।

অন্যমনস্কভাবে চিঠি থেকে মুখ তুলে পুরন্দর বললেন, অনিরুদ্ধ·

—স্যার।

—কাল ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে কয়েকজন অতিথি আসছেন। তুমি বড় গাড়িটা নিয়ে স্টেশনে চলে যাবে।

অনিরুদ্ধ মাথা হেলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল।

—ভাল কথা, ট্রেনটা কটায় মোগলসরাইয়ে ইন্ করবে যেন?

—রাত্রি নটার পর।

—অত্যন্ত আনটাইম্। তাহলে ওই কথাই রইল। তুমি এখন ফিরে যেতে পার অনিরুদ্ধ। মৃগাঙ্ক, তুমিও কোয়ার্টারে যাও। আমি আজ হান্টিং হাউসেই থাকব ভাবছি।

অনিরুদ্ধ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আপনার ওখানে একলা থাকাটা কি ঠিক হবে স্যার?

জোরে হেসে উঠলেন পুরন্দর।

বললেন, তোমার মনেও এই সমস্ত কুসংস্কার আছে অনিরুদ্ধ?

মৃগাঙ্ক বললেন, নিজের মনের মধ্যে কুসংস্কারকে অবশ্য আমিও প্রশ্রয় দিই না। তবে তোমার হান্টিং হাউসের যে সমস্ত উপদ্রবের গল্প আমি শুনেছি, তাও আবার সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—দাদুর মৃত্যু অপঘাতেই হয়েছিল বলা চলে—পুরন্দর বললেন, তাই ওই বাড়িটা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেরা একটা উদ্ভট গল্প সৃষ্টি করেছে মাত্র। কই, আমি তো কখনও কোন ভৌতিক উপদ্রব লক্ষ্য করিনি। তাছাড়া আমি তো ওখানে একলা থাকছি না। বাহাদুর রয়েছে।

মৃগাঙ্ক আর কিছু বললেন না।

অনিরুদ্ধও নীরব রইল।

মন্থর পায়ে হান্টিং হাউসের দিকে এগিয়ে চললেন পুরন্দর চৌধুরী।

সতের বছর পরে। হ্যাঁ, ঠিক সতের বছর পরেই সুজাতা তাঁকে চিঠি দিয়েছে। চিঠির প্রতিটি ছত্রে ফুটে রয়েছে রূঢ় বাস্তবতা। কোথাও নেই এতটুকু ভাবাবেগ।

অভিমান···

কিন্তু···তার লেখা একটি চিঠির কয়েক ছত্রে সতের বছর আগেই কি তিনি অনুমান করে নেননি—সুজাতার সঙ্গে আন্তরিকতার সম্পর্ক তাঁর শেষ হল।

সে আজকের কথা নয়।

পুরন্দর চৌধুরীর তখন ছাব্বিশ বছরের উদ্ধত যৌবন।

সময় তখন তাঁর ভাল যাচ্ছিল না। কঠিন মানসিক অশান্তিতে দিন কাটছিল। তবু অনিচ্ছার সঙ্গে বাবার আদেশে এলাহাবাদে গিয়েছিলেন ব্যবসায়ের কাজে।

ফিরে এসেই চিঠিখানা পেলেন।

সুজাতা লিখেছে—নিষ্ঠুর কাপুরুষ আমার জীবনটাকে নিয়ে ছেলে-খেলা করবার কি অধিকার ছিল তোমার? পৌরুষের গর্ব কর! অথচ একটি মেয়ের ভার নেবার ভয়ে পালিয়ে মুখ লুকোতে লজ্জা করে না তোমার? আগেই আমার অনুমান করে নেওয়া উচিত ছিল, তোমার মত লোক ভাল কাউকে বাসতে পারে না। আমার মত বোকা মেয়েদের নাচিয়ে বেড়ানই হল তোমার জীবনের ব্রত

তাই কি তিনি আজও অবিবাহিত? সুজাতা তাঁকে ভুল বুঝে গেল।

ভাবতে ভাবতে হান্টিং হাউসের সামনে এসে উপস্থিত হলেন পুরন্দর চৌধুরী।

গেট পার হতেই তেজবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর প্রিয় ভৃত্য তেজবাহাদুরকে তিনি বললেন, বাহাদুর, আমার খাবার কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। শরীর বিশেষ ভাল নেই। রাত্রে কিছু খাব না।

—কফি এখন দেব, সাহাব?

—কফি? তা বরং দিতে পার।

কথাটা শেষ করেই তিনি দোতলায় উঠে গেলেন।

হান্টিং হাউস বলতে যে ধরনের বাড়ি চোখের ওপর ভেসে ওঠে, এই বাড়িখানা কিন্তু সে ধরনের নয়। বড় পরিবারের বাসোপযোগি, ড্রইংরুম—ডাইনিং হলবিশিষ্ট এই বাড়িখানা। কন্দর্প চৌধুরীর বোধহয় ইচ্ছে ছিল, সপরিবারে এই বাড়িতে মাঝে মাঝে কাটিয়ে যাবেন। তাই হান্টিং হাউসের আকার এত বিরাট।

বাড়ির সামনে ফুলবাগান ও সুন্দর ঘাসে-মোড়া লন।

পেছন দিকে বড় বড় গাছের সমারোহ! বাওবাব আর দেবদারুর দল ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানের চারপাশে উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল।

নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন পুরন্দর।

মনের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব চলেছে। পুরনো দিনের কত ঘটনা স্মৃতিকন্দরকে মথিত করে চোখের ওপর ভেসে উঠছে। সুজাতার চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই কেন কে জানে বারবার পুরন্দর চৌধুরী হারিয়ে যাচ্ছেন অতীতে।

তখন তিনি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন।

গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে সুজাতার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হল।

কি একটা প্রয়োজনে হরিশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁদের ব্যবসার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন।

পুরন্দর গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন।

দরজা খুলে দিল একটি তরুণী। অপূর্ব লাবণ্যময়ী।

হালকা গলায় প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

—হরিশঙ্করবাবু আছেন?

—আছেন। ডেকে দিচ্ছি।

তরুণীটি অদৃশ্য হল।

পুরন্দর চিন্তিত হলেন। হরিশঙ্করবাবুর পরিবারের সকলকে তিনি চেনেন অথচ এই মেয়েটি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

হরিশঙ্কর এলেন। সমাদরে পুরন্দরকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

যা বলতে এসেছিলেন তা বলার পর, নিজের আগ্রহ কোনমতেই দমন করতে না পেরে পুরন্দর বললেন, আপনার এখানে একজন অপরিচিতা মেয়েকে দেখলাম।

—আমার ভাগ্নী সুজাতা। বড় অভাগা মেয়ে। কলকাতা থেকে ওকে নিয়ে এলাম।

—আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

—ওর জন্ম হওয়ার পরই আমার বোন মারা যায়। দশ বছর বয়েস যখন ওর তখন আমার ভগ্নীপতি মারা যান। কাকার সংসারে অশেষ কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। তাই আমি কলকাতা গিয়ে ওকে নিয়ে এলাম। এবার থেকে আমার কাছেই থাকবে।

এরপর পুরো ছুটিটায় বেশ ঘনঘনই পুরন্দর হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি যাতায়াত করলেন। আসলে প্রথম দর্শনেই এই লাবণ্যময়ী মেয়েটি পুরন্দরের তরুণ মনে আলোড়ন তুলেছিল।

একদিন সুজাতার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল তাঁর। তারপর—

তারপরের কয়েক বছরের ইতিহাস পড়ার অন্তরঙ্গতার নিটোল কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বলতে গেলে এই কারণেই বি-এ পাস আর তাঁর পক্ষে করা সম্ভব

হল না।

সেবার শীতের এক মধ্যাহ্নে সকলের চোখ এড়িয়ে সুজাতা ও পুরন্দর নিভৃত আলাপে ব্যস্ত ছিলেন।

সুজাতা বললেন, মানুষ ফেল করে নাকি? আরেকবার বি-এ পরীক্ষাটা দাওনা।

—উঁহু। বি-এ পাস করার চেয়ে বিয়ে করাটা অনেক বেশি লাভজনক।

—বিয়ে করবে?

—হুঁ।

—আমাকে বোধহয়?

—অগত্যা। আর যখন কেউ নেই তখন তোমাকেই বিয়ে করতে হবে।

—ঠাট্টার কথা নয়। আমার কিন্তু খুব ভয় করে।

—ভয়! —বিস্মিত গলায় পুরন্দর বললেন, কিসের ভয়?

তোমরা বিত্তশালী, উঁচু সমাজের লোক,—তোমার সঙ্গে আমার মিলন তোমার বাবা কখনই সমর্থন করবেন না।

—শোন সুজাতা, সমাজ মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই সমাজকে সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। বাবা নিশ্চয়ই আমাদের বিয়েতে মত দেবেন।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম।

সুজাতা আর পুরন্দরের মেলামেশার কথাটা আর চাপা রইল না। ক্রমে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একান সেকানের পর সূর্যকান্তর কানে গিয়ে পৌঁছাল কথাটা একদিন। পুত্রের এই চাপল্যে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সূর্যকান্ত।

আলবোলার রূপার তার জড়ান নলটা একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর ছেলের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

পুরন্দর তখন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। অভাবনীয়ভাবে বাবাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

সূর্যকান্ত কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, হরিশঙ্করের ভাগ্নীকে তুমি চেন?

অজানা একটা ভয়ে বুকের মধ্যেটা দুরু দুরু করে উঠল পুরন্দরের। কোনরকমে কাঁপা গলায় বললেন, হ্যাঁ।

—শুধু চেনই—না অন্তরঙ্গতাও আছে তার সঙ্গে?

—মানে····

তাকে বিয়ে করতে চাও? সমস্তই শুনেছি আমি। আমার ছেলে হয়ে যে তুমি এতটা নিচে নেমে যাবে ভাবতে পারিনি।

—আমি এমন কিছু করিনি যার জন্যে·

—আমার কথার প্রতিবাদ করবার সাহসও তোমার আছে দেখছি। —ভারি গলায় সূর্যকান্ত বললেন, কর্মচারির ভাগ্নী আমার পুত্রবধূ হতে পারে না। আমার পুত্রবধূ হতে গেলে চাই বংশমর্যাদা, চাই অর্থের কৌলিন্য।

রাগে, দুঃখে বিদ্রোহ করতে চাইল পুরন্দরের মন।

কিন্তু বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সূর্যকান্তর সামনে মুখ খোলার সাহস তার কোথায়।

পরের দিনই ব্যবসার কাজে পুরন্দরকে এলাহাবাদ পাঠালেন সূর্যকান্ত।

তারপর ডেকে পাঠালেন হরিশঙ্করকে।

হরিশঙ্করের কানেও গিয়েছিল কথাটা। তিনি ভীতচিত্তে এসে দাঁড়ালেন।

—এ সমস্ত কি শুনছি ভটচাজ্জি?—সূর্যকান্ত গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

—আমিও শুনে অবধি বিশেষ ভাবিত আছি বড়বাবু।

—হুঁ। তুমিই বা কি করে বুঝবে যে ভাগ্নীকে আশ্রয় দিয়েছ, সেই তোমাকে একদিন বিপন্ন করে তুলবে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এবারের মত ঘটনাটাকে আমি ক্ষমার চোখেই দেখলাম। কিন্তু দশ দিনের মধ্যে তোমার ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে।

—বিয়ে।

—হ্যাঁ। যা খরচ পড়বে আমিই দেব।

অসহায় গলায় হরিশঙ্কর বললেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পাত্র পাব কোথায়?

—সে ব্যবস্থাও আমি করে দিচ্ছি। আমাদের কলকাতা অফিসের সেলস ম্যানেজার আদিত্য রায়—ছেলেটি ভাল। তিন কূলে তার কেউ নেই। আমি আজই তাকে চিঠি দিয়ে দেব। সে আমার কথা ঠেলতে পারবে না। তুমি দিন চারেক পরে তোমার ভাগ্নীকে নিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন যেতে পার।

কিছু না বলে হরিশঙ্কর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পুরন্দর যখন এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন, বিয়ে তখন হয়ে গেছে।

—সাহাব, কফি—

চমকে মুখ তুললেন পুরন্দর।

বাহাদুর তাঁর জন্যে কফি নিয়ে এসেছে।

অনিরুদ্ধ সোজা ফিরে এল চৌধুরী লজে।

মৃগাঙ্ক নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেলেন।

অনিরুদ্ধ পোর্টিকো পার হয়ে সবে পার্লারে পা দিয়েছে, অম্বুজনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

চৌধুরী লজে কে কে আছেন, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে রাখলে বোধহয় অন্যায় হবে না। পুরন্দর চৌধুরী ছাড়া তাঁর ছোটকাকা চন্দ্রকান্ত ও জাঠতুতো ভাই অম্বুজনাথ আছেন এই বাড়িতে। আর আছে জবা ও শেখর, অম্বুজনাথের ছেলেমেয়ে। সৌরভও অবশ্য আছে। সে চন্দ্রকান্তর শালার ছেলে।

আজ কয়েক বছর ধরে অম্বুজনাথ নিউরাইটিসে ভুগছেন।

দ্রুত চলতে গেলেই টলে পড়েন। তবে গলার স্বর এখনও তেমন জড়িয়ে যায়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পুরন্দর কোথায় ?

—হান্টিং হাউসে।

—অর্থাৎ রাত্রে আর ফিরবে না ?

—আজ ওখানেই থাকবেন।

—মদ খেয়ে খেয়েই নিজের জীবন শেষ করবে।

—তিনি আজকাল ড্রিঙ্ক করেন না।

—করেন না। ঠোঁট বাঁকালেন অম্বুজনাথ।—একবার ধরলে ও জিনিস ছাড়া যায় না। যাক, এখন আমার শ' তিনেক টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

কুণ্ঠিত গলায় অনিরুদ্ধ বলল, এখন ? কাল এক সময় বরং—

—সেই বাঁধা বুলি। আমি ভিক্ষে চাইছি না অনিরুদ্ধ, নিজের পাওনা দাবি করছি মাত্র।

—দেখুন, আমি মাইনে-করা কর্মচারি। আমার কতটুকু স্বাধীনতা—

—তোমাকে কিছু আমি বলছি না তো। তোমার মালিক পুরন্দর চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করেই বলছি। আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। কারখানায় যেতে পারছি না। পারিবারিক প্রথানুসারে মোটা মাসোহারা আমার প্রাপ্য। কিন্তু তাও সময়মত হাতে পাই না! আশ্চর্য—

কথাগুলো বলতে বলতে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

অনিরুদ্ধ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সেও নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

পরের দিন।

দুপুরবেলা খাওয়ার টেবিলে একত্রিত হয়েছেন সকলে।

কারখানায় লাঞ্চ না করে, ঠিক একটার সময় সকলে বাড়ি চলে আসেন খাওয়ার জন্যে। খাওয়া-দাওয়া সেরে কারখানায় ফিরে যান দুটোর কিছু আগে।

লম্বা ডাইনিং টেবিলটার দু'পাশে ভাগাভাগি করে বসেছেন পুরন্দর চৌধুরী, চন্দ্রকান্ত, অম্বুজনাথ, শেখর, সৌরভ ও জবা।

জবা বেনারসের অ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজে আই-এ পড়ছিল। হঠাৎ অসুস্থ

হয়ে পড়ায় সাময়িকভাবে পড়াশুনো বন্ধ রেখেছে। আবার সামনের বছর থেকে ক্লাশে যোগ দেবে।

সকলে নীরবেই আহারে মনোযোগি ছিলেন।

এক সময় নিজের গলাটা ঝেড়ে নিয়ে পুরন্দর বললেন, আজ রাত্রে ট্রেনে কয়েকজন অতিথি আসবার কথা আছে।

—অতিথি ?—চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করলেন, কোথা থেকে ?

সুজাতার আগমন-সংবাদটা সকলকে জানিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন পুরন্দর। তাই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন।

—কলকাতা থেকে। আদিত্য সস্ত্রীক আসছে হাওয়া বদল করতে।

সকলে মুখ-চাওয়াচায়ি করলেন।

আদিত্যর স্ত্রী সুজাতা। আর সুজাতা ও পুরন্দরকে জড়িয়ে যে ব্যাপারটা বেশ কয়েক বছর আগে এই বাড়িতে ঘটে গেছে, তাতো কারুরই অজানা নয়।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন, হাওয়া বদল করতে! হঠাৎ—?

—আদিত্য খুব অসুস্থ।

—কিন্তু—গম্ভীর গলায় অম্বুজনাথ বললেন, সুজাতার আবার এই বাড়িতে আসা কি ঠিক হবে ?

—ঠিক না হওয়ার কারণটা তুমি নিশ্চয়ই বলবে ?

—আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি পুরন্দর, তুমিই আমাকে উল্টে প্রশ্ন করছ! এ বাড়িতে সুজাতা আবার কোনদিন পা দিক, এতে ঘোর আপত্তি ছিল সেজকাকার। অথচ—

পুরন্দর বললেন, একটা জিদকে অহেতুক প্রশ্রয় দেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। একজন বিপদে পড়েছে, তাকে সাহায্য করতে পারি অথচ করব না, এটা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়।

—বিপদে পড়লে মানুষ মানুষকে সাহায্য করেই। তবে সেই সাহায্য ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করে বর্ষিত হলে সন্দেহের উদ্রেক হয় বইকি।

—অর্থাৎ—?

চিবিয়ে চিবিয়ে অম্বুজনাথ বললেন, কারুর প্রতি করুণা করতে তো তোমায় আজ অবধি দেখলাম না।—হঠাৎ—সুজাতা বলেই কি

—অম্বুজদা—পুরন্দর গম্ভীর গলায় বললেন, কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারকে খাওয়ার টেবিলের আলোচনায় টেনে না-আনাই বোধহয় ভাল হবে। আর এ বিষয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। ওরা আসছে—আমি ভরসা করি তোমরা সকলেই ওদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। পুরন্দর ন্যাপকিনে মুখ মুছে টেবিলের পাশ থেকে উঠে পড়লেন।

যথাসময়ে স্টেশনে ট্রেন ইন্ করল।

সুজাতা ও আদিত্য রায় কামরা থেকে নেমে এলেন।

ঊর্ণাও।

সঙ্গে লাগেজ বেশি ছিল না। দুটো বড় বড় সুটকেশ আর একটা বেডিং।

কুলিরা সেগুলো নামিয়ে আনল প্ল্যাটফর্মে।

ট্রেনে তাঁদের কষ্ট হয়নি। এয়ারকণ্ডিশাণ্ড কামরায় আদিত্য রায় বেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিলেন! বলতে গেলে এখন তাঁকে চটপটেই দেখাচ্ছে।

নিওন আলোর প্রাচুর্যে দিনের আলোর মতই শুভ্র হয়ে উঠেছে মোগলসরাই স্টেশনের চতুর্দিক। অনেকেই বেনারসে যাওয়ার উদ্দেশে, গাড়িবদল করার জন্যে ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেস থেকে নেমেছেন এখানে।

কিন্তু কোথাও হৈ-হল্লা বা ব্যস্ততা নেই। প্রচণ্ড শীতে সমস্তই যেন ঝিমিয়ে রয়েছে।

ঊর্ণা কলকাতার বাইরে খুব কমই গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের এই দুর্জয় শীত অনুভব করবার অবকাশ তার হয়নি। তাই এখন হাড়ের মধ্যেও একটা কনকনানি তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

সুজাতা এধার-ওধার তাকাচ্ছেন।

স্টেশনে কেউ তাঁদের রিসিভ করতে আসবে ঃ এ বিষয়ে নিশ্চিত তিনি।

—আপনারা লয়ালপুর যাবেন ?

চমকে মুখ ফেরালেন সকলে।

একটি যুবক তাঁদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—আদিত্য রায় বললেন, হ্যাঁ। আপনি ?

—আমি অনিরুদ্ধ। আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

—ও। আপনি···

—আমাকে তুমিই বলবেন। ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ? আমি ওধার থেকে রিজার্ভেশন স্লিপগুলো দেখতে দেখতে আসায় একটু দেরি হয়ে গেছে। আসুন—

স্টেশনের বাইরে আট শিলিণ্ডারের প্লাইমাউথখানা অপেক্ষা করছিল।

তিনজনে পেছনের সীটে গিয়ে বসলেন।

অনিরুদ্ধ চালকের আসনে বসে এক্সেলেটারে চাপ দিয়ে বলল, হ্যাণ্ডারে দুটো কম্বল আছে। আপনারা পায়ের ওপর ফেলে নিন! ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে কদিন।

আদিত্য প্রশ্ন করলেন, এখান থেকে লয়ালপুর কতদূর ?

—কুড়ি মাইল।

গাড়ি স্টেশন-কম্পাউণ্ডের বাইরে এল।

সুজাতা বললেন, তোমায় কিন্তু চিনতে পারলাম না ?

—আমি পুরন্দরবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি।

প্রায় চল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

ড্যাস-বোর্ডের আলোয় অনিরুদ্ধের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

সুজাতা আবার বললেন, সতের বছর পরে যাচ্ছি। কতরকম পরিবর্তন দেখতে পাব। বাড়িতে উপস্থিত কে কে আছেন অনিরুদ্ধ?

অনিরুদ্ধ একে একে সকলের নাম করে গেল।

আর কোন কথা হল না।

কুয়াশার মধ্যে পথ করে প্রাইমাউথ নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

চৌধুরী-লজের দোতলার দক্ষিণদিকের কোণের ঘরখানা চন্দ্রকান্তর।

ঘরে আলো জ্বলছে।

রাত তখন সাড়ে দশটা।

চন্দ্রকান্ত ফাউন্টেন-পেনে কালি ভরতে ভরতে আড়চোখে তাকালেন ওয়াল-ক্লকটার দিকে। তারপর কালি ভরা শেষ করে, কলমটা ড্রেসিংগাউনের পকেটে রেখে এগিয়ে গেলেন সৌরভের কাছে।

সৌরভ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়েছিল।

—ভাবছি আদিত্য রায়ের কথা। তিনি এখানে আসতে চাইলেন—।

-হুঁ। আমি কিন্তু সুজাতার কথা ভাবছি। পুরন্দরের মুখে যখন শুনলাম ও আসছে এখানে—প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি!

—কেন?

—তুমি তো সবই জান। ওই রকম কেলেঙ্কারির পর সুজাতা যে আবার আসবে, আমি তা সত্যি ভাবতে পারিনি।

—নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।

—উদ্দেশ্য?—একটা সিগারেট ধরিয়ে চন্দ্রকান্ত বললে, আমায় ধাঁধায় রেখ না—কি বলতে চাও তুমি?

সৌরভ জানলার দিকে দৃষ্টি রেখেই বলল, সতের বছর আগে যখন আপনাদের কলকাতার সেলস্ অফিসে ঢুকি আপনার সুপারিশে, তখন আমার বয়স খুবই অল্প। অফিসের কাজকর্মে আদিত্য রায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিয়ের পর তিনি আমায় বলেছিলেন, চৌধুরীদের অনেক টাকা আছে—তাদের একটা এঁটো পাতা অবশ্য হাত পেতে নিয়েছি। তাই বলে—

সৌরভের কথা শেষ হল না।

পোর্টিকোতে একটা গাড়ি এসে থামল।

চন্দ্রকান্তও জানলার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

গাড়ি থেকে নেমে অনিরুদ্ধ দরজা খুলে দিল। একে একে নেমে এলেন,

আদিত্য, সুজাতা—

একি···এ-ক? সবশেষে নেমে এল একটি তরুণী।

অস্ফুট গলায় চন্দ্রকান্ত বললেন, সুজাতার তো কোন ছেলেমেয়ে নেই!

—আমিও তো তাই জানি।

দুদিন কেটে গেছে।

সুজাতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশছেন।

তাঁকে নিয়েই যে দু' বছর আগে এই বাড়িতে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে এখন যেন তাঁর তা স্মরণ নেই।

আর সবাই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। ঊর্মা সুজাতার মেয়ে নয়···বারো বছর আগে দুঃস্থ এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের কা থেকে ওকে চেয়ে নিয়ে প্রতিপালন করছেন আদিত্য রায়, একথা আর কারু অজানা নেই।

সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও, এই দুদিনের মধ্যে পুরন্দর চৌধুরী সাক্ষাৎ পাননি সুজাতা। এই আত্মগোপন কেন? সুজাতা ভাবেন, এ লজ্জা না অভিমান···

আজ সারাটা দিন মেঘলা করেছিল।

সন্ধ্যার পর মেঘ কেটে গিয়ে হাওয়া দিচ্ছে। শীতও দুর্দান্ত আক ধারণ করেছে সেই তালে পা মিলিয়ে।

ঢং ঢং করে কোথায় দশটা বাজল।

হান্টিং হাউস থেকে এই মাত্র ফিরেছেন পুরন্দর।

নিজের ঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে বসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ব্যবসাসংক্রান্ত একা জরুরী চিঠি কালকের ডাকেই কলকাতা পাঠাতে হবে, তাই বিশ্রাম না করে চিঠি লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

চিঠিটা প্রায় শেষ করে এনেছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল, টেবিলের পাশে এ কে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুললেন তিনি।

সুজাতা!

নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন পুরন্দর। অপ সুন্দর রয়েছে সে আজও। শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে একটু।

···পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ যে? হালকা গলায় সুজাতা প্রশ্ন করলেন।

চোখ নামিয়ে পুরন্দর বললেন, পালিয়ে আবার কোথায় বেড়াচ্ছি?

—বেড়াচ্ছ বইকি।

—অসুস্থ স্বামীর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্যে তুমি এখানে এসেছ

তোমার মনে অশান্তি জাগানো নিশ্চয়ই আমার উচিত হবে না।

—অশান্তি।

—তাছাড়া আর কি। আমাদের দুজনের মধ্যে বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হলে মনের মধ্যে একটা অশান্তির ঝড়ের উদ্রেক হবে না কি?

শান্ত গলায় সুজাতা বললেন, তুমি কি পারতে না আমাদের দুজনের জীবন চিরদিনের মত শান্তিময় করে তুলতে?

অবাক বিস্ময়ে সুজাতার দিকে তাকালেন পুরন্দর, সতের বছর আগে সে এই ভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা বলত। স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি আজও।

তিনি ধরা গলায় বললেন, পারতাম। কিন্তু সেদিন আমি পারিনি সুজাতা। অটল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস সেদিন সত্যিই আমার ছিল না। তবে তার আংশিক প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি—আমি আজও অবিবাহিত।

সুজাতা কিছু বললেন না।

চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মিনিট।

শেষে পুরন্দরই আবার বললে আদিত্যর অসুখটা কি?

—পার্নিসাস অ্যানিমিয়া।

—সেকি! যাক, এখানে এসে ভালই করেছ। আমি আদিত্যর ভালভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুজাতা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বলা আর তাঁর হল না, দপ করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। পরমুহূর্তে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন করে একটা শব্দ পেলেন দুজনে।

কিন্তু ওকি·

বাগানের মরনিং গ্লোরির ঝোপের আড়ালে একটা জ্বলন্ত মূর্তি যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দৃশ্যটা চোখে পড়লেও জানলার মধ্যে দিয়ে দুজনেই পরিষ্কার দেখেছেন, দপদপে আগুনের আউট লাইন দিয়ে মূর্তিটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ঘরের আলোও জ্বলে উঠল এই সময় আবার।

আর কোন কথা হল না। এই অভাবনীয় দৃশ্যে দুজনেই হতবাক।

সুজাতা দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পরের দিন।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে, গতকাল রাত্রে হঠাৎ ইলেকট্রিক ফেল করার বিষয়ে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলেন। পুরন্দর চৌধুরী কফি খেতে খেতে চিন্তা করলেন সেই চলন্ত মূর্তি বোধহয় কারুর নজরেই পড়েনি। নইলে কিছু না

কিছু আলোচনা হতই।

সুজাতা ও সম্বন্ধে নীরব।

ব্রেকফাস্ট-পর্বের পর সকলে লনে এলেন।

চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে। বেতের চেয়ারে পিঠ দিয়ে অনেকে বসলেন আজ ছুটির দিন, কাজের তাড়া নেই।

ঊর্ণা একপাশে চুপটি করে বসেছিল। ওর সারা মুখে ভয়ের ছায়া।

জবা এগিয়ে গেল ওর কাছে।

এই কদিনে দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে।

জবা বলল, মুখের অবস্থা এরকম কেন? কি হয়েছে?

—কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন আলো নিভে যায় তখন তুমি কোথায় ছিলে?

—কোথায় ছিলাম মানে—নিজের ঘরে ছিলাম।

বাগানের জানলার দিকে দাঁড়িয়ে থাকলে এভাবে কথা বলতে পারতে না।

জবা বিস্মিত গলায় বলল, কেন বাগানে কি হয়েছিল?

ঊর্ণা ফিসফিসিয়ে বলল, তুমি বিশ্বাস করবে না, কাল আমি বাগানে একটা অবিশ্বাস্য জিনিস দেখেছি!

অবিশ্বাস্য জিনিস!

—হ্যাঁ একটা জ্বলন্ত মূর্তিকে একটা ঝোপ থেকে আরেকটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হতে দেখেছি। তুমি হয়ত বলবে আমার চোখের ভুল, কিন্তু তা নয়। আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে এই দৃশ্য দেখেছি।

জবার মুখেও ছায়া পড়ল।

এই কথা তুমি আর কাউকে বলেছ?

—না।

চন্দ্রকান্ত এই সময় চেঁচিয়ে ডাকলেন ঊর্ণা ও জবাকে।

আগেকার ব্যবস্থা-মত লয়ালপুরের দ্রষ্টব্যগুলো চন্দ্রকান্ত সুজাতা, ঊর্ণা ও জবাকে দেখিয়ে আনতে গেলেন। মৃগাঙ্ক পালিত এসেছিলেন, তিনিও গেলেন ওদের সঙ্গে। আদিত্য রায় এখন বেশ ভাল আছেন। তবুও গেলেন না বেড়াতে। টো টো করে ঘুরতে তাঁর ভাল লাগে না। এমন এই মিষ্টি রোদের মধ্যে লনে বসে কিছু সময় কাটিয়ে দেওয়াটাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

সৌরভ আর শেখর অম্বুজনাথের সঙ্গে কি একটা আলোচনায় ব্যস্ত। পুরন্দর চৌধুরী একধারে বসে বসে সিগারেট টানছিলেন।

আদিত্য রায় পুরন্দরের সামনে এসে বসলেন।

তারপর সহজভাবে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে বলেই আমি ওদের সঙ্গে বেড়াতে গেলাম না।

—বেশ বল।

—আমি তোমার সঙ্গে কিছু বিজনেস টক করতে চাই পুরন্দর।

—বিজনেস টক!

—হ্যাঁ।

—আমি তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না!

—পরিষ্কার করে বললে বুঝতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তবে তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি সত্যিই মনে কর আমার পার্নিসাস অ্যানিমিয়া হয়েছে?

—তাইতো শুনলাম। ডাক্তার নাকি এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

—সুজাতা তোমাকে এই কথা বলে থাকবে! আমার নির্দেশেই ডাক্তার তাকে পার্নিসাস অ্যানিমিয়ার কথা বলেছিল।

—হাউ স্ট্রেঞ্জ আদিত্য!—বিস্মিত গলায় পুরন্দর বললেন।

—নাথিং মাই ডিয়ার।—আদিত্য রায় নির্বিকার গলায় বললেন, আগে আমার পুরো কথাটা শেষ করতে দাও।

—বল!

—ডাঃ শঙ্কর সেন আমার বাল্যবন্ধু। আমার ইচ্ছামত সে মিথ্যা কথা বলেছিল। আসলে আমার কি হয়েছে জান?

—কি?

—ক্যানসার।

—ক্যানসার! কিন্তু এই কারচুপির সার্থকতা কি?

—ক্যানসারের কথা জানাজানি হলে, আমার চেঞ্জের প্রয়োজন হত না। তোমার সঙ্গে বিজনেস টকের সুযোগও আমি পেতাম না!

পুরন্দর অধীর গলায় বললেন, তুমি ক্রমেই মিস্টিরিয়াস্ হয়ে উঠছ আদিত্য। যা বলবার পরিষ্কার করে বল।

—বলব বলেই এই ভূমিকার অবতারণা। সমস্তই তোমাকে আমি বলব। তুমি নিশ্চয়ই ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনবে?

—শুনব। বল?

আদিত্য আরম্ভ করলেন—

তখন কলকাতায় এত লোক ছিল না।

বেশ ভদ্রভাবে ট্রামে-বাসে বসে অফিস যাওয়া যেত।

আদিত্য রায় কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় অফিসে প্রবেশ করলেন। চৌধুরী বিজনেস-কনসার্নের অফিস ব্রাবোর্ন রোডের একটা চারতলা বাড়ির দোতলার কয়েকখানা ঘরে।

নিজের চেম্বারে ঢুকে আদিত্য সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের সামনে গিয়ে

বসলেন। টেবিলের ওপর একগাদা চিঠি জমা হয়ে রয়েছে। সবই অফিস-সংক্রান্ত। চিঠিগুলোর ওপর একে একে দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

হঠাৎ একটা চিঠিতে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। যাবারই কথা। চিঠিখানা লিখেছেন—সূর্যকান্ত স্বয়ং। এমন কিছু লিখেছেন যা আদিত্য রায় সুদূর কল্পনাতেও কখন ভাবতে পারেননি।

চিঠিখানা এইরকম ভাবে লেখা—

প্রিয় আদিত্য,

সম্প্রতি আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। তোমার সাহায্যে এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে আমি রেহাই পেতে চাই।

হরিশঙ্করের ভাগ্নী সুজাতাকে তুমি দেখে থাকবে। মেয়েটি সুরূপা। নানা কারণে তার পাত্র-নির্বাচনের ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। তুমি সুজাতাকে বিয়ে করবে—এই আমি চাই। আমি এখানে বলব না যে আমি তোমাকে যথাসময় সাহায্য না করলে তুমি না-খেতে পেয়ে মারা পড়তে। সেই কৃতজ্ঞতার মূল্য দিতে গিয়ে যে আমার এই কথা রাখতে হবে এমন কথাও আমি বলব না। তবে আমি জানি তুমি আমার আদেশকে উপেক্ষা করার সাহস রাখ না।

হরিশঙ্কর সুজাতাকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। শুভকাজটা অবিলম্বে সম্পন্ন হোক—এই আমার ইচ্ছে।

ভবদীয়

শ্রীসূর্যকান্ত চৌধুরী

সুজাতাকে দেখেছিলেন আদিত্য। গত বছর অফিসের কাজেই লয়ালপুর গিয়েছিলেন। তখনই এই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি তাঁর চোখে পড়েছিল। বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উষ্ণ হয়ে বয়ে যায়নি, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রথম দর্শনেই সুজাতাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন আদিত্য রায়।

কিন্তু ক্রমেই তিনি শুনতে পেলেন আসল কথাটা—অনেকেই তাঁকে শোনাল পুরন্দর ও সুজাতার প্রণয়-কাহিনী। কাজেই ও নিয়ে আর মাথা ঘামাননি আদিত্য।

কিন্তু আজ একি অভাবনীয় সংবাদ চিঠির মাধ্যমে পেলেন তিনি।

আদিত্য বুঝতে পারলেন, পুরন্দরের সঙ্গে সুজাতার বিয়েতে সূর্যকান্তর সমর্থন নেই। তাই –

হ্যাঁ, সূর্যকান্তর আদেশ রাখবেন আদিত্য। সমস্ত জেনেও সুজাতাকে তিনি বিয়ে করবেন। তার আগুনের মত রূপ নতুন করে আদিত্যর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

হরিশঙ্কর এলেন সুজাতাকে নিয়ে কলকাতায়।

আদিত্যর সঙ্গে দেখা হল।

এবং তিনদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

সেই রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হল তখন রাত এগারটা। নববধূ-সুলভ কোন জড়তা ছিল না সুজাতার চালচলনে।

আদিত্যর মন আজ তৃপ্ত। প্রাণভরে তিনি সুজাতাকে দেখছেন।

কিন্তু তখনই স্বপ্ন ভঙ্গ হল তাঁর।

সুজাতা পরিষ্কার গলায় বললেন, আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন ওই অবধি, আর কোন সম্পর্ক আমার সঙ্গে আপনার থাকবে না।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল আদিত্যর। বললেন

—অর্থাৎ ?

—আর দশটা স্বামী-স্ত্রীর মত সম্পর্ক আমাদের মধ্যে থাকবে না।

—আপনি যদি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বামীর অধিকার দেখাবার চেষ্টা করেন তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।

—কিন্তু কেন তুমি এমন করবে ? এর একটা সঙ্গত কারণ আছে তো ?

-কারণটা আপনার অজানা নেই। আপনি সমস্ত জেনেই আমাকে বিয়ে করেছেন। নিজেকে অন্য কারুর হাতে বিলিয়ে দেবার অধিকার আমার নেই।

—তোমার যখন এরকম মনোভাব তখন এই বিয়েতে মত দিয়েছিলে কেন ?

—না দিয়ে উপায় ছিল না ! আমার জন্যে হয়ত মামা বিপদে পড়তেন। তাই আমাকে নীরবে এই অবিচার সহ্য করে যেতে হয়েছে।

আদিত্য রায় গুম হয়ে বসে রইলেন।

আত্মধিক্কারে সরে গেলেন তিনি।

সুজাতা আবার বললেন, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে আপনি রাখলে, আমিও মামার সাহায্যে আপনার পদোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখব।

আদিত্য রায় একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এক বাড়িতে থেকেও বিরাট ব্যবধান রচিত হল দুজনের মধ্যে।

এর পরের ইতিহাসের তীক্ষ্ন এবং খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। তবে এইটুকু জেনে রাখলেই যথেষ্ট যে, প্রচুর অন্ধকারে অল্পদিনের মধ্যেই তলিয়ে গেলেন আদিত্য। শরীর ভেঙ্গে পড়ল। অত্যাচারের পথ ধরেই কঠিন ক্যানসার একদিন বাসা বাঁধল শরীরে।

আদিত্য থামলেন। শেষ করলেন নিজের কাহিনী।

পুরন্দর বিস্ময়ের শেষ ধাপে এসে আটকেছেন।

একটু দম নিয়ে আবার আদিত্য বললেন, জীবনটাকে প্রায় শেষ করে এনে, আজ আমার বেঁচে থাকতে প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে পুরন্দর। আর ওই সঙ্গে

আমি সুজাতাকেও হাসিখুশি দেখতে চাই। সে তোমাকে ভালবাসে, উপায়হীনা অবস্থায় এসেছিল আমার ঘরে। দীর্ঘ সতের বছরের বিবাহিত জীবনের পর সুজাতা আজও কুমারী। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য।

পুরন্দর বললেন, সুজাতার ওপর আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল আদিত্য।

—তোমার নিষ্ঠারও প্রশংসা করি—তুমিও অবিবাহিত। ওর ভার আমি তোমাকেই দিতে চাই। এবার আমাকে তোমরা নিষ্কৃতি দাও ভাই।

অসংলগ্ন গলায় পুরন্দর বললেন, তুমি এখন বিশ্রাম কর। পরে কথা হবে।

—আমাকে বলতে দাও। সুজাতাকে তোমার হাতে তুলে দেব ঠিকই, তবে তার পরিবর্তে তোমাকে আমার জীবনের মূল্য দিতে হবে।

—জীবনের মূল্য ?

—হ্যাঁ। মাত্র তিরিশ হাজার টাকা, যা তোমার কাছে কিছুই নয়। রোগের এখন প্রাথমিক স্টেজ। অস্ট্রিয়ায় গিয়ে চিকিৎসা করাতে চাই। আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই। দেবে টাকাটা ?

- সুজাতা এই পরিস্থিতিকে মেনে নেবে কি ? প্রকৃত ব্যবসাদারের মত কথাটা বললেন পুরন্দর চৌধুরী।

—নেবে, আমি জানি মেনে নেবে সুজাতা। টাকাটা পেলেই একদিন আমি সকলের চোখ ধাঁধিয়ে অদৃশ্য হব। সুজাতার জন্যে রেখে যাব একটা চিঠি, তাতেই পরিষ্কার করে লেখা থাকবে সমস্ত কথা।

—আমি ভেবে দেখি।

ভেবে দেখবার কিছু নেই। মুখ দেখে বুঝতে পারছি। আমার প্রস্তাবে তোমার অমত নেই। সুজাতা ফিরে আসার আগেই সমস্ত কিছু মিটিয়ে ফেলতে চাই। এস—

ব্যাঙ্কের সাহায্য না নিয়ে এতগুলো টাকা আয়রনচেস্টের মধ্যেই পাওয়া যাবে ; প্রথমে ভাবতে পারেননি পুরন্দর চৌধুরী। কিন্তু শেষপর্যন্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পুরো টাকাটাই সংগ্রহ করা সম্ভব হল।

ধীরে-সুস্থে সমস্ত টাকাটাই গুনলেন আদিত্য রায়। তারপর একটা ওভার-নাইটব্যাগে সেগুলি সযত্নে ভরে রাখলেন।

পুরন্দর নিচু গলায় বললেন, তাহলে···

হাসলেন আদিত্য।

বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বার্গেন ইজ এ বার্গেন পুরন্দর, অ্যান্ড দি ডিল ইজ ক্লোজড। আমার কথামতই আমি কাজ করব। তবে আর একটা কথা আছে।

—বল ?

—উর্ণাকে আমি স্নেহ করি। তাকে তুমি মেয়ের মত দেখবে এই আমার অনুরোধ।

—বেশ, তাই করব।

পোর্টিকোতে মোটরের শব্দ পাওয়া গেল।

সকলে ফিরে এল। আদিত্যের ঘর থেকে ফিরে এলেন পুরন্দর।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে শেখরই প্রস্তাবটা করল প্রথমে।

পুরন্দর বললেন, হান্টিং হাউসে সকলে মিলে কয়েকদিন হৈ-হল্লা করে কাটিয়ে দেবার প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এতে আমার সমর্থন আছে। দিন দুয়েক কারখানা যখন বন্ধ তখন অসুবিধা কিসের।

এতে সকলেরই সমর্থন পাওয়া গেল।

স্থির হল, আজই বেলা তিনটের সময় সকলে বেরিয়ে পড়বেন হান্টিং হাউসের উদ্দেশে।

ঘণ্টাখানেক আগে সকলে হান্টিং হাউসে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

অনিরুদ্ধ ছুটোছুটি করে সকলের সুখ-সুবিধার ওপর নজর রাখছে।

পুরন্দর মৃগাঙ্ক আর সৌরভকে সঙ্গে নিয়ে বন্দুক ঘাড়ে করে বেরিয়েছেন শিকারের সন্ধানে। খান দশ-বারো ওজনদার মোরগাভী মেরে ডিনারে বৈচিত্র্য আনাই তাঁর উদ্দেশ্য।

আদিত্য রায় শেখরের সঙ্গে গল্প-গুজবে ব্যস্ত রইলেন।

শেখর ডাক্তার। এখানকার কারখানার স্টাফ ফিজিশিয়ান সে।

তবে এই কাজে তার মন নেই। তার জীবনের স্বপ্ন হল একটা ওষুধের কারখানা তৈরি করার। এই সমস্ত কথা বলছিল শেখর আদিত্যকে।

আদিত্য বললেন, ওষুধের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার।

—তা জানি। মেজকাকা বলেছেন, তাঁর সমস্ত টাকা তিনি আমাকেই দিয়ে যাবেন উইল করে। সেই টাকা দিয়ে বিরাট একটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

—মেজকাকা—মানে পুরন্দর—?

—হ্যাঁ।

এদিকে অনিরুদ্ধ মোটামুটিভাবে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা সেরে, তার নিজের ঘরে ফিরে একটা ফর্দ করতে বসল। যদিও এসমস্ত কাজ তার করবার কথা নয়। শুধু পুরন্দর চৌধুরীর অনুরোধেই এই সমস্ত করতে হচ্ছে।

—আসতে পারি ?

ফর্দ থেকে মুখ তুলে অবাক হল অনিরুদ্ধ।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উর্ণা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বলল, আসুন—।

উর্ণা লঘুপদে ঘরের মধ্যে এলেও তার চলনে জড়তা রয়েছে বইকি।

—কিছু বলবেন?

—বাবা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

—চিঠি—আমাকে!

উর্ণা একটা খাম অনিরুদ্ধর হাতে দিল।

—আমি এখন যাই।—উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। অনিরুদ্ধ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল খামটার দিকে।

আদিত্য রায় তাকে চিঠি দিয়েছেন! কেন? যা বলবার ইচ্ছে করলে তো ডেকেই বলতে পারতেন। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করল।

কাঁপা অক্ষরে লেখা বেশ কয়েকটা লাইন।

অনিরুদ্ধ,

আমার বক্তব্য তোমাকে আমি মুখেই বলতে পারতাম কিন্তু সুজাতার কান বাঁচান যেত না তাহলে। প্রথম আলাপের মুহূর্ত থেকেই আমি তোমাকে স্নেহের চোখে দেখেছি। তাই তোমার ওপর একটা গুরু দায়িত্ব দিতে চাই।

উর্ণাকে তুমি দেখেছ। সে আমার মেয়ে নয়। তবে মেয়ে থাকলে তাকে আমি ওর চেয়ে বেশি ভালবাসতে পারতাম না। ওকে আমি যাবার আগে তোমার হাতেই দিয়ে যেতে চাই। যদিও পুরন্দর ওর ভার গ্রহণ করেছে। তবু নিশ্চিন্ত একটা ভবিষ্যৎ উর্ণার চাই বইকি। হ্যাঁ, আমি বিশেষ কারণে সকলকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি। উর্ণাকে তুমি বিয়ে করবে এই আমার আন্তরিক ইচ্ছে। কথাটা পড়তে তোমার অদ্ভুত লাগছে বোধহয়—কিন্তু কোথাও এতে আন্তরিকতার অভাব নেই জানবে।

আরেকটা অনুরোধ, উপযাচক হয়ে এই চিঠির কথা প্রকাশ করবে না।

ইতি—

শ্রীআদিত্য রায়

চিঠিটা পড়া শেষ করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল অনিরুদ্ধ।

সে কি জেগেই স্বপ্ন দেখছে? না, দুর্বল আদিত্য রায়ের এ একটা বিকার মাত্র?

আদিত্য রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় অতি অল্প। অবশ্য দিন দুয়েক থেকে তিনি প্রায়ই তাকে নিজের কাছে ডেকে তার সঙ্গে সস্নেহে কথাবার্তা বলেছেন।

তাই বলে—

এইরকম জটিল সমস্যার সামনাসামনি অনিরুদ্ধ এর আগে কখনও হয়নি। অনেক বাঁক, অনেক চড়াই-উৎরাইকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এই ধরনের সমস্যা তাকে কখনও বিভ্রান্ত করে তোলেনি।

এখন কি করবে সে?

বেশ কিছুক্ষণ আগেই শিকারীরা ফিরে এসেছেন।

মোরগাভী আর সোরখাব মিলিয়ে খান পনের পাখি প্রাণ দিয়েছে তাঁদের হাতে। পুরন্দর চৌধুরী পাখিগুলি ছাড়াবার ব্যবস্থা করে, নিজের ঘরে চলে গেলেন।

নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ছুটোছুটি তো আর কম হল না। পুরন্দর আরাম করে একটা সোফায় বসলেন। বাড়ির অন্যান্যরা অনেকেই ড্রইংরুমে বসে গল্প-গুজব করছেন।

আদিত্য রায় নিজের ঘরে একলাই আছেন। বই পড়ছেন।

মিনিট কয়েক চোখ বুঁজে সোফায় বসে থাকার পর, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কলিংপুসটা টিপলেন পুরন্দর চৌধুরী।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় ভৃত্য রাজু এসে দাঁড়াল।

—ছোটকাকাকে খবর দাও।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রকান্ত ঘরে এলেন।

বসলেন আরেকটা সোফায়।

—কাকা, কাল থেকেই তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।

—কী কথা?

—তুমি সৌরভকে কলকাতা অফিস থেকে এখানে নিয়ে এলে উপযুক্ত বিবেচনা না করেই। অথচ—

—সৌরভ! কি করেছে সে?

—অডিটারের রিপোর্ট পড়েছ কি?

—না, এখনও পড়া হয়নি। কেন?

পুরন্দর একটু থেমে বললেন, স্টাব্লিশমেণ্ট সেক্সনে হাজার চারেক টাকার গরমিল ধরা পড়েছে।

—সেকি!

—সৌরভ এই সেক্সনের চার্জে রয়েছে না?

ভাইপোর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন চন্দ্রকান্ত।

—তুমি বলতে চাইছ, সৌরভ টাকাটা নিয়েছে?

—আমার জায়গায় তুমি থাকলে তুমিও এই কথা মনে করতে নাকি?

—কিন্তু····

চন্দ্রকান্তর কথা শেষ হল না, দপ করে আলোটা নিভে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ—

দুজনেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু ওকি··· ওধারের বারান্দায় ওটা কি?

জ্বলন্ত মূর্তিটা টলতে টলতে বারান্দা পার হয়ে ক্রমে অদৃশ্য হল।

চন্দ্রকান্ত চিৎকার করে উঠলেন, পুরন্দর—

পুরন্দর চৌধুরীর সাড়া পাওয়া গেল না। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় তিনি মিলিয়ে গেছেন।

গোলমাল আর চিৎকার চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে।

সকলেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছেন।

অনিরুদ্ধ একটা টর্চ সংগ্রহ করে, আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেল দোতলার বারান্দায়। বারান্দার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। নারীদেহ।

অনিরুদ্ধ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেহটা সোজা করে দিল। টর্চের পরিষ্কার আলোয় দেখা গেল, ছিন্নমূল লতার মত পড়ে রয়েছে ঊর্ণা—! বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল অনিরুদ্ধর।

দেহটা পরীক্ষা করল সে। যা ভয় করেছিল তা নয়—আহত হয়েছে। একটু ইতস্তত করে অনিরুদ্ধ ঝুঁকে ঊর্ণার দেহটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিল।

সেই সময় আলো জ্বলে উঠল আবার।

এবার সকলে ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে।

সুজাতা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কি হয়েছে—কি হয়েছে ঊর্ণার?

—বুঝতে পাচ্ছি না। গুরুতর একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই।

অম্বুজনাথ বললেন, কথা পরে হবে। আগে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা দরকার।

জবার ঘর ছিল কাছেই। অনিরুদ্ধ ঊর্ণাকে শুইয়ে দিল তার বিছানার ওপর।

শেখর এল।

রক্ত মুছে ঊর্ণার মাথায় ব্যান্ডেজ করে দিল। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। চোখ মেলে তাকাল ঊর্ণা। ওর দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে।

সকলে ঝুঁকে পড়লেন ওর উপর।

সুজাতা কোমল গলায় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল ঊর্ণা?

—আমি··· আমার কথা বোধহয় তোমরা বিশ্বাস করবে না—

—কি হয়েছিল বল?

—আমি বোধহয় ভূত দেখেছি।

ভূত!! কেউ কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সকলের

চোখেই পড়েছিল সেই জ্বলন্ত মূর্তি। সকলেই এই প্রহেলিকায় মনে মনে বেশ দমে গিয়েছিলেন।

—কিন্তু তোমার কপাল কেটে গেল কিভাবে?

বলতে পাচ্ছি না। ড্রইংরুম থেকে ওপরে আসছিলাম বাবাকে ওষুধ খাওয়াবার জন্যে। দোতলার বারান্দায় আসতেই আলো নিভে গেল। আমি অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম একটা জ্বলন্ত মূর্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। পালাতে গিয়ে পড়ে গেলাম।

—তারপর?

—সেই ভৌতিক মূর্তি আমার গলা চেপে ধরল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

মৃগাঙ্ক পালিত বললেন, এখন এঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

কপালের ক্ষত খুব গভীর নয়। চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল মাত্র। তবু ঊর্ণা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভয়ে মিইয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ।

সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

আজকে আর ঊর্ণাকে নাড়াচাড়া করে লাভ নেই। আজকের রাতটা ও জবার ঘরেই থাকবে স্থির হল।

কনকনে হাওয়া দিচ্ছে বাইরে।

সকলের মুখেই ভয়ের চিহ্ন।

অম্বুজনাথ বললেন, এই বাড়ির একটা দুর্নাম আছে, তা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ আজ পাওয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, তুমি বলতে চাও ওই জ্বলন্ত মূর্তি....

—আমি বলতে চাই—এই বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও বলতে চাই, এই জ্বলন্ত মূর্তির রূপ ধারণ করে কন্দর্প চৌধুরীর অতৃপ্ত আত্মাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঘের হাতে অপঘাতে মারা পড়েছিলেন তিনি। আমরা আজ অবধি তাঁর আত্মার সদ্গতির জন্যে পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করেছি কি?

পুরন্দর প্রসঙ্গটাকে প্রসঙ্গান্তরে আনবার চেষ্টা করলেন।

বললেন, এখন আমাদের একবার আদিত্যের খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। এই গোলমালের দরুন তার শরীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো?

তিন-চারখানা ঘরের পরই আদিত্যের ঘর।

ঘরে আলো জ্বলছিল।

আদিত্য রায় তখনও নিজের হেলান-দেওয়া চেয়ারে বসেছিলেন। মোটা একটা বই কোলের ওপর রাখা। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

সকলে নিজের নিজের ঘরের উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

সুজাতা বললেন, আমার কেমন ভয় ভয় করছে। ঊর্ণা কাছে নেই, উনি

অসুস্থ। এইভাবে একলা থাকাটা—

—আমি না হয় আজ রাতটা এ ঘরেই থাকছি।—শেখর এসে বলল।

অম্বুজনাথ বললেন, সেই ভাল। যে কাণ্ড ঘটে গেল তাতে ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

হঠাৎ চন্দ্রকান্ত আদিত্য রায়ের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তাঁর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ নড়েচড়ে উঠল। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

তিনি ধরা গলায় বললেন, কেউ যেও না, দাঁড়াও।

পুরন্দর বললেন, কি হয়েছে ?

—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আদিত্য বোধহয়—শেখর, ওর পালসটা একবার দেখ তো।

শেখর আদিত্য রায়ের পালসটা পরীক্ষা করে চমকে উঠল।

কাঁপা গলায় বলল, আদিত্যবাবু মারা গেছেন !

মারা গেছেন !! ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল।

সেকি !!!

সুজাতার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। শিথিল শরীরে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। সকলে ঝুঁকে পড়লেন আদিত্য রায়ের ওপর।

আধশোয়া দেহটায় একটা কঠিন ভাব নেমেছে। সারা মুখ মৃত্যুমলিন। সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই, আদিত্য রায় বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

কারুর মুখে কথা নেই।

সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে মুহ্যমান।

শেষে পুরন্দরই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, একজন ভাল ডাক্তারকে কল দেওয়া বোধহয় আমাদের উচিত।

—ডাক্তার !—অম্বুজনাথ বললেন, তার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

—আছে। শেখর অবশ্য পরীক্ষা করেছে, তবু বোধহয় একজন বড় ডাক্তারের মতামত নেওয়াটা ঠিক হবে।

—বেশ।

—অনিরুদ্ধ—

—স্যার।

গাড়ি নিয়ে এখুনি চলে যাও। ডাঃ সোমপ্রকাশকে ডেকে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ সোমপ্রকাশ এলেন।

চৌধুরীদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান তিনি।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদিত্য রায়ের দেহটা পরীক্ষা করলেন ডাঃ সোমপ্রকাশ।

তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, পোস্টমর্টেমে চালান দিতে হবে।

—পোস্টমর্টেমে ? সকলে যেন চমকে উঠে একসঙ্গে একই প্রশ্ন করলেন।

—আমার মনে হচ্ছে সহজ ভাবে মারা যাননি ভদ্রলোক। তাঁকে…

—তাঁকে ?

—তাঁকে খুন করা হয়েছে কিংবা তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ঠোঁটের কোণে শুকিয়ে-থাকা থুতু ও আঙুলের ডগাগুলো পরীক্ষা করেই আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি।

ঘরে উপস্থিত সকলে যেন অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছেন।

পুলিসে খবর দেওয়া হল।

ইন্সপেক্টার রায়সুরানা এলেন।

আদিত্য রায়ের ঘরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মৃতদেহ পরীক্ষা করে তিনি বললেন. মার্ডার বলে আমারও মনে হচ্ছে। আত্মহত্যা হলে স্বাভাবিকভাবে একটা চিঠি পাওয়া যেত। আত্মহত্যা করার কারণ তাতে বর্ণনা করে যেতেন উনি। তাছাড়া দেহের কোথাও যখন ক্ষতচিহ্ন নেই তখন অনুমান করে নেওয়া সহজ যে, কোন ইনজেক্সন বা কিছু পান করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃতদেহের ধারে-কাছে কোন সিরিঞ্জ বা পাত্র দেখা যাচ্ছে না। কাজেই উনি যে আত্মহত্যা করেননি, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চন্দ্রকান্ত বললেন, কিসে মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার ধারণা ?

—পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা শক্ত। তবে বডির পজিশন দেখে মনে হয়, মৃত্যু অত্যন্ত আচমকা ও দ্রুত হয়েছে।

এর পর ইন্সপেক্টার রায়সুরানা প্রত্যেকের জবানবন্দী নিলেন।

কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর।

অবশ্য সকলেই ভৌতিক ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেলেন ইন্সপেক্টারের কাছে।

প্রায় ভোর চারটের সময় মৃতদেহ মর্গে পাঠান হল। যাবার আগে রায়সুরানা বললেন, তদন্ত শেষ হবার আগে কেউ যেন লয়ালপুর ত্যাগ না করেন।

প্রেতপুরীর মত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।

সকলেই যে যার ঘরে গুটিয়ে নিয়েছেন।

পুলিস আদিত্য রায়ের ঘর সীল করে দিয়ে গেছে। সুজাতা আর উর্ণার জন্যে অন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে। সতের বছর ধরে একই সঙ্গে বাস করলেও সুজাতা ও আদিত্য রায়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল দীর্ঘজীবনব্যাপী। তবু সুজাতার মন গুমরে গুমরে উঠছে। আদিত্যর এরকম শোচনীয় মৃত্যু

তিনি চাননি।

উর্ণা কাঁদছে।

এখনও কাঁদছে ও।

নিজের ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছেন পুরন্দর চৌধুরী।

অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে।

এক সময় তার সামনে গিয়ে পুরন্দর বললেন, কি বিশ্রী কাণ্ড অনিরুদ্ধ। আমাদের বাড়িতেই যে এরকম মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটবে তা কে কল্পনা করেছিল!

—খুবই প্যাথেটিক ইনসিডেন্ট স্যার।

—এখন সুজাতার সামনে মুখ তুলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। আদিত্যর মৃত্যু হয়েছে আমাদেরই কারুর হাতে। বাইরে থেকে কেউ তাকে খুন করে যাবে, এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—তাছাড়া—মৃগাঙ্ক পালিত ঘরে এলেন। বললেন, তাছাড়া কালকের সেই ভৌতিক ব্যাপার। আমার মনে হয় আদিত্য রায়ের খুন হওয়ার মধ্যে এর কোন যোগ আছে।

—ভূত আদিত্যকে খুন করেছে!

—বেশ তো, আমায় বুঝিয়ে বল—কাল যা কিছু আমরা দেখেছি, তা কি মিথ্যে? ওই জ্বলন্ত মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল কেন?

—আমি কিছুই ভাবতে পারছি না মৃগাঙ্ক। সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মৃগাঙ্ক পালিত পুরন্দর চৌধুরীর কাঁধে হাত রেখে মৃদু গলায় বললেন, উতলা হয়ে কি লাভ চৌধুরী? ভূত মানুষ খুন করবে, একথা ভাবতে আমিও মনে জোর পাচ্ছি না। পুলিস হত্যাকারীকে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে।

—পুলিস! আজ পর্যন্ত কটা সিরিয়াস কেস পুলিস সলভ করেছে, তুমি বলতে পার?

—পুলিসের ওপর তো নির্ভর করতেই হবে। তাছাড়া তো কোন উপায় নেই।

—উপায় একটা আছে। প্রাইভেট এনকোয়ারি করান যেতে পারে।

—দুর্ঘটনা আমাদের বাড়িতে না ঘটলে আমি এতটা ব্যস্ত হতাম না। এ একটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন—

—কিন্তু………

—অনিরুদ্ধ, ক্যালকাটা টেলিফোন গাইড এখানে ছিল না? ট্রাঙ্ক-কল করবার সুবিধার জন্য আনিয়েছিলাম।

—আছে স্যার।

—দেখি—

মৃগাঙ্ক পালিত বিস্মিত গলায় বললেন, তুমি তাহলে সত্যিসত্যিই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কল করছ ?

কিছু না বলে শুধু মৃদু হাসলেন পুরন্দর।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো ক্রমেই জমাট বাঁধছে।

হাওয়ার বেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে ওই সঙ্গে।

বৃষ্টি নামবে।

ক্যামেল উলের র‍্যাগটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে শৈবাল বলল, এরকম শীত অনেকদিন কলকাতায় পড়েনি, কি বল ?

বাসব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, হুঁ। তারপর এই বৃষ্টি, অনেকটা গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত।

হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির বসবার ঘরে, দুটো সোফায় বসে কথা হচ্ছে ওদের। শৈবাল কয়েকদিন ধরে এই বাড়িতেই আছে। সোমা বাপেরবাড়ি যাওয়ায় শৈবালের হাওয়া-বদলের মত এই বাড়ি-বদল। কয়েকদিন সে বাসবের অনুরোধে এখানেই থাকবে।

—কিন্তু যাই বল ডাক্তার—বাসব আবার বলল, শীতকালটা কিন্তু বেশ।

—বেশ মানে ?

—বেশ মানে, সবরকম মানুষের পক্ষেই বেশ উপাদেয় ঋতু।

—ডাক্তারি-শাস্ত্র কিন্তু বলে গরমকালের চেয়ে মানুষ শীতকালেই রোগে বেশি পড়ে।

—তা হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে সময়টা অত্যন্ত ভাল। মানুষের মনে এই সময় কর্মপ্রেরণা প্রবল হয়ে ওঠে। এমন কি অপরাধীরাও গরমকালের চেয়ে শীতকালে বেশি অপরাধ করে।

—কি রকম ?

শেষবারের মত টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসস্ট্রেতে ফেলে বাসব বলল, সেদিন ফ্রি প্রেস ক্রিমিন্যাল পড়ছিলাম—তা সমগ্র বিশ্বের অপরাধের একটা হিসেব খাড়া করেছেন। তুলনামূলক ভাবে তাতে দেখান হয়েছে, ১৮৬২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল অবধি পৃথিবীতে যত খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি হয়েছে, তার বেশিরভাগই ঘটেছে শীতকালে। অপরাধীদের শীতকালের ওপর দুর্বলতার জন্যেই যে এরকম হয়েছে তা নয়, এর প্রকৃত কারণ হল—

শৈবাল বাধা দিল, যাক্ বিস্তৃতভাবে তোমাকে আর সমস্ত প্রবন্ধটা বলতে হবে না। আমি প্র্যাকটিক্যাল লোক—কার্যক্ষেত্রে কিন্তু কোন প্রমাণ পাচ্ছি না।

বাসব হেসে ফেলল।

কিছুদিন থেকে সম্পূর্ণ বেকার বসে আছে বাসব। হাতে কোন কেস নেই। শৈবালের ইশারা সেই ধার ঘেঁসেই গেছে।

—তুমি ঠিকই বলেছ ডাক্তার। তবে একদিক থেকে এটা সুলক্ষণ। দেশে অপরাধের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। লোক তাই আমাকে আর ডাকছে না।

শৈবাল হেসে বলল, তোমার ব্যবসার তাহলে কি হবে?

—ফেল পড়বে। তারপর আমি একটা বিড়ির দোকান করব। এ আমার অনেক দিনের বাসনা।

—বিড়ির দোকান করবে?

—হ্যাঁ ভাই। লক্ষ্য করেছি বিড়ির ওপর সাধারণ লোকের টান আছে। ও ব্যবসা ফেল পড়বার নয়।

উচ্চহাস্যে নিজের কথা শেষ করল বাসব। কিন্তু হাসির রেশ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আর্তরবে টেলিফোন বেজে উঠল। এক নাগাড়ে ঝঙ্কৃত হয়ে চলল যন্ত্রের ঝঙ্কার। ট্র্যাঙ্ক সিগন্যাল।

শৈবাল বলল, কে আবার ট্র্যাঙ্কল করছে।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে, টেলিফোন-স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, বোধহয় বিড়ির দোকানটা এখন না করলেও চলবে।

ও রিসিভারটা তুলে নিল —হ্যালো—

অপারেটরের মিষ্টি গলা পাওয়া গেল, ট্র্যাঙ্ককল—স্পিক হিয়ার প্লিজ…

পরমুহূর্তে অন্য একজনের গলা পাওয়া গেল, মে আই স্পিক টু মিঃ বাসব ব্যানার্জি—

—স্পীকিং—

—নমস্কার। আমি লয়ালপুর থেকে পুরন্দর চৌধুরী কথা বলছি।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বিনিময় হল।

শৈবাল একতরফা শুনছিল। একসময় বাসব রিসিভার নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

শৈবাল প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

—লয়ালপুর থেকে এক ধনী ভদ্রলোক ফোন করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একজন খুন হয়েছে। আমার সাহায্যে হত্যাকারীকে ধরতে চান।

—তারপর?

—তারপর আর কি, যাব। তুমিও যাচ্ছ আমার সঙ্গে। না…না কোন-রকম আপত্তি আমি শুনতে চাই না। আমি জানি, তোমার বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হয়েছে। কালই আমাদের রওনা হতে হবে অমৃতসর মেলে। ভদ্রলোক মোগলসরাইয়ে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। ওখান থেকে লয়ালপুর মাইল কুড়ি।

ডাইনিং-হলে এলেন পুরন্দর চৌধুরী।

তাঁর দুই চোখ জবাফুলের মত লাল। দুর্ভাবনার মূর্তিমান প্রতীক যেন তিনি।

তাঁর অপেক্ষাতেই সকলে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। তিনি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই, আহারে মন দিলেন সকলে। সুজাতা ও ঊর্ণা ছাড়া আর সবাই ডাইনিং-হলে উপস্থিত রয়েছেন।

আহার-পর্ব নীরবেই এগিয়ে চলেছে।

এক সময় পুরন্দর বললেন, কলকাতা থেকে কাল একজন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ আসবেন। আদিত্যর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবার জন্যে আমি তাঁকে অ্যাপয়েন্ট করেছি। আমার অনুরোধ, সকলেই যেন তাঁর প্রয়োজনমত তাঁকে সাহায্য করেন।

—তা না হয় করা যাবে—চন্দ্রকান্তর গলায় অবজ্ঞার সুর।—কিন্তু শেষ-পর্যন্ত সুজাতার কি হবে? সে কি এখানেই থেকে যাবে?

অম্বুজনাথ বললেন, বাড়ি-ঘরদোর তো আদিত্যর কিছু নেই। থাকত ভাড়া বাড়িতে। পয়সাকড়িও যে কিছু রেখে গেছে তাও মনে হয় না। কিন্তু ওর চলা তো চাই। আইবুড়ো একটা মেয়ে রয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে।

—এ বিষয়ে আমাদের এখন ভেবে দেখতে হবে বইকি।—ওদের ভবিষ্যতের দিকে এখন আমরা না তাকালে, ওরা কোথায় যাবে বল?

সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে চন্দ্রকান্ত বললেন, ওদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার বিবেচনাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়।

পুরন্দরের ঘাড়ের দু'পাশ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। অনেকগুলো চোখাচোখা কথা ঠোঁটের আগায় ভিড় করে এল। কিন্তু অসীম বলে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন, বাড়িতে-আসা অতিথির অসহায় অবস্থাকে উপেক্ষা করাটা কতদূর গৌরবজনক, সে আলোচনা আমি এখন করতে চাই না। যাক, এ ব্যাপারে আর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। ওদের সম্বন্ধে যা করবার আমিই করব।

খাওয়া তখনও শেষ হয়নি।

তবু পুরন্দর উঠে পড়লেন। দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেলেন ডাইনিং-হল থেকে।

ঘণ্টা তিনেক হল লয়ালপুরে এসে পা দিয়েছে বাসব ও শৈবাল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছিল দুজনে। পুরন্দর ঘরে এলেন।

বললেন, আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালাম বোধহয়?

—কিছুমাত্র না।—বাসব বলল, আপনি নিশ্চয়ই পুলিসকে আমার কথা জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ, পারমিশন পাওয়া গেছে।

—আরেকটা কথা। বাড়ির সকলকে আমার কথা জানিয়েছেন কি? প্রায়ই দেখা যায় এরকম এনকোয়ারিতে অনেকে সন্তুষ্ট হন না। কাজের বিশেষ অসুবিধা হয় তাতে।

—আমার বিশ্বাস সেরকম কোন অসুবিধা আপনার এখানে হবে না। সকলেই এ ব্যাপারে একটা নিস্পত্তি চান।

—তাহলে এখন থেকেই কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। আপনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। আমরা থানায় যেতে চাই।

গাড়ির ব্যবস্থা হল।

অনিরুদ্ধই ওদের পৌঁছে দিয়ে এল থানায়।

ইন্সপেক্টার রায়সুরানা সাদরে আহ্বান করলেন বাসব ও শৈবালকে।

যদিও চাক্ষুস কোন পরিচয় ছিল না, তবে সংবাদপত্রের শিরোনামার মধ্যে দিয়েই বাসবের আশ্চর্য ক্ষমতা ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ইন্সপেক্টার রায়সুরানা।

কুশল বিনিময়ের পর কাজের কথা হল।

বাসব প্রশ্ন করল, পোস্টমর্টমের রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি?

—আজই সকালে রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

—কিসে মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন?

—মৃতদেহের পেটে কোডিন নামে একরকম ভেষজ পাওয়া গেছে। মৃত্যু হয়েছে তাতেই।

—কোডিন!—বাসবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।—মৃত্যু ঠিক কটায় হয়েছে বলে তাঁদের অভিমত?

—ডাক্তারদের মতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

—হুঁ। ডেডবডিটা একবার দেখতে চাই ইন্সপেক্টার।

—এখন তো সম্ভব হবে না। বডি চালান দেওয়া হয়েছে আরায়। এখানে তো কোন ব্যবস্থা নেই, পোস্টমর্টম ওখানেই হয়েছে।

—ও। চলুন, ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক। ঘরটা একবার ভাল করে দেখব।

রায়সুরানা নিজের জিপেই বাসব ও শৈবালকে হাস্টিং হাউসে নিয়ে এলেন।

আদিত্য রায়ের ঘরের সীল ভেঙে দিলেন ইন্সপেক্টার।

ষোল বাই চৌদ্দ ঘরখানা। একধারে পর পর তিনটে জানলা। বাসব একটা জানলার পাল্লা খুলে উঁকি মেরে দেখল। নিচে ফুলের বাগান।

খুব বেশি আসবাবপত্র নেই ঘরে।

একপাশে জোড়া খাট। ড্রেসিং টেবিল। আলনা। খান দুই সুটকেশ। গোটাকতক চেয়ার। টেবিলের ওপর কিছু ওষুধপত্র।

একটি হ্যারিংটন চেয়ার দেখিয়ে ইন্সপেক্টার বললেন, মারা যাওয়ার আগে

আদিত্য রায় এতেই বসেছিলেন।

টিক উডের সেকেলে হ্যারিংটন চেয়ার।

বাসব চেয়ারটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, মার্ডারের মোটিভ কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা ?

—বলা এখন শক্ত। একজন ক্যানসার রুগী—যে নিজেই দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাকে খুন করে কার যে লাভ হল বলা সত্যিই শক্ত।

—ক্যানসার !

—পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে জানা গেছে ভদ্রলোকের ক্যানসার ছিল।

বাসব পায়ে পায়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল আবার। তিনটে জানলার পাল্লাই খুলে দিল একে একে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল মাঝের জানলাটার ওপর, নিচের দিকের কাঠের বিটটার কাছাকাছি দুটো গরাদে কোন কিছু ঘসে যাওয়ার দাগ পড়েছে।

বাসব সেদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে আর কিছু দেখবার নেই আমার। এখন বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলে নিতে চাই।

প্রথমেই পুরন্দর চৌধুরীকে ডাকা হল।

ইন্সপেক্টার রায়সুরানা এই সময় বিদায় নিলেন। তাঁর বিশেষ একটা কাজ ছিল অন্যত্র। অবশ্য একজন কনেস্টবলকে মোতায়েন করে গেলেন, বাসবের কাজ শেষ হয়ে গেলে ঘরে তালা দিয়ে দেওয়ার জন্যে।

নিজের জবানবন্দীতে পুরন্দর চৌধুরী সুজাতার চিঠি পাওয়া থেকে শুরু করে আদিত্য রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু জানেন, সমস্তই বলে গেলেন। কিছুই বাদ দিলেন না, জ্বলন্ত মূর্তির কথাও না—ত্রিশ হাজার টাকার কথাও না—

তাঁর কথা শেষ হলে বাসব অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল, সম্প্রতি এই বাড়িটা রঙ করানো হয়েছে কি ?

বিস্মিত কণ্ঠে পুরন্দর উত্তর দিলেন, সম্প্রতি ঝেড়ে মেরামত করানো হয়েছে বাড়িটাকে।

—ও ! আদিত্য রায়ের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

—বেনারসের স্কুল-জীবনে আদিত্য আমার বন্ধু ছিল। ওদের অবস্থা ভাল ছিল না। ম্যাট্রিক পাস করার পর ও যখন চাকরির সন্ধান করছিল, তখন আমিই বাবাকে বলে, আমাদের কলকাতার অফিসে চাকরি দিই।

—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার চৌধুরী, বাসব বলল, আদিত্যবাবু ও সুজাতাদেবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে আজ অবধি, আপনি নিশ্চয়ই আদিত্য রায়ের ওপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করে আসছিলেন ?

—কেন ? আদিত্যর তো এতে কোন দোষ ছিল না। বাবা তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন।

—ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই। অনুগ্রহ করে আপনার কাকাকে পাঠিয়ে দিন। ভাল কথা, সেদিন চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে আপনার কতক্ষণ কথা হয়েছিল ?

—মিনিট তিনেক বোধহয়। তারপরই আলো নিভে যায়।

পুরন্দর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চন্দ্রকান্ত এলেন কয়েক মিনিট পরেই। শৈবাল খুঁটিয়ে দেখল ভদ্রলোককে, লম্বায় ছ' ফিটের মত হবেন। গায়ের রঙ তামাটে। সুছাঁদ-মুখশ্রী। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ জড়ানো। মাথায় সুচিক্কণ টাক।

—আপনাকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করলাম ?

—নিশ্চয়ই না। এই বিশ্রী কাণ্ডের পরিসমাপ্তি আমি চাই মিস্টার ব্যানার্জি।

—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? দুর্ঘটনার দিন আপনার সন্ধ্যাবেলাকার অ্যাকটিভিটিটা জানতে চাই মিস্টার চৌধুরী।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, সাড়ে পাঁচটার পর আমি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে যাই। পৌনে আটটা অবধি ওখানেই ছিলাম। তারপর পুরন্দরের ঘরে যাই। বৈষয়িক কারণে সে আমায় ডেকে পাঠায়। আমরা কথা বলছি, এমন সময় আলোটা নিভে গেল। একটা চিৎকারও শুনতে পেলাম। দুজনে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই, অবিশ্বাস্য রকমের একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। আমি…

তাঁকে বাধা দিয়ে বাসব বলল, সেই সময় আগাগোড়া পুরন্দরবাবু আপনার সঙ্গেই ছিলেন ?

—না, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমরা আলাদা হয়ে পড়েছিলাম।

—ঠিক ক'টায় সেদিন আলো নিভে যায় বলতে পারেন ?

—যতদূর মনে হচ্ছে আটটায়।

—হুঁ। ড্রইংরুমে আপনি যখন ছিলেন, তখন সেখানে বাড়ির অন্যান্য সকলেও কি উপস্থিত ছিলেন ?

—পুরন্দর, অনিরুদ্ধ ও শেখর ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত ছিল।

—আপনি কি করেন চন্দ্রবাবু ?

—চৌধুরী-বিজনেসের আমি একজন ডিরেক্টার। তাছাড়া আমাদের প্লাইউড কারখানার পারচেজিং ডিপার্টমেন্টটা আমার হাতে।

—আই সি। পুরন্দর সুজাতাদেবীকে ভালবাসতেন কিংবা এখনো বাসেন।—ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটেছে, আপনি কি বলেন মিস্টার চৌধুরী ?

—আমি ? চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে তাকালেন, এটা বোধহয় অবান্তর প্রশ্ন।

অল্প একটু হাসল বাসব।—এই ধরনের একটা খুনের তদন্ত করতে গেলে,

কোন্ প্রশ্নটা যে সঙ্গত আর কোন্টা অবান্তর, প্রথমে তা রেক্টিফাই করা অত্যন্ত শক্ত। যাই হোক, আপনার ব্যক্তিগত দিকটার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—ব্যক্তিগত দিকটা আমার অতি সাধারণ। স্ত্রী মারা গেছেন প্রায় বছর পনের আগেই। কোন সন্তান নেই। এই আর কি—।

—আপনার অবর্তমানে প্রপার্টিতে আপনার যে শেয়ার আছে তার কি হবে ?

—সৌরভ পাবে। আমার শালার ছেলে। আমার কাছেই থাকে সে।

—আদিত্যবাবুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

—আদিত্য ছিল পুরন্দরের বন্ধু—আমাদের কলকাতার অফিসে কাজ করত। আমি ওকে চিনতাম।

—আপনার আঙুলে কি হয়েছে ?

—ব্লেডে কেটে গেছে।

—ও। আচ্ছা, আমি এবার সুজাতাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর ঘরটা অনুগ্রহ করে দেখিয়ে দিন।

—আসুন। চন্দ্রকান্ত অগ্রবর্তী হলে, বাসব ও শৈবাল তাঁকে অনুসরণ করল। সিঁড়ির মুখেই ঘরখানা। সুজাতা বিছানায় বসেছিলেন নীরবে। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল ঊর্ণা। বাসব ও শৈবাল ঘরে প্রবেশ করতেই, দুজনে তাকালেন ওদের দিকে। চন্দ্রকান্ত ঘরে আসেননি।

—আমার পরিচয় আপনারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। বাসব মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার পেশাই বিচিত্র—শোচনীয় মনের অবস্থা জেনেও, আমি আপনাদের উত্যক্ত করব।

সুজাতা ধরা গলায় বললেন, আপনি আপনার কর্তব্যই করছেন। বলুন, আমার কাছ থেকে কি জানতে চান ?

—আপনার স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?

—ধারণা! তিনি যে এভাবে নিহত হতে পারেন, আমি তা কল্পনাই করতে পারি না।

—তাছাড়া বাবার মত একজন অসুস্থ বিত্তহীন লোককে খুন করে কার যে কি লাভ হল কে জানে! ঊর্ণা বলে উঠল।

বাসব নির্বিকারভাবে বলল, তাঁর কাছে যে ত্রিশ হাজার টাকা ছিল, তা কি পুরন্দরবাবু ফিরিয়ে নিয়েছেন ?

—ত্রিশ হাজার টাকা! দুজনেই বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন।

—কোথা থেকে এত টাকা পাবেন তিনি ? অসুস্থতার দরুণ চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

বাসব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা আপনারা

দুজনেই ড্রইংরুমে ছিলেন, না ?

—হ্যাঁ। শুধু ঊর্ণা একবার ওপরে এসেছিল ওঁকে ওষুধ খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পথেই ও বিপদে পড়ে।

—আচ্ছা মিসেস রায়, আপনি এবার চিন্তা করে বলুন, সেদিন সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ড্রইংরুমের বাইরে কে কে গিয়েছিলেন ?

সুজাতা একটু চিন্তা করে বললেন, পৌনে আটটার সময় চাকর ডাকতে আসায় চন্দ্রকান্তবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যান। অম্বুজবাবু তার কিছুক্ষণ আগেই নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। সবশেষে যায় ঊর্ণা। আমি ওপরে আসি ঊর্ণার চিৎকারে।

—চন্দ্রকান্তবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আপনি কি ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন ?

—ঊর্ণা উত্তর দিল, ড্রইংরুমের ঘড়িটা পনের মিনিট অন্তর এলার্ম দেয়। আমার মনে আছে, উনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান, তখন এলার্ম বাজছিল।

—ও। ঊর্ণাদেবী, আমি শুনেছি একটা ভৌতিক মূর্তি আপনার গলা টিপে ধরেছিল—?

—হ্যাঁ, তাই।

—আপনি সেই জ্বলন্ত মূর্তিটির সম্বন্ধে এমন বিশেষ কিছু বলতে পারেন যাতে আমার কাজের সুবিধা হয় ?

—বিশেষ কিছু—মূর্তিটা কাছে আসতেই আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম—মিষ্টি গন্ধ।

—ধন্যবাদ। আর একটু কষ্ট আপনাদের দেব ? ওই ঘরে চলুন, কোন জিনিস হারিয়েছে কিনা দেখে বলবেন একবার।

আগেকার ঘরে আবার ফিরে এল বাসব।

শৈবাল, ঊর্ণা ও সুজাতাদেবীও এলেন।

—দেখুন তো কোন কিছু হারিয়েছে কিনা আপনাদের ?

বাসবের কথায় সুজাতাদেবী ঘরের জিনিসগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। ঊর্ণাও।

—একটা ওভারনাইট ব্যাগ ছিল, সেটা দেখছি না তো!

—ব্যাগ! কি ছিল তাতে ?

—ব্যাগটা ওঁর সঙ্গেই থাকত। নিত্য দরকারি জিনিস ওতে রাখতেন উনি।

—আর কিছু হারিয়েছে কি ?

সুজাতা এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে বললেন, কই, আর কিছু হারিয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

—তুচ্ছ হলেও, আরেকটা জিনিস বোধহয় হারিয়েছে। ঊর্ণা বলল।

বাসব আগ্রহ ভরে ওর দিকে তাকাল।

—কাচের গেলাস ছিল একটা টেবিলের ওপর, কই, সেটা নেই তো।

—ওষুধ খাওয়ার গেলাস কি? বাসব প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ। বাবা ওই গেলাসটাতেই বছর দেড়েক ধরে ওষুধ খাচ্ছিলেন।

—এবার আপনারা গিয়ে বিশ্রাম করুন। অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। আর আপনাদের ধরে রাখব না। এস ডাক্তার—

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবাল অনুসরণ করল ওকে।

আদিত্য রায়ের ঘর থেকে ওরা চলে এল বাগানে।

শৈবাল বলল, কোথায় চলেছি আমরা?

—আদিত্য রায়ের ঘরের জানলার নিচে।

আর কিছুদূর এগোবার পর নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছান গেল। সেখানে ভিসকোসা ড্যাডানডোনিয়ার চওড়া বেড়া এঁকেবেঁকে চলে গেছে। বেড়ার একধারে সিজন ফ্লাওয়ারের সমারোহ, অন্যধারে সরু সুরকি-ঢালা পথ। মাঝে জানলাটার নিচে—বেড়ার কিছুটা অংশ কেমন অবিন্যস্ত দেখা গেল। বাসব সেদিকে এক নজর তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, আমার হিসেবে ভুল হয়নি ডাক্তার। মনে হয়, কাছাকাছিই কোথাও আমরা গেলাস-ভাঙা টুকরোগুলোও পাব।

একটু খোঁজাখোঁজি করতে সত্যিই পাওয়া গেল ভাঙা গেলাসের কাচের টুকরো। বাসব সযত্নে সেগুলো পকেটস্থ করল।

—চল, ফেরা যাক। আর কিছু এখানে দেখবার নেই।

ওরা দুজনে ফিরে এল নিজের নির্দিষ্ট ঘরে।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপর আড় হয়ে শুলো। কেমন একটা নিশ্চিন্ত ভঙ্গি।

শৈবাল বলল, কিহে, তোমার ভঙ্গিতে কেমন যেন নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠেছে?

—একটা জটিল হত্যা-রহস্যের তদন্তে এসে যদি প্রথমেই গোটাকতক লোভনীয় সূত্র পাওয়া যায়, তা হলেও কি তুমি চাও, আমি দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থাকব?

—নিশ্চয়ই না। অতএব ঝেড়ে কাশো—

বাসব সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, গেলাস-ভাঙা যে টুকরোগুলো পেয়েছি, যদিও সেগুলো এখনও পরীক্ষা করা হয়নি, তবে আমি নিশ্চিত, ওগুলোর গায়ে কোডিনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

—কোডিন!

—কোডিন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে না। এটি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যেমন সামাজিক সমস্যা, তেমনি ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে কতকগুলো দুরারোগ্য ব্যাধিতে ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শৈবাল বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোডিনের দুর্নাম ও সুনাম দুই-ই আছে। এটি উত্তেজনাকর নেশা, আবার অসুখ-বিশেষের মেডিসিন, আবার তীব্র বিষও।

—এখন তুমিই বলতে পারবে কতখানি কোডিন ব্যবহার করলে একটি লোকের দ্রুত মৃত্যু হতে পারে।

—অল্প একটু জলে বেশি মাত্রায় কোডিন ব্যবহার করলে প্রথমে তীব্র ঝিমুনি আসবে। তারপর মৃত্যু হবে তিন থেকে ছ' মিনিটের মধ্যে।

—কাজেই ধরে নিতে হবে হত্যাকারী কাজ শেষ করে গেলাসটা জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল। অবশ্য শুধু একটা গেলাসই ফেলা হয়নি, ওই সঙ্গে আরেকটা জিনিস জানলা-পথে চালান দেওয়া হয়।

—সেটা কি ?

—আদিত্যবাবুর ঘরের বাগানের দিকের মাঝের জানলার দুটো গরাদের মাঝামাঝি জায়গায় ঘসা দাগ ছিল, অর্থাৎ রঙ চটে গিয়েছিল। আমরা পুরন্দরবাবুর কাছে জানতে পেরেছি, বাড়িটা সম্প্রতি ঝেড়ে মেরামত করা হয়েছে। কাজেই ওখানে ও-ধরনের দাগ থাকা সম্ভব নয়। অথচ রয়েছে। তারপর নিচে বাগানের ড্যাডোনডানিয়ার বেড়ার ওপর কিছু অবিন্যস্ত ভাব দেখা গেছে। এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে বলতে পার ?

—কি ?

—পুরন্দরবাবুর জবানবন্দীতে আমরা শুনেছি, আদিত্য রায় তাঁর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নেবার পর, ওভারনাইট ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখেন। এখন সেই ওভারনাইট ব্যাগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—

শৈবাল দ্রুতকণ্ঠে বলল. তুমি বলতে চাও, ওই ব্যাগটা জানলা গলিয়ে ড্যাডোনডানিয়া বেড়ার ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল ?

—এক্সজ্যাক্টলি। পুরু ব্যাগটা জানলা দিয়ে গলিয়ে দেওয়ার সময় গরাদে ঘসড়ানি লাগে। তাতেই খানিকটা চটা উঠে যায়।

—আচ্ছা, ওই ভৌতিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?

—দেখ ডাক্তার, ভূতেদের ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তবু, তাঁদের কাছ থেকে নিজের ব্যবধান আমি সব সময় চাই শত হস্তেন্। কিন্তু এক্ষেত্রে ভূতদর্শন করতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।

—কি রকম ?

—তুমি এমন নজির দেখাতে পার যে ভূতেরা সন্ধ্যেবেলায় আলোর মালা গায়ে জড়িয়ে মানুষের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? পার না। তেমনি পার না, কোন ভূত গায়ে সুগন্ধ মেখে, বাড়ির ইলেক্‌ট্রিক কানেকশন অফ করে

কাউকে গলা টিপে মারতে যাচ্ছে। কাজেই, আমি নিশ্চিত এই সমস্ত কাণ্ড কোন রক্তমাংসে গড়া ভূতের কাণ্ড।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিল।

শৈবাল বলল, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, ত্রিশ হাজার টাকাটাই হল মার্ডারের মোটিভ।

—ভেতরে আসতে পারি?

দরজার গোড়ায় অম্বুজনাথ দাঁড়িয়ে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে বলল, আসুন।

তিনি ঘরের মধ্যে এসে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আমি অম্বুজনাথ চৌধুরী। আপনাদের যদি কোন উপকারে আসতে পারি—তাই দেখা করতে এলাম।

শৈবাল লক্ষ্য করল, তাঁর গলার আওয়াজে কেমন একটু জড়তা রয়েছে।

—আপনার এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্যে ধন্যবাদ মিঃ চৌধুরী। —বাসব বলল, অবশ্য আজই দুপুরে আমি আপনার কাছে যেতাম। যাক্, আদিত্যবাবু খুন হওয়ার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কি?

—সত্যি কথা বলতে কি, এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। আদিত্যকে খুন করে কেউ কি ভাবে যে লাভবান হতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।

—পুলিশের কাছে আপনি নিজের স্টেটমেণ্টে বলেছেন, দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা আপনি ড্রইংরুম থেকে নিজের ঘরে চলে আসেন।

—হ্যাঁ। এই কথাই বলেছি আমি।

—ঘরে গিয়ে আপনি কি করলেন?

—বই পড়ছিলাম একটা। হঠাৎ আলো নিভে গেল। তারপরই একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ওধারের বারান্দা দিয়ে একটা জ্বলন্ত মূর্তি টলতে টলতে চলে যাচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর আমি ইলেকট্রিক আলো আবার না জ্বলা পর্যন্ত নিজের ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকি।

—ব্যাপারটা তাহলে ভৌতিক কাণ্ড বলুন?

—তাছাড়া আর কি! তবে এরকম যে হবে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।

—কি ভাবে?

ইতস্ততঃ করে অম্বুজনাথ বললেন, একটা পারিবারিক কেলেঙ্কারির দরুণই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলেই আমি মনে করি। সে কথা....

—আপনি মিথ্যে সঙ্কোচ করছেন মিঃ চৌধুরী। সমস্ত কেচ্ছার কথাই

আমার জানা আছে। এখন আপনি যা বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন।

—তাহলে তো আপনি জানেনই, আমাদের বাড়িতে এককালে পুরন্দর আর সুজাতাকে নিয়ে কি রকম কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। আমাদের ঠাকুর্দা কন্দর্প চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি কোনদিন অনাচারকে প্রশ্রয় দেননি। আমার কাকা সূর্যকান্তও ছিলেন ওই একই চরিত্রের লোক— অম্বুজনাথ একটু থেমে বললেন, পুরন্দরের দুর্বলতার জন্যে সুজাতা আবার এখানে পা দিয়েছে। একটা অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাই—

—তাই কন্দর্প চৌধুরী বা সূর্যকান্তর আত্মা এইভাবে দেখা দিচ্ছেন?

—আমি জোর দিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে—। তবে অপঘাতে মৃত্যু হলে অনেক সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

—সূর্যকান্ত অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন নাকি?

—না। কন্দর্প মারা গিয়েছিলেন বাঘের হাতে।

—কি ব্যাপারটা হয়েছিল বলুন তো? গল্পটা শুনতে ইচ্ছে করছে। আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?

—আপত্তি কিসের। শুনুন—

আজকের মত লয়ালপুর এত সমৃদ্ধ ছিল না সেদিন।

সব মিলিয়ে হাজার তিনেক লোকের এখানে বাস ছিল। চৌধুরীদের প্লাইউড ফ্যাক্টরিটা সবে গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু পাকা বাড়িও তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে।

এই সময়—

বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের তরাই অঞ্চলের বনগুলিতে বাঘের উপদ্রব দেখা দিল।

আগে বাঘের ভয়ে এই অঞ্চলে কেউ বাস করতে পারত না। লয়ালপুর উপনগর গড়ে ওঠার পর মানুষের সাহস বেড়েছে। ওই সঙ্গে ভেঙ্গেছে বাঘের কপাল। কানপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি জায়গা থেকে বহু ইংরেজ শিকারী এসে প্রাণভরে বাঘ মেরেছেন। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বাঘশূন্য হয়ে পড়েছিল অঞ্চলটা।

সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ আবার—

লয়ালপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে পারাউয়া গ্রাম। সেখানকার লোকেরা একদিন সকালবেলা উঠে দেখল, গ্রামের বেনো মাহতোর বলদটা অদৃশ্য হয়েছে। গোয়ালের চারিদিকে চাপ-চাপ রক্ত।

সকলেই বুঝে নিল বাঘ আবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু একটা বিস্ময় সকলকে উতলা করে তুলল। কারণ বলদটা ছিল বিরাট আকারের একটা

মাংসের পাহাড়। অত্যন্ত বলশালী বাঘের পক্ষেও তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। অথচ—

যাই হোক এরপর থেকে কয়েকটা গ্রাম জুড়ে বাঘের উপদ্রব হতে লাগল, ঘন ঘন গরু, বলদ, ছাগল এন্তার অদৃশ্য হল। কিন্তু চাক্ষুস কেউ বাঘকে দেখতে পেল না। তার গুরুগম্ভীর গর্জন মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের মাঝরাতে সচকিত করে তুলত—এই যা।

ত্রাসের সঞ্চার হলেও কোনরকমে দিন কাটছিল। কিন্তু চরম হল যেদিন তিন তিনটে মানুষ লোপাট হয়ে গেল। কি করে তা অনেক খোঁজ-খবর করেও জানা গেল না। চারিদিকে হঠাৎ একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে এ সমস্ত নাকি ভূতুড়ে বাঘের কাণ্ড। নইলে কেউ আজ পর্যন্ত তাকে চোখেই দেখল না অথচ পশু আর মানুষ সেখানে ক্রমাগত লোপাট হয়েই চলেছে।

গ্রামে গ্রামে পুজোর হিড়িক পড়ে গেল। এই ফাঁকে ভণ্ড ওঝারা বেশ কিছু রেস্ত করে নিল। অবশ্য এত কাণ্ডের পর বাঘের উপদ্রব মোটেই কমল না। এমন কি পারাউয়া গ্রামের ওঝাকেই বাঘে তুলে নিয়ে গেল একদিন।

লোকে আর ঘর থেকে বেরোয় না। এমন কি দিনের বেলা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটারও সাহস তাদের নেই। জঙ্গল যে সমস্ত মহাজনরা ইজারা নিয়েছিল, তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। তারা বুঝল ভূতুড়ে বাঘের ভয় না কমলে আর একটা লোকও জঙ্গলে যাবে না কাঠ কাটতে।

শেষে মহাজনরা আরায় গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবার করল বাঘটাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করবার জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পাটনা থেকে দুজন শিকারীকে আনিয়ে লয়ালপুরে পাঠালেন।

পুরো একটা হপ্তা চেষ্টা করার পর, বাঘ মারা তো দূরের কথা, তার লেজের ডগাটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন না শিকারী দুজন।

এদিকে, কন্দর্প চৌধুরী মাস দুয়েক থেকে লয়ালপুরে নেই। কলকাতায় যেতে হয়েছে, চৌধুরী প্লাইউড কারখানা থেকে মোগলসরাই অবধি সরাসরি মালগাড়ির জন্যে লাইন পাতা যায় কিনা, সেই বিষয় নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-অলোচনা করবার জন্য।

আজই ফিরেছেন লয়ালপুরে।

বিকেলে বিশ্রাম সেরে সবে নিচে নেমেছেন। মন তাঁর খুবই প্রফুল্ল। রেলের কর্তারা তাঁর কথা মেনে নিয়েছেন। আগামী মাস থেকেই জরীপের কাজ আরম্ভ হবে।

তাঁর খাস ভৃত্য এসে জানাল বাইরে দুজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।

কন্দর্প চৌধুরী বাইরের ঘরে এলেন।

ফরাসের ওপর দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। এখনকার মত সাহেবী-ব্যবস্থা তখন ছিল না চৌধুরী-লজে। সাবেকী-ব্যবস্থাই চালু ছিল।

কন্দর্পকে দেখে ভদ্রলোক দুজন উঠে দাঁড়ালেন।

তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন কন্দর্প।

—বললেন, ভার্মা, তুমি। কবে এলে?

—এসেছি প্রায় দিন আটেক হল। আপনি ছিলেন না শুনলাম। ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু চন্দ্রশেখর লাল। আমার সঙ্গে পাটনা থেকে এসেছেন।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মিঃ লাল। বসুন। তুমিও বস। তারপর এখানে কোন কাজে এসেছ নাকি?

—এসেছিলাম বাঘ শিকারে। কিন্তু হপ্তাখানেক ধরে শুধু হয়রানই হচ্ছি। এই ভুতুড়ে বাঘকে মারা আমার কর্ম নয়।

কন্দর্প বললেন, ম্যানেজারের কাছে শুনেছিলাম বটে, এই অঞ্চলে একটা বাঘ ভীষণ উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে, স্থানীয় লোকেদের ধারণা, এই বাঘটার ওপর উপদেবতার ভর আছে।

ভার্মা বললেন, আমার মতে, স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস মিথ্যে নয়।

জোরে হেসে উঠলেন কন্দর্প।

বললেন, তুমিও সাধারণ লোকের মত এই বাজে গুজবে কান দিচ্ছ।

মিঃ লাল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, আমিও প্রথমে গুজবে কান দিতে চাইনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমেই আমাদের ধারণা পাল্টাতে হল। এই সাতদিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা বাঘের পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাইনি। অথচ আমরা যেখানে উপস্থিত থেকেছি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার খুব কাছ থেকে গরু-ছাগল ইত্যাদি অদৃশ্য হয়েছে।

—হুঁ। আপনাদের কথাবার্তায় বেশ উৎসাহ পাচ্ছি। এক কাজ করলে হয়, চলুন না, আজ রাত্রে না হয় আমিও আপনাদের সঙ্গী হয়ে বাঘের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। বাঘ তো এতদিন কম মারলাম না। এবার চেষ্টা করে দেখি ভুতুড়ে বাঘ মারতে পারি কিনা।

এই সময় ভৃত্য ট্রেতে করে চা নিয়ে এল, কিছু মিষ্টিও।

বলার প্রয়োজন পড়ে না। অতিথি এলেই স্বাভাবিক নিয়মে এ বাড়িতে চা-মিষ্টি উপস্থিত হয় যথাস্থানে।

কন্দর্প চৌধুরীর অনুরোধে মিঃ লাল চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন। ভার্মাও।

ভার্মা বললেন, আমরা আজ ফিরেই যাব ঠিক করেছিলাম। আপনি যখন বলছেন তখন না হয়—কিন্তু বাঘটাকে মারতে পারা যাবে বলে তো মনে হয় না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কন্দর্প, ভার্মা আর লালকে নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে যাত্রা করলেন। আগে যে মাচা ভার্মা তৈরি করিয়েছিলেন, তাতে বসেই বাঘের জন্যে তিনজনে অপেক্ষা করবেন ঠিক হল। মাচাটা ঝরনার খুব কাছেই।

বাঘটা জল খেতে এলে শিকারীদের চোখে সে পড়বেই।

ক্রমেই রাত গভীর হচ্ছে।

মায়াকাঠির পরশেই যেন বিরাট জঙ্গল ঘুমের কোলে ঢোলে রয়েছে। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিমঝিম চলেছে একটানাভাবে।

অন্ধকার যে এত কালো হতে পারে না-দেখলে ধারণা করা যায় না। মনে হচ্ছে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলা যাবে।

ভার্মার চোখের পাতা দুটো ক্রমেই নেমে আসতে চাইছে। মিঃ লালও নিমীলিত চোখে বসে আছেন। কন্দর্প চৌধুরীর সজাগ দৃষ্টি কিন্তু ঘুরছে চারধারে। কোলের ওপর রয়েছে তাঁর প্রিয় মার্টিন হেনরী রাইফেলটা। ডার্বি সায়ারের এই মার্টিন হেনরী রাইফেলটার সাহায্যে বহু যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন।

রাত আরো বাড়ল।

মশারা ঝাঁক বেঁধে তাঁদের আক্রমণ করে চলেছে। বসে থাকা ক্রমেই হয়ে উঠছে কষ্টকর। একসময় কন্দর্প চৌধুরী বললেন, ছাগলটা তো মোটেই ডাকছে না?

মাচার কাছেই ছাগল বেঁধে রাখা হয়েছিল।

—আমার মনে হয় বাঘ নিয়ে গেছে তাকে।—লাল বললেন, এর আগেও এরকম হয়েছে কয়েকবার। আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি অথচ টোপ অদৃশ্য হয়েছে। এ ব্যাপারে বাঘটার অদ্ভুত ভৌতিক ক্ষিপ্রতা আছে।

কন্দর্প চৌধুরী বিস্মিত হলেন। অজস্র বাঘ তিনি মেরেছেন। বাঘ-চরিত্রের খুঁটিনাটি জ্ঞান তাঁর নখদর্পণে। সত্যিই যদি ছাগলটাকে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি করে এত নিঃশব্দে কাজ সারা বাঘের পক্ষে সম্ভব?

তিনি বললেন, আমি নিচে নামছি। দেখে আসি ছাগলটা কি হল।

ভার্মা ভয়-কম্পিত দ্রুত গলায় বললেন, আপনার এখন নিচে নামাটা কি ঠিক হবে? বিশেষ করে এই অন্ধকারে—কিছুই বলা যায় না, হয়ত কোথাও ওত পেতে বসে আছে বাঘটা।

হাসলেন কন্দর্প চৌধুরী।

বললেন, তোমাদের ভাষায় বাঘটা যখন ভূতে-পাওয়া, সুতরাং এই মাচাতেও এসে আমাদের ঘাড় মটকাতে পারে। অন্ধকারে ওত পেতে বসে থাকবার দরকার কি? যাক, নামছি। তোমরা চিন্তা কর না—এই মার্টিন হেনরী রাইফেলটি আমার অনেক দিনের বন্ধু। বহু বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। এবারও যদি বিপদ আসে সে নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করবে।

তিনি মাচা থেকে নেমে গেলেন।

মিঃ ভার্মা ও লালের মনে হল, অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন যেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ঝিল্লির ঐকতান ছাড়া, দূরে ও কাছে শুকনো পাতার মর্মর-ধ্বনি কানে আসছে শুধু।

হঠাৎ—

হঠাৎ পর পর দুবার গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের আর্তনাদ।

আবার চুপচাপ।

আটশেলের হান্টিং টর্চ জেবলে উদ্বিগ্ন চিত্তে মাচার ওপর বসে রইলেন ভার্মা ও লাল। নামবেন কি নামবেন না—ইতি-উতি করতে লাগলেন তাঁরা।

মাচার কাছ থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে কন্দর্প চৌধুরী। বলাই বাহুল্য, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই এতটা পথ অতিক্রম করেছিলেন তিনি।

অতর্কিতেই ঘটনাটা ঘটে গেল। বিশ্রী একটা গন্ধ তার নাকে আসছিল। বাঘের গন্ধের সঙ্গে অপরিচিত নন তিনি। কন্দর্প অনুমান করে নিলেন, বাঘটা কাছাকাছিই কোথাও আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রক্তলোলুপ বিভীষিকাটা তাঁর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। থাবার প্রচণ্ড আঘাতে কাঁধের একদিকের হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল বোধহয়।

তবু অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়েই পর পর দুবার গুলি করলেন কন্দর্প।

প্রচণ্ড গর্জন করে বাঘটা পড়ল এক ধারে। অমিত বলে নিজেকে সংযত করে কন্দর্প টলতে টলতে এগিয়ে চললেন।

কাঁধের ক্ষত থেকে অবিরাম রক্ত পড়ছে। সারা শরীরটা ঝিম ঝিম করছে তাঁর।

তারপর কিভাবে যে তিনি হান্টিং হাউসে গিয়ে পেঁছালেন তার বর্ণনা দেওয়া এখন দুষ্কর।

কোনরকমে হান্টিং হাউসের দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন তিনি।

তারপর টলে পড়ে গিয়েছিলেন টানা বারান্দাটার একধারে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান আর তাঁর ফিরে আসেনি।

কাহিনী শেষ করলেন অম্বুজনাথ।

—কিন্তু এর সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপারের সম্পর্কটা কি? বাসব প্রশ্ন করল।

—দাদু মারা যাবার পর হান্টিং হাউস বন্ধ থাকত। কিন্তু তবু স্থানীয় লোকেরা রাতে বেরোলেই এই বাড়ি থেকে মানুষের সাড়া পেত—কত রকম কথাই শুনতে পাওয়া গেছে। আমরা অবশ্য এতদিন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইনি এই ব্যাপারের। তবে সেদিন সেই জ্বলন্ত মূর্তি দেখার পর আমাদের চক্ষু-কর্ণের সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন হয়ে গেছে।

—আচ্ছা, প্রচলিত ভৌতিক গল্পের কথা আপনাদের বাড়ির প্রত্যেকের জানা আছে না।

—হ্যাঁ। শুধু এ বাড়ির নয়—এ এলাকার সমস্ত লোকের।

—হুঁ। আপনি আপনাদের ব্যবসার কোন ডিপার্টমেন্টের কাজ দেখাশোনা করেন ?

—আমি কয়েক বছর ধরে কিছুই করছি না। নিউরাইটিসের মত হয়েছিল। এখন একটু সুস্থ আছি। কোম্পানি থেকে ভাতা পেয়ে থাকি।

—দীর্ঘ অবসর আপনার কাটে কি করে ?

—বই পড়ে। জবার সঙ্গে গল্প করে। জবা আমার মেয়ে। ওর বিয়ে হয়ে গেলে কি অসুবিধায় যে পড়ব, তাই এক সময় ভাবি—

বাসব বলল, আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না মিঃ চৌধুরী। বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখলাম আপনাকে।

—তাতে কি হয়েছে !

অম্বুজনাথ হাই তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কিরকম বুঝলে ডাক্তার ?

—ভদ্রলোক ভৌতিক ব্যাপারটার ওপর অত্যন্ত জোর দিলেন মনে হল।

—হয়ত তিনি খুব ভীতু লোক।

—আমার মনে হয়—শৈবাল বলল, হত্যাকারী প্রচলিত ভৌতিক গল্পটাকে আশ্রয় করে সকলকে ভয় দেখাচ্ছে।

বাসব সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনা করতে করতে বলল, তোমার অনুমানই বোধহয় ঠিক ! কিন্তু আমি ভাবছি, এই ভাবে ভয় দেখিয়ে বেড়াবার অর্থ কি ?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বেশ গুরু-ভোজন হয়েছে।

শৈবালের চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে। সে ব্ল্যাঙ্কেটটা ভাল করে গায়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুলো। বাসবের চোখে ঘুম নেই। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে।

সশব্দে একসময় দুটো বাজল কোথায়। বাসব বিছানা থেকে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শৈবাল তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ও ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এল।

ড্রইংরুমের গায়ে-লাগা দক্ষিণ দিকের ঘরখানায় অনিরুদ্ধ আছে। বাসব আগেই সন্ধান নিয়ে রেখেছিল। ও ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করল। অনিরুদ্ধ টেবিলের সামনে বসে কতকগুলো খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

—কি করছেন অনিরুদ্ধবাবু ?

অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকের ডাক শর্ট করছিলাম।

টেবিলের ওপর খাম ও পোস্টকার্ডের স্তূপ দেখে বাসব বলল, রোজ এত চিঠি আসে ?

—তাও তো, ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্রগুলি এর মধ্যে নেই। সেগুলো কারখানাতেই বিলি হয়।

একটা কথা ছিল অনিরুদ্ধবাবু !

অনিরুদ্ধ চোখ তুলে বাসবের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—আপনাকে এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই।

—বেশ তো করুন।

—আমি যতদূর জানতে পেরেছি, দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলার প্রথম দিকে আপনি বাড়ি ছিলেন না। কোথায় গিয়েছিলেন ?

—একটা কাজে শহরের মধ্যে মেন বিল্ডিং-এ গিয়েছিলাম।

—কিন্তু ঊর্ণাদেবী আহত হওয়ার সময় আপনাকে ঘটনাস্থলে দেখা গেছে।

—আমি হান্টিং হাউসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিভে যায়—একটা চিৎকার শুনতে পাই। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে টর্চটা নিয়ে ওপরে যাই।

—আপনি সেই জ্বলন্ত মূর্তি দেখেছিলেন ?

—আচ্ছা, আপনি যখন টর্চ হাতে করে উঠেছিলেন, সেই সময় কাউকে নিচে নামতে বা ওপরে উঠতে দেখেছিলেন ?

একটু ইতস্ততঃ করে অনিরুদ্ধ বলল, মিস্টার চৌধুরীকে আমি নেমে যেতে দেখেছিলাম।

—পুরন্দরবাবুকে ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল অনিরুদ্ধ।

—আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন ?

—বছর দুয়েকের কিছু বেশি।

—তার আগে কোথায় ছিলেন ?

—বেকার ছিলাম। দৈবাৎ টুণ্ডুলা স্টেশনে আমার সঙ্গে পুরন্দরবাবুর আলাপ হয়। উনিই আমায় চাকরি দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন।

—এবাড়ির সকলের মধ্যে বেশ সদ্ভাব আছে ?

—সকলের মধ্যেই আছে। শুধু অম্বুজবাবুর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর সবসময় একটা খিটিমিটি লেগে থাকে।

—কেন ?

—টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারেই। অম্বুজবাবু বেশ মোটা মাসোহারা পান, তবু প্রতি মাসেই পাঁচ-সাতশো টাকা দাবি করেন। এই নিয়েই বিবাদ।

—কি করেন এত টাকা নিয়ে ?

—ভগবান জানেন !

বাসব কথার মোড় ঘোরাল। রোজ কার বেশি চিঠি আসে ?

অম্বুজবাবুর। এই দেখুন না, আজই আটখানা চিঠি ওঁর এসেছে।

বাসব সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে, পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, দেশলাইটা ঘরে ফেলে এসেছি মনে হচ্ছে। আপনার কাছে একটা দেশলাই আছে নাকি?

—আমি তো সিগারেট খাই না। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি!

অনিরুদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসব একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা খাম তুলে নিয়ে পকেটে রাখল।

অনিরুদ্ধ ফিরে এল মিনিট দুয়েকের মধ্যে।

তার হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেট ধরাল বাসব।

তারপর বলল, চলি ভাই। পরে আবার কথা হবে।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অনিরুদ্ধ আবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজে আজকাল মন বসতে চায় না। ঘুরে-ফিরেই ঊর্ণার কথা মনে পড়ে। আদিত্য রায় তাকে কি কঠিন পরীক্ষায় ফেলে গেছেন। শুধু কি পরীক্ষা—অনিরুদ্ধ ভেবে দেখে, ঊর্ণার ওপর সেদিন থেকেই একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছে সে। কিন্তু…

ঠিক এই সময় অভাবনীয় ভাবে লঘু পায়ে ঊর্ণাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ওর দিকে।

ঊর্ণা শান্ত গলায় বলল, একটা কথা জানতে এলাম।

—বলুন?

—বাবার একটা চিঠি আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলাম। মা জানতে চেয়েছেন, কি লিখেছিলেন তিনি আপনাকে।

—কিন্তু সুজাতাদেবীর তো এই চিঠিটার বিষয় অজানা থাকারই কথা।

—কাল রাত্রে আমিই তাঁকে বলেছি। আমারও ভয়ানক আগ্রহ রয়েছে। বলুন, বাবা আপনাকে কি লিখেছিলেন। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু তাঁর আসন্ন?

অনিরুদ্ধ সঙ্কোচের সরোবরে হাবুডুবু খেতে লাগল, আমি চিঠিটা দিচ্ছি, আপনি পড়ে দেখুন।

ড্রয়ার থেকে আদিত্য রায়ের চিঠিটা বার করে ঊর্ণার হাতে দিল সে।

ঊর্ণা পড়ছে চিঠিখানা। অনিরুদ্ধ ওঁর মুখের দিকে তাকাল। ওর সুন্দর মুখের ওপর কে যেন ক্রমেই আবির মাখিয়ে দিচ্ছে। চিঠি পড়া শেষ হল।

দুজনেই নীরব। একটা নিদারুণ লজ্জায় ও সঙ্কোচে তারা দুজনেই মূক হয়ে রইল। বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল।

শেষে দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল উর্ণা। নরম গলায় বলল, আমি যাই—

অনিরুদ্ধ কয়েক পা এগিয়ে গেল ওর দিকে।—মাকে কি বলবেন? ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যখন জিজ্ঞেস করবেন—

—মাকে? বলব, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, এ ছাড়া আর আমি কি বলতে পারি!

—আদিত্যবাবু আপনার ওপর খুব সুবিচার করেছেন কিনা, সে-বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে—অনিরুদ্ধ সংযত কণ্ঠে বলল, তবে আপনার পাশে দাঁড়াবার কতখানি যোগ্যতা আমার আছে, সে বিচার অবশ্যই আপনি করতে পারেন। আমি এলাহাবাদের এক অর্ফ্যান হাউসে মানুষ হয়েছি। পরিচয়হীন জাত-গোত্রহীন সমাজের উচ্ছিষ্ট। কাজেই···

উর্ণা বাধা দিল। কণ্ঠে রূঢ়তা প্রকাশ পেল ওর, জাত-গোত্রই যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিমাপ নয় অনিরুদ্ধবাবু। আমি যাই—

দ্রুতপদে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিস্ময়ে ভেঙে-পড়া মন নিয়ে উর্ণার চলে-যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধের ঘর থেকে বেরিয়ে বাসব খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

খাবার-ঘরে টেবিলের ওপর তখনো এঁটো থালা-গেলাস বাটি ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। একটা চাকর ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। বাসবকে দেখেই সে বিড়িটা ফেলে দিয়ে থতমত মুখে তার দিকে তাকাল। বাসব ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে নিচু গলায় কি বলল। সে ভীতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল।

বাসব সেখানে আর অপেক্ষা না করে ফিরে চলল, সিঁড়ির মুখেই শেখর ও সৌরভের সঙ্গে দেখা হল তার। ওরা এগিয়ে এল ওর দিকে।

—আমি আবার আপনাদেরই খোঁজ করছিলাম। আসুন, ড্রইংরুমেই বসা যাক। বাসব মৃদু হেসে বলল।

তিনজনে ড্রইংরুমে এলেন।

বসলেন এক একটি কোচে।

শেখর বলল, কেসটার কতদূর কি হল মিঃ ব্যানার্জি?

—গুটি গুটি পা পা করে এগুচ্ছি।—বাসব বলল, আপনিই কি শেখরবাবু?

—হ্যাঁ।

—আপনিই তো প্রথমে ধরতে পারেন আদিত্যবাবু মারা গেছেন?

—একজন ডাক্তার হিসেবে আমার চোখে প্রথমে তাঁর মৃত্যুটা পড়ে।

—আপনি ডাক্তার? এখানে প্র্যাকটিশ করেন?

—আমি আমাদের কারখানার পেড ডাক্তার ।

—দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলায় আপনি কোথায় ছিলেন ?

—কারখানায়—আমার নিজের ঘরে ।

—সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত আপনাকে কারখানায় থাকতে হয় ?

—মাঝে মাঝে থাকতে হয় ।

বাসব মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনিই বোধহয় সৌরভবাবু ?

—হ্যাঁ ।

—আমি খবর পেয়েছি দুর্ঘটনার দিন আপনিও ড্রইংরুমে উপস্থিত ছিলেন না । কোথায় ছিলেন ?

সৌরভ দৃঢ় গলায় বলল, আপনি ভুল শুনেছেন । আমি ড্রইংরুমে উপস্থিত ছিলাম । তবে সন্ধ্যার কিছু পরে ঝরণার দিকে গিয়েছিলাম একবার ।

—ঝরণায় ?

—হান্টিং হাউসের কাছে । বহতা ঝরণা আছে । আমার খুব ভাল লাগে জায়গাটা । বৃষ্টির মধ্যেও আমি ওখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি ।

—আই সি—। আচ্ছা, এই বাড়িতে যে সমস্ত ভৌতিক কাণ্ড ঘটেছে, সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি । আজকের এই বিজ্ঞানের যুগেও যে এই ধরনের কাণ্ড ঘটতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ।

—শেখরবাবু আপনার অভিমতটা কি ?

—ভূত আমি বিশ্বাস করতাম না । তবে যে সমস্ত কাণ্ড-কারখানা ঘটছে, তাতে মনের মধ্যে যে ভয়-ভয় বোধ করছি না—একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে ।

—হুঁ । আপনি ডাক্তারি পাস করেছেন কোথা থেকে ?

—কলকাতা থেকে । তারপরই কারখানায় যোগ দিয়েছি ।

—আপনাদের তো এত টাকা, ইংলণ্ড থেকে এম. আর. সি. পি. হয়ে আসেননি কেন ?

শেখর একটু হেসে বলল, ডিগ্রীর ওপর আমার খুব-একটা লোভ নেই মিঃ ব্যানার্জি । গঠনমূলক কাজেই আমার আগ্রহ বেশি । কিছু একটা গড়ে তুলতে চাই । মানে—

নড়ে-চড়ে বসে বাসব বলল, গঠনমূলক কাজ কিছু করছেন নাকি ?

—প্ল্যান সব ঠিক হয়েই আছে । একটা ওষুধের কারখানা করব । আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ।

—চমৎকার আইডিয়া । তবে এই রকম একটা কারখানা গড়ে তুলতে অনেক টাকার দরকার—অবশ্য চৌধুরী কনসার্নের টাকার অভাব নেই ।

—কারখানাটা আমি ইন্ডিভিজুয়ালি গড়ে তুলতে চাই । আপনি জানেন,

অর্ধেক রোগের ভাল ওষুধ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। এত টাকা থাকা সত্ত্বেও আমার মা গ্যাংগ্রীনে মারা যান। সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ভাল একটা ওষুধের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবই।

পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠল।

বাসব সমবেদনার সুরে বলল, আপনার মা'র এইভাবে মৃত্যু সত্যিই দুঃখজনক।

শেখর নিজের গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, টাকার কথা বলছেন? কাকা দেবেন টাকাটা। আমি ছাড়া আর কে আছে বলুন?

—কাকা অর্থাৎ পুরন্দরবাবু? ওঃ। আচ্ছা, দরকার হলে নিশ্চয়ই বাড়ির লোকেরা আপনার কাছ থেকে ওষুধপত্র নিয়ে থাকেন?

—ছোটখাট রোগে সকলেই আমার সাহায্য নিয়ে থাকেন। বাড়াবাড়ি হলে ডাঃ সোমপ্রকাশকে ডাকা হয়।

—সম্প্রতি কেউ আপনার কাছ থেকে কোন ওষুধ নিয়েছেন?

—ছোড়দাদু আমার কাছ থেকে একটা পেনকিওর মেডিসিন নিয়েছিলেন।

—কে, চন্দ্রকান্তবাবু? কবে?

—খুন হওয়ার পরের দিনে!

—কি হয়েছিল তাঁর?

এবার সৌরভ উত্তর দিল, বুড়ো আঙুলটা কেটে গিয়েছিল।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

ওদের দিকে এগিয়ে ধরল প্যাকেটটা।

শেখর বলল, আমি সিগারেট খাই না।

—আমিও না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, ভূতে এই কাণ্ড করেছে—একথা আপনারা বিশ্বাস করেন?

ওরা দুজনেই চুপ করে রইল।

—আমি উঠি। পরে আবার দেখা হবে।

সন্ধ্যা হয়েছে অনেক আগেই।

এখন সাতটা।

জবা নিজের ঘরে বসে আনমনে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

ঊর্ণা ছিল এতক্ষণ। জমিয়ে গল্প করছিল দুজনে। সুজাতার ডাকে মিনিট দশেক হল উঠে গেছে ও। সৌরভ ঘরে প্রবেশ করল।

মুখে-চোখে ত্রস্ত ভাব তার।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে জবার কাছে এগিয়ে বলল, তৈরি আছ নিশ্চয়ই?

—আমার ভীষণ ভয় করছে।

—ভয় ? এখন ভয়টয় করলে চলবে না। তীরে এসে তরী ডোবাতে চাও নাকি ?

—কিন্তু···

—শোন জবা, এই রিস্ক নিতে আমি প্রথমে রাজি হইনি। শুধু তোমার কথাতেই প্ল্যানটা আমাকে এই ভাবে চক-আউট করতে হয়েছে। তুমিই তো বলেছিলে, সকলের চোখের আড়ালে এই ভাবে থাকার চেয়ে, একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা অনেক ভাল।

জবা সৌরভের একটা হাত চেপে ধরে বলল, রাগ কর না লক্ষ্মীটি। বাবা যখন কিছুতেই মত দেবেন না তখন এছাড়া আর উপায় কি ? কিন্তু তবু সময় যত এগিয়ে আসছে ততই ভয় করছে আমার।

সৌরভ অস্থির গলায় বলল, ভয়কে এখন চুলোর দোরে পাঠিয়ে যথাসময়ে গেটের বাইরে যাবে, বুঝলে ! আমি এখন চলি। কেউ হয়ত এসে পড়তে পারে।

সৌরভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আরো এক ঘণ্টা পরে।

বাগানের বাউণ্ডারি-ওয়াল ঘেঁসে নাম-না-জানা লতার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসব। শৈবালও সঙ্গে রয়েছে। চারিধারে অজস্র জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে নিজেদের টিমটিমে আলোর পশরা নিয়ে।

গ্রেটকোটের কলারটা আরো তুলে দিয়ে শৈবাল বলল, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেলাম হে। কতক্ষণ আর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

রিস্টে সংযুক্ত সি মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, কিছুই বলা যায় না। আমি ভূত দেখতে চাই ডাক্তার। তাইতো শহরে যাবার নাম করে এখানে এসে লুকিয়ে আছি।

—কেন, বাড়িতে থাকলে কি হত ?

—আমার ধারণা আমার উপস্থিতিতে ভূত মহাপ্রভুর আগমন কোন মতেই হবে না।

ঠাণ্ডায় ভাল কথা বলা যাচ্ছে না। দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে।

আধঘণ্টাটাক আরো কাটল।

বাসব বলল, এস, আমরা বাড়িটার আরো কাছে যাই।

ঝোপের মধ্য থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

সন্তর্পণে ড্যাডনডোনিয়ার বেড়া ঘেঁসে এগিয়ে চলল দুজনে।

গজ কুড়ি যাবার পরই কিন্তু ওদের গতি রুদ্ধ হল।

বেড়ার ওপাশে কারা যেন চাপা গলায় কথা কইছে। গলার আওয়াজ চেনা

যাচ্ছে না। শীতের কাঁপুনিতে গলার আওয়াজ কেঁপে কেঁপে বেরুচ্ছে।

বেড়ার একপাশে গুঁড়ি মেরে বসে, কান খাড়া করে রইল বাসব আর শৈবাল।

কথা হচ্ছে—

—এখন আমার পক্ষে আর টাকা যোগাড় করা সম্ভব হবে না। আপনি কাজটা করে দিন, আমি বরং পরে····

—কাজ ফুরিয়ে গেলে কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

—আমি সে জাতের নই। নেহাত বুড়োকে রাজি করানো যাচ্ছে না তাই, নইলে আপনার সাহায্য আমি মোটেই নিতাম না। এক রাত্রের একটা ব্যাপারের জন্যে আপনি যে এত দরাদরি করবেন আগে ভাবতে পারিনি।

—রিস্কের ব্যাপার, তাই একটু দরাদরি করতে হচ্ছে। যাক, তোমার ওপর বিশ্বাস রাখলাম। কাজটা মিটে গেলে হাজার দেড়েক টাকা আমাকে আরো দিও।

—দেব। আপনি তাহলে চলে যান। ঠিক জায়গায় সে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।

আর কোন কথা শুনতে পাওয়া গেল না।

অখণ্ড নীরবতা নেমে এল বেড়ার ওপাশে।

মিনিট দশেক আরো কেটেছে বোধহয়।

বাসব বুঝতে পেরেছে, ও পাশের কথোপকথনরত লোকদুটি আর ওখানে নেই। কথাবার্তা শেষ করেই তারা সন্তর্পণে সরে পড়েছে।

ঠিক এই সময় হাণ্টিং হাউস থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

বাসব ও শৈবাল তাকিয়ে দেখল, পুরো বাড়িটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে।

বিক্ষিপ্ত মন দিয়ে আজ সারাটা দুপুর কেটেছে ঊর্ণার।

অনিরুদ্ধর কথা বার বার মনে পড়েছে, সতেজ প্রাণময় অনিরুদ্ধ। আদিত্য রায় ওর যে ভবিষ্যৎ স্থির করে গেছেন, তা সে সানন্দে মেনে নেবে তা কি অনিরুদ্ধ বুঝতে পারেনি?

এইভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। তারপরে এক সময় সন্ধ্যাও ঘন হয়ে এল।

ঊর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল।

অনিরুদ্ধ এখন কি করছে কে জানে?

বারান্দায় এসে সবেমাত্র সে কয়েক পা এগিয়েছে। হঠাৎ আলোটা নিভে গেল।

দারুণ ভয়ে ঊর্ণার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। সেদিনকার সেই

ভয়াবহ স্মৃতি নতুন বিভীষিকা নিয়ে জেগে উঠল ওর মনের মধ্যে।

ঊর্ণা দ্রুত পায়ে ঘরের দিকে ফিরে চলল। কিন্তু ঘর অবধি আর পৌঁছান গেল না। মূর্তিমান আতঙ্কের মত সেই জলন্ত মূর্তি তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

—না··· না··· না···

ঊর্ণা দিক পরিবর্তন করে দ্রুত সিঁড়ির দিকে দৌড়তে লাগল। জ্বলন্ত মূর্তিও তাকে অনুসরণ করল। ঊর্ণা যেন জ্ঞানহারা—সে কোথায় চলেছে নিজেই জানে না। শুধু ওই জ্বলন্ত অভিশাপের হাত থেকে সে বাঁচতে চায়। কিন্তু·

বাসব ও শৈবাল হান্টিং হাউসে এসে পৌঁছল, সমবেতকণ্ঠের একটা ভয়ার্ত চিৎকার তখনও চলেছে। চারধারে গাঢ় অন্ধকার। আলো জ্বলে উঠেনি তখনও।

পোর্টিকোতে এসে কিন্তু ওরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার অবকাশ পেল না। অবিশ্বাস্য রকমের একটা দৃশ্য ওদের চোখে ধরা দিল। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত মূর্তি। তার সারা গায়ে থোকা থোকা আগুন যেন আটকে রয়েছে।

বাসব ও শৈবালের হাত দশেক দূর দিয়ে মূর্তিটা দ্রুত বাড়ির পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর যেন অন্ধকারকে বিদ্রূপ করেই আলো জ্বলে উঠল তারপরই।

শৈবাল বিস্মিত গলায় বলল, তুমি ওকে যেতে দিলে বাসব?

- ওকে ধরা যেত না ডাক্তার। তাছাড়া ওর কাছে কোন অস্ত্র থাকলে আমরাই বিপদে পড়তাম।

—আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। জবাদেবী আসছেন। আমাদের দেখতে পেলে হয়ত লজ্জায় পড়বেন।

শৈবাল মুখ ফিরিয়ে দেখল, গেটের দিক থেকে জবা একটা ছোট সুটকেশ হাতে করে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বাসব ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে। শৈবাল ওকে অনুসরণ করল।

বারবার এই ভৌতিক কাণ্ডে ভয়ে-ভাবনায় সকলেই একেবারে কেমন ভয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

ড্রইংরুমে জড়ো হয়ে সকলেই ভীত ভাবে জল্পনা করছিলেন।

শুধু পুরন্দর চৌধুরী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। একের পর এক এ সমস্ত কি ঘটে যাচ্ছে তাঁদের বাড়িতে।

এক সময় চন্দ্রকান্ত বলে উঠলেন, ঊর্ণাকে দেখতে পাচ্ছি না, সে গেল কোথায়?

—তাইতো, ঊর্ণা নেই। শুধু ড্রইংরুমেই নয় খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির

কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সুজাতাদেবী। কোথায় গেল ঊর্ণা!

শেষপর্যন্ত পুলিসে খবর দেওয়া হল।

ইন্সপেক্টার রায়সুরানা এলেন।

গম্ভীর মুখে সমস্ত শুনলেন, তারপর তিনি বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন কিছুর হদিস পাচ্ছেন?

—অন্ধকার একটু ফিকে হয়েছে। আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। আশা করছি, কালকের মধ্যেই কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ আপনাকে জানাতে পারব।

রায়সুরানা এই মাত্র হান্টিং হাউস থেকে বিদায় নিয়েছেন।

ঊর্ণার রহস্যজনক অন্তর্ধানের ওপর তিনিও কোন আলোকপাত করতে পারেননি।

বাসব ও শৈবাল নিজের ঘরে ফিরে এল।

বেশ রাত হয়েছে।

বাসব বাগানের দিকে জানলাটা খুলে দিল। হু-হু করে একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। জানলাটা বন্ধ করে দাও—শৈবাল বলল।

—মাথাটা বরং ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে। তুমি এদিকে এস।

শৈবাল জানলার কাছে এগিয়ে গেল।

বাসব বাগানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, কি দেখতে পাচ্ছ?

—জোনাকি। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অজস্র জোনাকি দেখা যাচ্ছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

বলল, দেশবিদেশ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনো থাকলে অনেক সময় অনেক রকমের সুবিধা হয় ডাক্তার।

—তাতো হয়ই।

—ব্রাজিলের একটা সিস্টেমের কথা তোমায় বলব ভাবছি।

—বল?

—তুমি শুনলে অবাক হবে, ওখানকার মেয়েরা ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে উৎসব ইত্যাদিতে নিজেদের আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।

—কি রকম?

—তারা জোনাকি-পোকা সংগ্রহ করে, ছোট ছোট পাতলা কাপড়ের থলিতে ভরে নিজেদের পায়ের গোছা থেকে শুরু করে মাথায় চুল পর্যন্ত সমস্ত শরীরে আটকে দেয়। তখন তাদের দেখায় জ্বলন্ত মূর্তির মত।

শৈবাল উত্তেজিত গলায় বলল, তুমি বলতে চাও এখানকার ভৌতিক মূর্তিও ওইভাবে—

—আজকে মহাপ্রভুকে দর্শন করবার পর আমার আর ও সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ব্যাটারির সাহায্যে সারা গায়ে ছোট ছোট বাল্ব লাগিয়ে কেউ এই কেরামতি দেখাচ্ছে। কিন্তু···

কিন্তু জোনাকির আলো তো এত উজ্জ্বল হবার কথা নয়। মোমবাতির দশো ভাগের এক ভাগ তেজ মাত্র ওদের আলোয়।

—তোমার যুক্তিতে জোর আছে। তবে এর উত্তরও আমার কাছে রয়েছে ডাক্তার। লুসিফার্নি নামে একটা জিনিস জোনাকিদের গায়ে আছে বলেই আলো বেরোয়। আবার ল্যাভেন্ডার জাতীয় কোন জিনিস যদি লুসিফার্নের সংস্পর্শে আসে, তাহলে আলোর উজ্জ্বলতা অনেক বেড়ে যায়। ঊর্ণাদেবী তো আমাদের বলেছেন, তিনি একটা মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সে গন্ধ ল্যাভেন্ডারের।

—আমার মনে হয়—শৈবাল বলল, যে ভূত সেজে এই ভাবে দেখা দিচ্ছে, তার আসল উদ্দেশ্য হল কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ভয় দেখান।

—হিয়ার, হিয়ার! কিছুটা মাথা খেলিয়েছ তাহলে! এখন আরেকটু ভেবে বল, কাকে সে ভয় দেখাচ্ছে?

—আর ভাই এলেমে কুলবে না—তুমি বল।

—জ্বলন্ত মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে তিনবার। প্রথমবার দেখেছিলেন, সুজাতাদেবী, ঊর্ণাদেবী আর পুরন্দর চৌধুরী। সেবার মূর্তির আবির্ভাব ঘটবার আগে, আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাচভাঙার শব্দ হয়েছিল। আমার মনে হয় কাচ-ভাঙার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ঊর্ণাদেবীকে কেন্দ্র করেই যা কিছু ভৌতিক কাণ্ডকারখানা হবার হল। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত, তিনবারই আদিত্য রায়ের পরিবারের ওপর জ্বলন্ত মূর্তির দৃষ্টি ছিল।

—তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—শৈবাল বলল, ভয় দেখিয়ে ওদের কেউ এখান থেকে তাড়াতে চায়।

এই সময় কে দরজায় আঘাত করল।

এত রাত্রে আবার কে এল!

—কে?

—আমি অনিরুদ্ধ।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল অনিরুদ্ধ। তার শুকনো মুখ, উসকো-খুসকো চুল।

—ঊর্ণা কোথায় গেল বাসববাবু?

—এখন সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে—

—ওকে কি আর পাওয়া যাবে না ?

—নিশ্চয়ই যাবে। আপনার মানসিক অস্থিরতা আমি অনুভব করতে পারছি। অনিরুদ্ধবাবু, অস্থির হবেন না। এখন গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

অনিরুদ্ধ আর কিছু না বলে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

—ভাল কথা—বাসব আবার বলল, জবাদেবীর সঙ্গে কারুর ইয়ে-টিয়ে আছে নাকি ?

—সৌরভবাবু ও জবাদেবী পরস্পরকে ভালবাসেন।

—নিশ্চয়ই তাঁদের বিয়ে হবে ?

—চন্দ্রকান্তবাবু বিয়ের কথা তুলেছিলেন কিন্তু সৌরভবাবুর সঙ্গে জবা-দেবীর বিয়ের প্রস্তাব অম্বুজবাবু বাতিল করে দিয়েছেন।

—ধন্যবাদ অনিরুদ্ধবাবু। আমি এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম। আপনি এই ঘরেই একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট কুড়িক পরে ফিরে এল বাসব।

মুখে ওর সাফল্যের হাসি।

বলল, আমি খোঁজ না করলেও ঊর্ণাদেবী কাল সকালে ফিরে আসতেন।

—তুমি ওঁর সন্ধান পেয়েছ ? শৈবাল প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ।

অনিরুদ্ধ সাগ্রহে বলল, কোথায়—কোথায় আছে ও ?

—ঝরণার কাছে ফরেস্ট ওয়াচ-ম্যানের যে পরিত্যক্ত ঘর আছে ঊর্ণাদেবীকে ওখানে আটকে রাখা হয়েছে।

অনিরুদ্ধ আর কিছু না বলে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—চল আমরাও যাই—

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কোন প্রয়োজন নেই। অনিরুদ্ধবাবু একাই ঊর্ণাদেবীকে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন।

ওয়াচ-ম্যানের পরিত্যক্ত ঘরখানার কথা অজানা ছিল না অনিরুদ্ধর।

বহুবারই সে পুরন্দর চৌধুরীর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করেছে। শিকার থেকে ফিরে কতদিনই তিনি অনিরুদ্ধর আনা কফি বা অন্য পানীয় গ্রহণ করেছেন ওখানে বসে।

হান্টিং হাউস থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

অন্ধকারের মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে অনিরুদ্ধ সেখানে গিয়ে পৌঁছাল।

ঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে বন্ধ করা ছিল।

শিকল নামিয়ে দরজাটা খুলল অনিরুদ্ধ।

ব্যগ্র গলায় বলল, ঊর্ণা—

ঊর্ণার জ্ঞান হয়েছিল একটু আগেই!

ভয়ে আধমরা হয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে শুয়েছিল একটা খাটিয়ায়।

হঠাৎ ডাক শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। কে ডাকছে—অনিরুদ্ধর গলা না।

—কে ?

—আমি অনিরুদ্ধ।

উর্ণার বুকের মধ্যে রক্ত নেচে উঠল। ওকে উদ্ধার করতে এসেছে, ওরই একান্ত আপনার জন অনিরুদ্ধ।

সে খাটিয়া থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মুখোমুখি হল দুজনে।

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। উর্ণাকে সবলে জড়িয়ে ধরল অনিরুদ্ধ।

—উর্ণা আমার উর্ণা···

পরের দিন।

এখন বেলা নটা।

উর্ণাকে কাল শেষ রাত্রে অনিরুদ্ধ ফিরিয়ে এনেছে।

সে এখন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছে।

বাড়ির আর সবাই ড্রইংরুমে জড়ো হয়েছেন। সকালের চা-পর্ব শেষ হয়েছে কিছু আগে। সবাই নির্বিকার ভাবে বসে রয়েছেন। এই ভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সকলেই বিভ্রান্ত।

বাসব ও শৈবাল ঘরে এল।

শেষে চন্দ্রকান্তই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বিদ্রূপ ঢেলে দিয়ে বাসবকে বললেন, আমার ধারণা ছিল আপনি এসেই বুঝি এই হত্যাকাণ্ডের একটা নিষ্পত্তি করতে পারবেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনার উপস্থিতিতেই আতঙ্ক আরো বেড়ে চলেছে।

বাসব সকলের দিকে তাকাল একবার। তারপর মৃদু হেসে বলল, আপনার অভিযোগে সত্যতা রয়েছে তবে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে যেমন যুদ্ধ করা যায় না, তেমনই জটিল কোন তদন্তে এসে ঘটনা-স্থলের সাক্ষীদের থেকে যদি সম্পূর্ণ সাহায্য না পাওয়া যায়, তাহলে তদন্তের কিনারা হতে সময় লাগে বৈকি।

বিস্মিত কণ্ঠে পুরন্দর চৌধুরী বললেন, আমরা কি কেউ আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করিনি ?

—সেইটাই তো আমারও প্রশ্ন মিস্টার চৌধুরী। বেশ আপনিই বলুন, ড্রইংরুম থেকে আপনার দোতলার ঘরে পেঁছিতে কতটা সময় লাগে ?

—খুব জোর মিনিট দুয়েক।

—আমার ধারণাও তাই। বাসব ঘুরে দাঁড়াল চন্দ্রকান্তর দিকে, আপনার বিদ্রূপটা এবার আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমাকে এতটা বিপথগামী করা কি আপনার উচিত হয়েছে?

—আ-আমি··

—শুনলেন তো, ড্রইংরুম থেকে পুরন্দরবাবুর ঘরে যেতে মাত্র দু'মিনিট সময় লাগে, অথচ আপনার লেগেছিল বার মিনিট। কেন?

—কি বলছেন, আপনি? কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, বুঝতে চেষ্টা করুন। ড্রইংরুম থেকে পুরন্দরবাবুর ঘরে যাওয়ার উদ্দেশে আপনি বেরিয়ে ছিলেন পৌনে আটটায়। পুরন্দরবাবুর মুখে শুনেছি, আপনাদের কথা হয়েছিল মিনিট তিনেক। আবার আপনি বলছেন, আলো নিভেছিল আটটার সময়। তাহলে ধরে নিতে হয়, সাতটা সাতান্ন থেকে আটটা অবধি আপনাদের কথা হয়েছিল। এখন আপনিই বলতে পারবেন, বাকি বার মিনিট আপনি কোথায় ছিলেন।

চন্দ্রকান্তবাবু নীরব রইলেন। ঘরের আর সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

বাসব আবার বলল, আপনাকে আমি আরো একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সেদিন আপনি আমায় বলেছিলেন, আপনার বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল ব্লেডে কেটে গেছে। কিন্তু আমি খবর পেয়েছি, শেখরবাবুর কাছ থেকে আপনি পেনকিয়োর নিয়েছিলেন। হাত কেটে গেলে কেউ পেনকিয়োর ব্যবহার করে না। তখন প্রয়োজন হয় টিন্চার আইডিন ইত্যাদির। এ-সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য?

চন্দ্রকান্ত নিজের নার্ভাস ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, আপনার প্রশ্নগুলোয় উত্তর কি আমায় দিতেই হবে?

—এই কথাগুলো পুলিসের কানে উঠলে আপনিই বিপদে পড়বেন।

—বেশ, তবে শুনুন। পৌনে আটটার সময় আমি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আদিত্যের ঘরের পাস দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল, ঘরের মধ্যে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে। আমি দরজা ফাঁক করে দেখলাম, বাগানের দিকের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অম্বুজ····

—মিথ্যে কথা—জড়ান গলায় তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন অম্বুজনাথ। —আমি আদিত্যদার ঘরে যেতে যাব কেন?

—হ্যাঁ তুমি, তোমাকেই আমি পরিষ্কার দেখেছি অম্বুজ। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কি একটা করছিলে যেন। আদিত্য তখন চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে বসেছিল। বোধহয় মারা গিয়েছিল—

—কাকা, তুমি বলতে চাও আমি আদিত্যকে খুন করেছি। অম্বুজনাথের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে।—সৌরভের সঙ্গে জবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে তুমি। আমি তাতে রাজি হইনি। এইভাবেই তার প্রতিশোধ নিচ্ছ তুমি?

—তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। কাকাকে কথাটা শেষ করতে দাও।

তারপর যুক্তিতর্ক দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দাও, উনি যা বলছেন তা মিথ্যে। পুরন্দর চৌধুরী বললেন ।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ওই দৃশ্য দেখে আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। দরজাটা ভেজিয়ে দেবার সময় পাল্লা দুটো লেগে আমার বুড়ো আঙুলটা চিমটে যায়। তারপর আমি পুরন্দরের ঘরে যাই।

চন্দ্রকান্ত কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাসব বলল, অম্বুজবাবু, আমার একটা কথার উত্তর দিন, আপনি কোন কাজকর্ম করেন না, দীর্ঘ দিন ধরে বাড়িতে থাকায়, লয়ালপুরের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই—তবু আপনার নামে প্রায়ই এত চিঠি আসে কেন ?

অম্বুজনাথ আমতা আমতা করে বলেন, চিঠি ·· মানে ··

—কৌশলে আপনার একটা চিঠি আমি জোগাড় করেছি। তা থেকে জানতে পেরেছি, কোন ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যে আপনি ফাটকা খেলেন। না, না, অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি উপস্থিত আপনার খুব টান যাচ্ছে। টাকার বিশেষ দরকার, তাই ··। বাসব থামল। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একটি অপ্রীতিকর কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেদিন চন্দ্রকান্তবাবু আদিত্য রায়ের ঘরে অম্বুজনাথকে দেখেছিলেন ঠিকই। তিনি সে সময়···

—হ্যাঁ, আমি—আমি ছিলাম সেদিন—আত্মগতভাবেই অম্বুজনাথ বলে চললেন, আমার টাকার দরকার ছিল·· অনেক টাকার · একদিন দৈবাৎ দেখে ফেললাম, পুরন্দর আদিত্যকে অনেক টাকা দিচ্ছে ·· আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর সকলে যখন ড্রইংরুমে আমি তখন আদিত্যর ঘরে এলাম, দেখলাম, সে চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্বাস করুন, সে সময় আমি বুঝতে পারিনি সে মারা গেছে। আমি আগেই দেখে রেখেছিলাম, টাকাটা সম্পূর্ণ খোলা জায়গায় একটা ওভারনাইট ব্যাগে আছে। ব্যাগটা তুলে জানলা গলিয়ে ফেলে দিই বাগানে··· আমি চোর··· হ্যাঁ—ত্রিশ হাজার টাকা চুরি আমি করেছি · হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কন্দর্প চৌধুরীর রক্ত আমার শিরায় শিরায়, আমি চোর··· চোর···

পাগলের মত কথাগুলো বলতে বলতে অম্বুজনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এক অস্বস্তিকর মনোভাব নিয়ে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। কেউই এই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

শেষে বাসবই বলল, এই পারিবারিক ব্যাপার পুলিসের কানে না যাওয়াই ভাল। আপনারা সহজেই নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে নিতে পারবেন। কিন্তু এখনও বড়রকম সমস্যা আমাদের সামনেই রয়েছে। আদিত্য রায়ের হত্যাকারী এখনও অদৃশ্য। তবে আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। একটা

অনিচ্ছাকৃত সামান্য ভুলের দরুণ সে আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। এস ডাক্তার—

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—তুমি এইভাবে চলে এলে যে?

শৈবালের প্রশ্নে বাসব বলল, সকলের মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বোধহয় আমি তাতে সফল হয়েছি।

—তা না হয় হল। কিন্তু আজ তো তুমি ভানুমতীর খেল দেখালে হে!

—তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না ডাক্তার। আজকাল ভানুমতীর খেলে প্রচুর ভেজাল ঢুকেছে। কিন্তু আমি যখন তোমাকে চমক লাগাই, তখন তাতে কোন ভেজাল থাকে না। মাথার কসরত দেখাই, বুঝলে? এবার ভূমিকা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক্। কাল যখন আমরা ড্যাডান-ডোনিয়ার বেড়ার পাশে বসে দুটি লোকের কথাবার্তা শুনছিলাম, তখন একটা কথা আমার মনে দাগ কেটে ছিল। তা হল, একজন আর একজনকে বলল, বুড়োকে যে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। তারপর পোর্টিকোর কাছে আসতেই আমরা দেখলাম, জবাদেবী গেটের দিক থেকে বাড়ির দিকে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিল। সেই সন্দেহই চরম রূপ নিল অনিরুদ্ধবাবুর কথায়। তিনি যখন বললেন, সৌরভবাবুর সঙ্গে জবা-দেবীর বিয়ের কথা অম্বুজবাবু নাকচ করে দিয়েছেন।

—তখন তুমি আমাদের বসিয়ে রেখে সৌরভবাবুর ঘরে গেলে না কি?

—হ্যাঁ। গিয়ে সরাসরি তাঁকে চার্জ করলাম। তিনি ভয় পেয়ে আমার কাছে সমস্ত স্বীকার করেছেন, জবাদেবী ও সৌরভবাবু দুজনে দুজনকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু অম্বুজবাবুর আপত্তি এতে। তখন তাঁরা নিজেরাই বিয়েটা করে ফেলবেন ঠিক করেছেন।

—বাগানে তাহলে সৌরভবাবুই ছিলেন? কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁর সঙ্গে কে ছিলেন?

—মৃগাঙ্ক পালিত। টাকার জরুরী দরকার হওয়ায় নিজের ডিপার্টমেন্টের ক্যাস ভেঙ্গে সৌরভবাবু তাঁকে দিয়েছিলেন এই আশায় যে তাঁদের বিয়ের ব্যাপারে মৃগাঙ্ক পালিত সাহায্য করবেন। তাই তিনি মৃগাঙ্ককে অনুরোধ করেছিলেন অন্ততঃ একদিনের জন্য জবাকে লুকিয়ে রাখতে। যাতে চুপিচুপি বিয়েটা সমাধা করতে পারেন। আগে থেকেই প্রোগ্রাম ঠিক ছিল—জবাদেবী মৃগাঙ্কের জন্য বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেল জ্বলন্ত মূর্তির আগমনে, ঊর্ণাদেবী তার তাড়া খেয়ে কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন বোধহয়।—মৃগাঙ্ক পালিত জবাদেবী মনে করে তাঁকেই তুলে নিয়ে যান ওয়াচ-ম্যানদের পরিত্যক্ত ঘরে।

শৈবাল বলল, এসবের সঙ্গে খুনের সম্পর্ক কি ?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কিছুই না। সমসাময়িক ঘটনা হওয়ার খুনের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে মাত্র।

—ড্রইংরুমে তুমি বলে এলে হত্যাকারী তোমার পরিচিত। কে সে ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, অবশ্যই সে রক্তমাংসের মানুষ। শোন ডাক্তার, আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। তখনই চূড়ান্তভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে হত্যাকারীর স্বরূপ।

—অর্থাৎ ?

বাসব নির্বিকার ভাবে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে দিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। শৈবালের অনুমান করতে কষ্ট হল না, ও আর একটি কথাও বলবে না।

সেই দিনই দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে পুরন্দর চৌধুরী হঠাৎ বললেন, একনাগাড়ে বছরের পর বছর কারখানা আর বাড়ি করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। বিশ্রাম চান।

চন্দ্রকান্ত বললেন, বেশ তো, কিছুদিন রেস্ট নাও না। একঘেয়েমিটা কেটে যাবে তাহলে।

—আমিও তাই ভাবছি। ভারতের বাইরে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসি। তবে যাবার আগে কতকগুলো বিলি-ব্যবস্থা করে যেতে চাই। আজই সলিসি-টারকে চিঠি দিচ্ছি। আমার উত্তরাধিকারী আমি ঊর্ণাকেই মনোনিত করব।

মৃগাঙ্ক পালিত বললেন, তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন আর কোনদিন ফিরবেই না লয়ালপুরে।

--অনেকটা সেই রকমই মৃগাঙ্ক। চারধারের এই সমস্ত ব্যাপারে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আদিত্যের মত লোককেও যখন বেশি মাত্রায় কোডিন খাইয়ে কেউ মেরে ফেলতে পারে, তখন··· যাক—

ঘরের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। পুরন্দর চৌধুরীর এই ধরনের খামখেয়ালীপনার কি অর্থ কেউ বুঝতে পারলেন না। ঊর্ণাও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

আর কোন কথা হল না। নীরবে খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে গেলেন। অবশ্য অম্বুজনাথ এখানে উপস্থিত ছিলেন না।

পুরন্দর কিন্তু নিজের ঘরে গেলেন না। তিনি গেলেন সুজাতার ঘরে।

—আমি জানতাম, তুমি আসবে। ধীর গলায় সুজাতা বললেন।

—শোন সুজাতা, এখন লজ্জা-সঙ্কোচের সময় নয়। আমি সত্যিই চলে যাব--কিন্তু সকলের সামনে আমি যা বলতে পারিনি, এখন তা বলতে এলাম। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

—আমি—!

—হ্যাঁ, তুমি। আদিত্য তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গেছে—সে অনেক কথা। বলব এক সময়। শুধু…

—কিন্তু ঊর্ণা… ঊর্ণার কি হবে?

—অনিরুদ্ধর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তার ব্যবস্থা আমি করেছি।

কিন্তু তাঁদের কথা বেশিদূর এগোল না। বাচ্চা একটা চাকর এসে জানাল টেলিফোনে কে যেন ডাকছে পুরন্দর চৌধুরীকে।

তিনি উঠে গেলেন।

সারাটা বিকেল সকলেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন ঊর্ণা-অনিরুদ্ধর প্রসঙ্গ নিয়ে। সুজাতাই প্রকাশ করেছেন কথাটা সকলের কাছে।

বাসব দুপুরবেলাটা কতকগুলো হাতের ছাঁচ ও অনুবীক্ষণ-যন্ত্রটা নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। মাঝে শুধু একবার থানায় ফোন করেছিল। এখন তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। গুন্ গুন্ করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ও লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শৈবাল বলল, কিহে, তুমি যে একেবারে তানসেন হয়ে উঠলে!

—দেখ ডাক্তার, এখন আমার মনের যা হালকা অবস্থা, তাতে মির্জা গালিব হতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ও-কথা এখন থাক্। তার চেয়ে চল, ঝরণাটা একবার দেখে আসি।

—তোমার রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর যবনিকা পড়তে আর বিশেষ দেরি নেই।

—বলাই বাহুল্য। মোটামুটিভাবে কাজ আমার শেষ হয়েছে। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এখন আমি এইটুকু বলতে পারি, আজকের রাতটাই আমাদের এখানে শেষ রাত। কালকের যে কোন ট্রেনে কলকাতা রওনা হচ্ছি। এস—

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময় সকলে খাবার-ঘরে গেলেন ডিনারের জন্যে।

কারুর মুখে কথা নেই।

সকলেই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন।

তাছাড়া—

পুরন্দর চৌধুরী নিজের সম্পত্তি ঊর্ণাকে দান করার মনস্থ করায়, সকলের মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তির ভাব সৃষ্টি হয়নি—একথা বলা যায় না।

বাসব ও শৈবাল খাওয়ার টেবিলে অনুপস্থিত।

ওরা আজ আমন্ত্রিত রায়সুরানার কোয়ার্টারে।

সকলে ডিনারে যাওয়ার পরই বাগানের মরণিং গ্লোরির ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাসব। শৈবালও। কথাটা রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র।

আসলে রায়সনুরানার ওখানে কোন আমন্ত্রণই ছিল না ওদের।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওরা নিঃশব্দ পায়ে চাকরদের চোখ বাঁচিয়ে দোতলায় এল। টানা বারান্দার সঙ্গে যুক্ত পরপর ঘরগুলো।

কয়েকখানা ঘর পার হয়ে, একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

বাসব চাপা গলায় বলল, তালা বন্ধ দেখছি। প্যাডলক, নকল চাবি দিয়েও খোলা সম্ভব হবে না। তুমি এখানে অপেক্ষা কর ডাক্তার। আমি কার্নিশ দিয়ে ঝুলন্ত বাথরুমের কাচের জানলাটা খুলে ভেতরে যাওয়া যায় কিনা দেখি।

বাসব বারান্দার রেলিং টপকে দেওয়াল ধরে ধরে সন্তর্পণে কার্নিশের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। শৈবালের মনে হতে লাগল এই বুঝি ও পড়ে যায়।

কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল বাসব।

এক সময় বাঁকের মুখে অদৃশ্য হল সে।

তারপর কেটে গেল বেশ কয়েকটা মিনিট।

অন্ধকারের মধ্যে শৈবাল দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

মিনিট পনের গড়িয়ে গেল এইভাবে।

বাসবের দেখা নেই। শৈবাল ভীত হয়ে পড়ল।

মনে হচ্ছে নিচে ডিনার-পর্ব শেষ হয়েছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে যেন। উপরে উঠে আসছেন কেউ কি? উপায়?

কিন্তু কোনরকম অঘটন ঘটবার আগেই বাসব ফিরে এল।

তারপর দুজনে অদৃশ্য হল বারান্দার অন্যদিকে।

ঘন্টাখানেক আরো কেটেছে।

শৈবাল বিছানায় শুয়ে পড়েছে। বাসব ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ওর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কপালে কয়েক ভাঁজ চিন্তা।

—এক সময় ও বলল, ডাক্তার, ঘুমালে নাকি?

—না। তবে এখুনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়ব। শীতের রাতে ঘুমটাই হল তোফা আরামের বস্তু।

—কিন্তু তোমার এই তোফা আরামে আমি বাদ সাধব।

—কেন ভাই, আমার এই উপকারটুকু তুমি করবে।

—না করে উপায় নেই। আজ সারা রাত আমাদের একজনের জন্যে জেগে কাটাতে হবে। নাও, উঠে পড়।

অগত্যা শৈবালকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হল।

রাত ক্রমেই গভীর হচ্ছে।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় শীত চতুর্গুণ বেড়ে গেছে আজ। নিদ্রার কোলে ঢলে রয়েছে হান্টিং হাউস।

বারান্দার ওয়াল-ক্লকটায় এক সময় ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

নিস্তব্ধ গভীর শীতের রাত্রে ঘড়ির শব্দটা দানবের পদধ্বনির মতই ভয়াবহ শোনাল।

বারান্দায় ও সিঁড়ির বাঁকে অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে।

অন্ধকার জায়গায় জায়গায় তাই কিছুটা স্বচ্ছ।

হঠাৎ সে আলোগুলোও নিভে গেল। আলোর সঙ্গে যে সূক্ষ্ম যোগসূত্র ছিল তাও কেটে গেল। নিটোল অন্ধকার নেমে এল হান্টিং হাউসের ওপর।

ঠিক এই সময় —

ঠিক এই সময়—সাক্ষাৎ প্রেতের মত, হান্টিং হাউসের অভিশাপ সেই জ্বলন্ত মূর্তিকে টলতে টলতে নেমে আসতে দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে।

চারদিক ভরে গেল মিষ্টি একটা গন্ধে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে সে একবার তাকিয়ে নিল এধার-ওধার।

তারপর একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

কয়েক সেকেন্ড কাটল গভীর নীরবতার মধ্যে ক্লিক্ করে একটা শব্দ হল এক সময়।

দরজাটা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে—জ্বলন্ত মূর্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

বেডরুম ল্যাম্পের নিষ্প্রভ আলোয় ঘরখানা আলোয়-আঁধারে যেন থমথম করছে। খাটের ওপর কে-একজন লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে। তার মাথার কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। খাটের ওপর নিশ্বাসের তালে তালে লেপটা উঠছে নামছে।

জ্বলন্ত মূর্তি অভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেল, ঘরের কোণে ছোট্ট টুলের ওপর রাখা সোরাইটার কাছে। মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল একবার ঘুমন্ত লোকটিকে।

নিজে পকেট থেকে বার করে আনল ছোট একটা শিশি। তারপর ঝুঁকে পড়ে শিশি থেকে কিছু ঢেলে দিতে লাগল সোরাইয়ের মধ্যে।

সেই মুহূর্তে……

—কোডিনের শিশিটা আমায় দিন শেখরবাবু।

চমকে মুখ ফেরাল জ্বলন্ত মূর্তি।

বাসব হাত বাড়িয়ে বড় আলোটা জ্বালল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলোর বন্যা বয়ে গেল।

শৈবাল বিস্ফারিত চোখে দেখল, কালো ট্রাউজার, জারকিন্স গায়ে ও মুখে কাপড়-বাঁধা একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের হাত পাঁচেক দূরে। বাসবের অনুমান একবর্ণও মিথ্যে নয়, মূর্তিটার সারা গায়ে সিল্কের ছোট ছোট থলিতে অজস্র জোনাকি আটকান।

তারা জ্বলছে—ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে আলো বিকিরণ করে চলেছে।

বাসব কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, সিঁড়ির তলায় আমরা ঘণ্টা তিনেক

অপেক্ষা করেছি। শেষপর্যন্ত যে আপনি দর্শন দিয়েছেন, তাতেই আমরা ধন্য!

নিদ্রিত মানুষটা ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে এধার-ওধার। সে অনিরুদ্ধ।

বাসব এগিয়ে গিয়ে বাগানের দিকের জানলাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল, ওয়েল ইন্সপেক্টার, কাম ইন।

ইন্সপেক্টার রায়সুরানা দুজন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে বাগান থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরে এলেন। জ্বলন্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, একি—

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এতক্ষণ বাগানে শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি কষ্ট পেয়েছেন ইন্সপেক্টার। কিন্তু কষ্টের পুরস্কার হাতে হাতেই পাচ্ছেন। এই যে—আপনার সামনেই আসামী উপস্থিত। আদিত্য-হত্যাকাণ্ডের একমাত্র নায়ক শেখরনাথ চৌধুরীকে আপনি গ্রেপ্তার করতে পারেন।

রায়সুরানা এগিয়ে গিয়ে শেখরের মুখের ওপরকার কাপড়টা সরিয়ে দিলেন। জ্বলন্ত চোখ দুটো ঝিকিয়ে উঠল তার। এতক্ষণ পরে সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আদিত্য রায়কে যে আমি হত্যা করেছি তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন?

—পারি বইকি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, আপনি আদিত্য রায়কে কিভাবে হত্যা করেছেন, তার প্রমাণাদি ইন্সপেক্টার রায়সুরানা যথাসময়ে ধর্মাধিকরণে পেশ করবেন। তবে উপস্থিত আমাদের চোখের ওপর যে ঘটনাটা ঘটেছে, তা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুনুন শেখরবাবু, আইনের চোখে হত্যা করা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করার মধ্যে বিশেষ তারতম্য নেই। আপনি অনিরুদ্ধবাবুকে মার্ডার করার প্ল্যান করে, তাঁর সোরাইয়ের জলে কোডিন মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শিশিটা এখনও আপনার হাতে রয়েছে। তাছাড়া জোনাকির মালা গায়ে জড়িয়ে, দিনের পর দিন বাড়ির লোকেদের ভূতের ভয় দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে কি যুক্তি আপনি দেখাবেন?

শেখর নীরব রইল।

রায়সুরানা তার হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিলেন।

অনিরুদ্ধ এক ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে এই অভাবনীয় সংবাদটা দিতে গিয়েছিল পুরন্দর চৌধুরীকে। ক্রমে সমস্ত বাড়িতে প্রচারিত হয়ে গেল কথাটা। সকলে ছুটে এলেন অনিরুদ্ধের ঘরে। এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারে সকলেই স্তম্ভিত।

ইন্সপেক্টার রায়সুরানা শেখরের হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রাখলেন। কারুর মুখে কথা নেই। ঘরের এতগুলো প্রাণী যেন সহসা একই সঙ্গে বোবা হয়ে গেছে। আর ঠিক এই সময়েই ভিড় ঠেলে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন অম্বুজনাথ। শেখরের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন,

কন্দর্প চৌধুরীর রক্ত—সূর্যকান্তের রক্ত···হাঃ-হাঃ-হাঃ। অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ থামে অম্বুজনাথের অট্টহাসি হাণ্টিং হাউসের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল।

রাত শেষ হয়ে আসছে। পাতলা অন্ধকারের ওপর ভোরের ইশারা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে।

···হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাসছেন অম্বুজনাথ। বিরামহীনভাবে হাসছেন তিনি। ঘরের অন্যান্য সকলে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। ইন্সপেক্টার শেখরকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাসব ও শৈবাল তাঁকে অনুসরণ করল।

বেলা পড়ে এসেছে।

বিন্ধ্যাচল হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে প্লাইমাউথ। ড্রাইভ করছেন স্বয়ং পুরন্দর চৌধুরী। তাঁর পাশে বসে বাসব ও শৈবাল। আজই অমৃতসর মেলে ওরা কলকাতা চলে যাবে।

বাঁ-হাতে স্টিয়ারিংটা ধরে, ডান হাতে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে, ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে পুরন্দর বললেন, হ্যাব ইট—বাসব একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বলল, ডাক্তার স্মোক করে না। তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, খুবই দুঃখের কথা। অম্বুজনাথ যে শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে যাবেন, তা কে ভেবেছিল।

এতবড় আঘাত সহ্য করতে পারেননি মিস্টার ব্যানার্জি। প্রথমে নিজে ত্রিশ হাজার টাকা সরিয়ে একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। ও-সম্বন্ধে মনের মধ্যে অশান্তি ছিলই। তারপর শেখরের এই পরিণতিতে আর নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারেননি।

তিনজনেরই মন ভারি হয়ে উঠল।

--ওঁকে তো আর বাড়িতে রাখা চলবে না, কোন মেণ্টাল····

—কাঁকেতেই পাঠাতে হবে। যাক্, ও কথা। এখন বলুন, মিস্ট্রিটা সল্ভ্ করলেন কিভাবে?

বাসব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, কেন জানি না, কেসটাকে প্রথম থেকেই খুব জটিল বলে মনে হয়নি। হত্যাটা মনস্তত্ত্বের বিকার বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই প্রথমেই আমি সন্দেহ করেছিলাম সুজাতা-দেবীকেই। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করলেও—তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা স্বামী-স্ত্রীর ছিল না। জীবনের এতগুলো বছর সুজাতাদেবীর কেটেছে অন্ধকার হাতড়ে। এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, আবার তাঁর মন রঙীন হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না। তিনি ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাই অসুস্থ স্বামীর হাত থেকে এইভাবে রেহাই

পাওয়ার পরিকল্পনাটা উদয় হওয়া স্বাভাবিক। প্রেমের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করেছে বা স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করেছে—এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনে বিরল নয়। আমি আশ্চর্য হলাম না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। একটা ভাঙা গেলাসের কাচের টুকরো আমাকে অন্যপথের নির্দেশ দিল। তার আগে সকলের স্টেটমেণ্ট নেওয়ার সময় কতগুলো অসঙ্গতি আমার চোখে পড়েছিল। পৌনে আটটার সময় চন্দ্রকান্তবাবু ড্রইংরুম থেকে বের হলেন, অথচ আপনার ঘরে গিয়ে আপনার সঙ্গে মিনিট তিনেক কথাবলার পরই আলো যখন নিভে গেল, তখন আটটা বাজছে। কোথায় ছিলেন তিনি বাকি সময়টা? কোথায় যে ছিলেন, তা আপনারা শুনেছেন। আপনি যখন আদিত্যবাবুকে টাকা দিচ্ছিলেন, অম্বুজ-বাবু কোনরকমে তা দেখে ফেলেন। তাঁর মনে লোভের সঞ্চার হয়। বাড়িতে একনাগাড়ে বসে থেকে, একটা কিছু করার তাগিদেই তিনি ডাকের মাধ্যমে অন্যের সাহায্যে ফাটকা খেলতে আরম্ভ করেন। টাকার অভাব যাচ্ছিল তাঁর। আদিত্য রায় সুজাতাদেবীর দৃষ্টি এড়ানোর জন্যেই টাকাটা রাখলেন সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে—তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় ওভারনাইট ব্যাগের মধ্যে। অম্বুজবাবু তা দেখেছিলেন, তাই সন্ধ্যার পর সকলে ড্রইংরুমে চলে গেলে তিনি আদিত্য রায়ের ঘরে আসেন। তাঁর ধারণা ছিল মিস্টার রায়ও নিশ্চয়ই ড্রইংরুমে গেছেন। কিন্তু তাঁকে ঘরের মধ্যে দেখে নিশ্চয়ই তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে, আদিত্যবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন বলেই তিনি ধারণা করেন এবং ওভারনাইট ব্যাগটা জানলা দিয়ে বাগানে ফেলে দেন।

বাসব সিগারেটে শেষবারের মত টান দিয়ে, টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে বলল, একটা জ্বলন্ত ভৌতিক বিভীষিকা ত্রাসের সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই অনুমান করেছিলাম, কোন মানুষেরই এটা সুপরিকল্পিত চাল। একটু চিন্তা করার পরই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এলো এই ভৌতিক মূর্তির আসল ব্যাপারটা। আমি লক্ষ্য করলাম, মূর্তিটির টার্গেট হল যাঁরা চেঞ্জে এসেছেন তাঁরাই। অন্য কেউ আক্রান্ত হয়নি অথচ ঊর্ণাদেবী দুবার আক্রান্ত হলেন। প্রথমবার মূর্তির আবির্ভাবটার সময় কাচ ভেঙে নাটকীয় কায়দায় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। আপনি সেখানে উপস্থিত থাকলেও, আসলে কিন্তু সুজাতাদেবীকে দর্শন দেওয়াই মূর্তির উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চিত হলাম, কেউ ভয় পাইয়ে এঁদের এখান থেকে তাড়াতে চায়। কিন্তু কেন? আদিত্য রায়কে হত্যা করার ব্যাপারেও হত্যাকারী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছে। প্রথমেই আমি যে কথাটা আপনাকে বলেছি—হত্যাকারীর মনেও তা উদয় হয়েছিল। তাই সে কোডিনের সাহায্যে আদিত্য রায়কে হত্যা করে এইটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে ওষুধের সঙ্গে বিষ

মিশিয়ে সুজাতাদেবীই তাঁকে হত্যা করেছেন। প্রেমের ব্যাপারে এই ধরনের টানাপোড়েন অহরহ ঘটছে। কাজেই পুলিস সুজাতাদেবীকে সন্দেহ করবেই। আমিও প্রথমে ওই কারণেই সন্দেহ করেছিলাম। আগেই বলেছি।

বাসব চুপ করল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল, কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া গেলাস-ভাঙা কাচের টুকরোগুলোই হত্যাকারীর সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দিল। কাচের ওপর থেকে আমি দুটো হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম। একটা অবশ্যই আদিত্য রায়ের। অন্যটি?—সুকৌশলে আমাকে আপনাদের প্রত্যেকের হাতের ছাপও সংগ্রহ করতে হল।

—কিভাবে? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

—একদিন দুপুরে আমি খাওয়ার ঘরে গিয়ে এঁটো গেলাসগুলো থেকে হাতের ছাপ জোগাড় করার ব্যবস্থা করি। আগেই আমি লক্ষ্য করে রেখেছিলাম, কে কোথায় বসে খেয়েছে। কাজেই কার ছাপ কোনটা অনুমান করে নিতে আমার কষ্ট হয়নি। অবশ্য এর জন্যে আপনাদের টেবিল-বয়টাকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে আর কিছু গাঁটগচ্ছা দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হয়েছে। যা হোক্, দ্বিতীয় হাতের ছাপটি মিলল শেখরবাবুর সঙ্গে। তাঁকে আমি সন্দেহ করিনি। এই অভাবনীয় আবির্ভাবে আমি চমৎকৃত হলাম। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন মিস্টার চৌধুরী, জ্বলন্ত মূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিভে যেত, তখন এই অনুমান করে নেওয়াই ঠিক যে, মেন সুইচ অফ করে দেওয়া হত। আমি মেন সুইচটা গিয়ে পরীক্ষা করলাম। সুইচের ওপর কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল না—রুমাল হাতে জড়িয়ে সুইচ অফ করা হলেও, তলাকার ব্র্যাকেটের ওপর কোথাও কোথাও অসতর্কভাবে হাতের ছাপ পড়েছে দেখা গেল এবং সে ছাপ শেখরবাবুরই। সন্দেহহীনভাবে প্রমাণিত হল, শেখরবাবুই ভৌতিক খেলার খেলোয়াড় এবং আদিত্য রায়ের হত্যাকারী। তাছাড়া, 'কোডিন' একটি দুর্লভ পদার্থ। বিশেষ করে ভারতের বাজারে যে কোন ওষুধের দোকানে এই বস্তুটি চাইলেই পাওয়া যায় না, এর ব্যবহারও সাধারণ লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়—কোন ডাক্তারি-জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষেই এটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা সম্ভব। শেখরবাবু ডাক্তার। কিন্তু তিনি কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এ সমস্ত করছেন? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উদ্দেশ্যটা সরল হল। উনি নিজের স্টেটমেণ্টে বলেছিলেন, বিরাট একটা ওষুধের কারখানা করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর আছে। কারখানার জন্যে যে টাকার প্রয়োজন হবে তা দেবেন কাকা অর্থাৎ আপনি। দীর্ঘদিন ধরে এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—আপনি বিয়ে করেননি, আপনার কোন ছেলেমেয়ে নেই, সেক্ষেত্রে আর কেউ না থাকায় শেখরবাবুই আপনার উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু সুজাতাদেবীরা এসে পড়াতেই তাঁর সমস্ত গোল-মাল হয়ে গেল। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, পুরনো ভালবাসায় আবার আত্মহারা

হয়ে আপনি নিজের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিশেষ একজনকে করতে পারেন। তাহলে কারখানার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যাবে। তিনি তাই জোনাকি-পোকা গায়ে আটকে ভৌতিক খেলা দেখিয়ে ওঁদের তাড়াবার চেষ্টা করলেন—পরিশেষে আদিত্যবাবুকে খুন করলেন। যদিও এসমস্ত অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলছি, তবু তা যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ পাওয়া গেল, আমার কথামত আপনি যখন প্রচার করলেন, ঊর্ণাকে আপনি উত্তরাধিকারী করতে চান এবং তারই সঙ্গে অনিরুদ্ধবাবুর বিয়ে দিতে চান।—শেখরবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। অনিরুদ্ধবাবুকে পথ থেকে সরানো ছাড়া আর কোন উপায় দেখলেন না। অনিরুদ্ধবাবু মারা গেলে তিনি যদি ঊর্ণাদেবীকে বিয়ে করতে পারেন তাহলে দুদিকই বজায় থাকে। এরপর যা হয়েছে তা তো আপনি জানেনই।

একটানা এতটা বলার পর বাসব নীরব হল।

শৈবাল প্রশ্ন করল, তুমি কাল কার্নিশ টপকে কার ঘরে ঢুকেছিলে?

—শেখরবাবুর। আমি তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেও তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম আরও কিছুর সন্ধানে। আমার অভিযান ব্যর্থ হয়নি। খাটের তলায় কতক-গুলো ট্রাঙ্কের পেছনে একটা জার আবিষ্কার করলাম। জারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে একগাদা জোনাকি ধরে রাখা হয়েছে। যার সংখ্যা হাজার খানেকের কম হবে না।

-কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল কিভাবে?

—আমার মনে হয়, আদিত্যবাবু আগেই শেখরবাবুর সঙ্গে নিজের সাময়িক কোন অসুখের বিষয় আলোচনা করেছিলেন। এবং শেখর সেই সুযোগই গ্রহণ করেন। সকলে ড্রইংরুমে চলে যাওয়ার পর তিনি আদিত্য রায়ের ঘরে এসে তাঁকে ওষুধ খেতে দেন। ওষুধের ছদ্মবেশে তা ছিল কিন্তু নির্জলা কোডিন।

—এখানে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে।—শৈবাল বলল, সুজাতাদেবী সেদিন যখন বললেন, তাঁর এই ঘরে অসুস্থ স্বামী নিয়ে রাত কাটাতে ভয় করছে, তখন শেখরবাবু আদিত্য রায়কে মৃত জেনেও সেই ঘরে থাকতে নিজে থেকে রাজি হলেন কেন?

—ভেরি সার্ফ কোশ্চেন ডাক্তার! হ্যাঁ, কেন এতবড় রিস্ক শেখরবাবু নিয়েছিলেন? এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, শেখরবাবু একজন পেশাদার খুনি নন। হাজার পরিকল্পনা করে আদিত্য রায়কে হত্যা করলেও কিছু দোষ-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক—ছিলও। পরে সেই দোষগুলির মধ্যে একটার কথা তাঁর মনে পড়ে যায় এবং সেইটাই সংশোধন করতে গিয়েই তিনি নিজে থেকে ফাঁদে পা দেন। অর্থাৎ যে গেলাসে আদিত্যবাবু কোডিন-মিশানো জল খেয়েছিলেন, সেটা ভুলে ঘরেই রয়ে গিয়েছিল। আপনারা যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন কোনরকমে গেলাসটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন শেখরবাবু। কিন্তু তাতে যে তাঁর হাতের ছাপ রয়ে গেছে, তা অবশ্যই তিনি খেয়াল করেননি।

সূর্য ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে চতুর্দিকে। একটা দুটো করে মোগলসরাইয়ের আলো দেখা যাচ্ছে।

পুরন্দর বললেন, আমি আপনার কথা যতই ভাবছি, আশ্চর্য হচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি। একটা দুর্বোধ্য ব্যাপারকে কত তাড়াতাড়ি সহজ করে এনেছেন আপনি।

বাসব হাসল।—উপস্থিত খুব বেশি বাহাদুরি আমার নেই; আজকাল অভিজ্ঞতাই আমাকে অনেক ব্যাপারে দ্রুত সমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করে। মিঃ চৌধুরী একটা অনুরোধ আমার আছে, অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে ঊর্ণাদেবীর অবশ্যই বিয়ে হবে—ওই সঙ্গে সৌরভবাবুর সঙ্গে জবাদেবীরও বিয়েটা দিয়ে দেবেন। তাছাড়া আরেকটা কথা, আমরা নিজের কানেই শুনেছি, একদিন রাত্রে বাগানে, মৃগাঙ্ক পালিতের সৌরভবাবুর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথাটা। তাছাড়া সৌরভবাবু নিজেও আমার কাছে স্বীকার করেছেন। আপনি ও-বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন।

আলোর মালার মধ্যে দিয়ে গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে। আজ শীত একটু কম। পুরন্দর চৌধুরী স্টেশন-চত্বরের মধ্যে প্লাইমাউথখানা নিয়ে প্রবেশ করলেন। যথাস্থানে পার্ক করলেন গাড়িখানা। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে বললেন, এখন সাড়ে ছ'টা; অমৃতসর মেল আসবে সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে। আমরা বরং গাড়িতেই অপেক্ষা করি।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বাসব বলল, সেটা খুব যুক্তিযুক্ত হবে না মিস্টার চৌধুরী। এই শীতে আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না। তাছাড়া আপনাকে ফিরতে হবে আবার কুড়ি মাইল পথ।

বাসব নেমে পড়ল। শৈবালও। পুরন্দর চৌধুরীও গাড়ি থেকে নেমে বললেন, ধন্যবাদ।

একটা কুলি এসে দাঁড়িয়েছিল। কেরিয়ারটা খুলে দিলেন তিনি। ইঙ্গিত করতেই কুলিটা সুটকেশ আর বেডিংটা বার করে নিল।

পকেট থেকে কি একটা বার করে এবার ঘুরে দাঁড়ালেন বাসবের দিকে পুরন্দর। বললেন, আপনার প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। তবু এই চেকটা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

বাসব তাঁর হাত থেকে চেকটা নিল। শৈবাল গলা বাড়িয়ে দেখে নিল বেশ মোটা অঙ্কেরই চেক।

বাসব বলল, ধন্যবাদ, মিস্টার চৌধুরী। আপনি আমার প্রতিভার মূল্য একটু বেশিই ধার্য করেছেন।

এরপর ওরা দুজন করমর্দন করল পুরন্দরের। তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাসব বলল, এস ডাক্তার—

স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল ওরা দুজন।

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন পুরন্দর চৌধুরী।

অতনু মল্লিক

কাঁটায় কাঁটায় দশটা।

মল্লিক হাউসে প্রবেশ করল শুভাশীষ। এই বাড়ির তেতালায় ওর অফিস। মল্লিক মাইকা মাইন্স প্রাইভেট লিমিটেডে কাজ করে শুভাশীষ। ভাল পদেই বেশ কিছুদিন থেকে কাজ করছে এখানে। অভ্রের খনিটি অবশ্য বিহারে অবস্থিত। মাল রপ্তানির সুবিধের জন্যই শুধু অফিসটি কলকাতায়।

মল্লিক হাউসে আরো বহু অফিস আছে। সবগুলিই অপূর্ব মল্লিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। অপূর্ব মল্লিক আজ নেই। বছর চারেক হল মারা গেছেন। এই বিরাট ব্যবসা এখন তদারক করছেন তাঁরই তিন ছেলে। বর্তমানে মল্লিক বিজনেস কনসার্নে সিনিয়ার পার্টনার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার হলেন অতনু মল্লিক। এই অতনু মল্লিকেরই একান্ত-সচিব হল শুভাশীষ।

শুভাশীষ পায়ে পায়ে লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল। তখন সেখানে লোক সমাগম হয়নি। সাড়ে দশটা থেকে অফিস আরম্ভ, কাজেই চতুর্দিকে এখনও জনশূন্য। তবে লিফটের সামনে একজনের দেখা পেল ও। মিতা ভ্রু-কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। একহারা মিষ্টি মুখের অধিকারিণী মিতা সেন। অতনু মল্লিকের স্টেনো।

শুভাশীষের দিকে তাকিয়ে মিতা বলল, অসহ্য! অন্তত দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি। লিফটম্যানের এখনও দেখা নেই।

মৃদু হেসে শুভাশীষ বলল, আপনি যদি অফিস আওয়ার্সের আগেই অফিসে এসে পড়েন, সেজন্যে লিফটম্যানকে দায়ী করা চলে কি?

—আমি লক্ষ্য করেছি আপনি সব সময় মিনিয়ালসদের সাপোর্ট করেন।

—অন্যায় করি?

—নিশ্চয় অন্যায় করেন। আমরা যদি আধ ঘণ্টা আগে আসতে পারি, তবে তারা এক ঘণ্টা আগেই বা অফিসে আসবে না কেন?

শুভাশীষ মিতার এই কথার বেশ কড়াগোছেরই একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলা আর সম্ভব হল না। ঠিক সেই মুহূর্তে—সামন্ত—

চমকে মুখ ফেরাল শুভাশীষ। জ্বলন্ত পাইপ ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অতনু মল্লিক। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কোঠায়। মিশমিশে কালো মজবুত দেহ। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। তিনি আবার বললেন, সামন্ত, এদিকে এস—

শুভাশীষ তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছে।

কিছুটা ক্লান্তও।

—আপনাকে অত্যন্ত টায়ার্ড দেখাচ্ছে, স্যার!

—হুঁ! রাত্রে একেবারেই ঘুম হয়নি। কিছু কাজের কথা আছে। এস, আমরা ওপরে যাই। তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

শুভাশীষ কুণ্ঠিত গলায় বলল, আপনি ক্লান্ত। লিফটে গেলে বরং···

এক সারিতেই পর পর তিনটি লিফট। দুটি কর্মীদের জন্য। একটি ডিরেক্টাররা ব্যবহার করেন। ডিরেক্টাররা যে লিফট ব্যবহার করেন তাতে কোন লিফটম্যানের প্রয়োজন হয় না। ওঁরা নিজেরাই সুইচ টিপে ওটাকে চালিত করেন।

লিফটের দিকে তাকিয়ে অতনু মল্লিক বললেন, থাক—সিঁড়ি দিয়েই ওপরে চল।

তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। খেয়ালী মনিবটিকে নীরবে অনুসরণ করল শুভাশীষ।

তিনতলায় এসে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন অতনু। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনেকার রিভলভিং চেয়ারে বসলেন। নিভে যাওয়া পাইপে অগ্নি-সংযোগ করতে করতে শুভাশীষকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এই ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমি একজনকে অন্যত্র ট্রান্সফার করতে চাই। নামের জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক রেখে তুমি একটা অর্ডার টাইপ করে নিয়ে এস।

—কোথায় ট্রান্সফার করা হবে এ বিষয়ে অর্ডারে উল্লেখ থাকবে কি?

—থাকবে। মল্লিক পেপার্সে ট্রান্সফার করা হবে তাকে। ভাল কথা, মিতাকে এ সম্পর্কে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। চিঠিটা তুমি নিজেই টাইপ করবে।

শুভাশীষ অতনু মল্লিকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অতনু নিজের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে পাইপ টানতে লাগলেন। এইভাবে কাটল মিনিট দশেক বোধহয়। তারপর ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। সাগ্রহে তিনি রিসিভারটা তুলে নিলেন। যেন এই ফোন আসার অপেক্ষাই করছিলেন এতক্ষণ চিন্তিত মুখে অতনু মল্লিক।

—হ্যালো···কে অসিত···

'—'

—কি হল সেই ব্যাপারটার? তুমি ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েছিলে?

'—'

—কি বললে, গতকালই টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাস করা হয়েছে। কি আশ্চর্য, আমি ভাবতেই পারছি না এইরকম নাটকীয়ভাবে ঘটনাটা ঘটতে পারে! যাই হোক, আমি এখন লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আধ ঘণ্টার মধ্যে

এখানে আসছ নাকি ?

'—'

—বেশ। ওই কথাই রইল তবে।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অতনু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করলেন ঘরময় কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডিক্টোফোনের চাবি ঘোরালেন, মিতা একবার এ-ঘরে এস।

মিনিট খানেকের মধ্যেই মিতা এ-ঘরে এল।

তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অতনু বললেন, কাল দুপুরে সতের থেকে আঠার বছর বয়সের একটি ছেলে তোমার ঘরে অপেক্ষা করছিল, মনে আছে ?

—হ্যাঁ। আপনিই তাকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

—ঠিক তাই। এখন তুমি নিজের স্মৃতিশক্তিকে একটু প্রখর করে আমার একটা কথার উত্তর দাও।

—বলুন ?

—ওই ছেলেটি যখন তোমার ঘরে উপস্থিত ছিল, তখন আমার ভাই অসিত বা অধীর ওখানে গিয়েছিল ?

—অসিতবাবু গিয়েছিলেন।

—তারপর ?

—তিনি ছেলেটিকে বললেন, তুমি এখন যাও। আমি কাল কোন সময় টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

—এই কথা শুনে ছেলেটি চলে গেল বোধহয় ?

—হ্যাঁ। অসিতবাবুও বেরিয়ে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই অধীরবাবু আমার ঘরে এলেন। বললেন, অসিতের হাতে একটা ভাঁজ করা চেক ছিল কিনা লক্ষ্য করেছেন ? আমি বললাম, ছিল। তিনি আবার বললেন, চেকটা ওই ছেলেটাকে দিয়েছে, না ?

অসীম আগ্রহে অতনু প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বললে ?

—বললাম, চেকটা তিনি তাকে দেননি।

—আর কোন কথা অধীর তোমায় বলেছিল ?

—বলেছিলেন, তবে আমায় নয়, আত্মগতভাবে। সেকথা···

—ইতস্তত করবার কোন প্রয়োজন নেই। অসঙ্কোচে সেকথা বলতে পার।

তবু কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না মিতা। ফ্লোরের দিকে মিনিট-খানেক তাকিয়ে থাকার পর কাঁপা গলায় বলল, অপদার্থ, ক্যারেক্টার লুজ—এই বুড়ো বয়সে কেলেঙ্কারি করতে লজ্জা করে না। বড়ভাই না হলে ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দিতাম। কথাগুলো বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

—হুঁ। তুমি এখন যেতে পার।

মিতা দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে

সে যেন বাঁচে।

শোন! অতনু আবার আহ্বান জানালেন।

মিতা দরজার কাছ থেকে ফিরে এল, বলুন?

—এখানে কতদিন হল তুমি চাকরি করছ?

বিস্মিত গলায় মিতা বলল, বছর আড়াই।

—তার আগে তুমি এক ইলেক্‌ট্রিক্যাল কোম্পানির সেল্‌সগার্ল ছিলে। তোমাকে আমিই এনেছিলাম এখানে, অথচ ···

—আমার কাজে কি কোনরকম গাফিলতি প্রকাশ পেয়েছে?

—গাফিলতি ঠিক প্রকাশ পায়নি, তবে কাজে আরেকটু মনোযোগ আশা করেছিলাম। ভাল কথা, এই চিঠিটা একবার পড়ে দেখ।

অতনু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে ধরলেন।

কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়ল মিতা।

—এ সম্পর্কে তোমার কিছু বলবার আছে?

—আমি আর কি বলতে পারি! যাঁকে এই চিঠি লেখা হয়েছে তাঁকে চিনি না পর্যন্ত।

অতনু জানলার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন, এও তাহলে অধীর কিংবা অসিতের কাণ্ড। যাক—! অফিসিয়ালি তুমি যথাসময়েই জানতে পারবে, তবে মৌখিক এখন জানিয়ে রাখি, আগামী সোমবার থেকে তোমাকে মল্লিক পেপার্সে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

—স্যার, আমি কিন্তু ··

—ওখানে তুমি বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারবে, ভরসা করি। এখন যাও।

কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না মিতা। ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

অতনু পাইপ ধরালেন। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন বারকয়েক। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ওঠা-পড়া করছে। চেকটা কে ভাঙিয়ে নিল? কে····

বীরেন রায় এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন। কোম্পানির ডাক্তার তিনি। তিনদিন অন্তর এই সময় অতনু মল্লিকের ব্লাডপ্রেসার চেক করেন ডাক্তার। রক্তের চাপে বহুদিন থেকে ভুগছেন অতনু! কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর ডাঃ রায় তাঁর শরীর পরীক্ষা করলেন। বললেন, প্রেসার এখন নর্মাল। আজ আপনাকে যেন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, উপস্থিত আমি চিন্তার সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাচ্ছি।

—কেন?

—আপনাকে অবশ্য বলতে বাধা নেই। আপনি আমার অনেক গোপন কথাই জানেন। গতকাল মায়ার নামে একটা মোটা অঙ্কের চেক ইসু করেছিলাম। ওর ভাই এসেছিল চেক নিতে। কিন্তু চেক তাকে দেওয়া

হয়নি। অথচ টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে ড্র হয়ে গেছে।

—সেকি! আপনি নিজের হাতে মায়ার ভাইকে চেক দেননি?

—না। অসিতকে দিতে দিয়েছিলাম। মায়ার বদলে অন্য কেউ মায়ার নাম সই করে টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে নিয়েছে।

ডাঃ রায় অতনু মল্লিকের সমস্ত খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখেন। মায়া অধিকারীর সঙ্গে এই অবিবাহিত প্রৌঢ় লোকটির ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। আগে মায়া সিনেমায় একস্ট্রার কাজ করত। দৈবাৎ একদিন অতনুর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় তার। অন্তরঙ্গতাও হয় ক্রমে। তারপর টালিগঞ্জের দিকে ছোট একটা বাড়ি কিনে মায়াকে সেখানে এনে রাখেন অতনু মল্লিক। এ ঘটনা প্রায় দশ বছর আগেকার। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মায়াকে প্রচুর টাকা দেন, একথাও শুনেছিলেন ডাঃ রায়। এই কারণেই অধীর ও অসিত দুই ছোটভাই দাদার ওপর সন্তুষ্ট নয়।

—আপনি বলতে চান টাকাটা···

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। অসিতই টাকাটা নিয়েছে। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল আমার স্টেনো মিতা সেন। সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে বরখাস্ত করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি অন্য ডিপার্টমেন্টে।

এই সময় শুভাশীষ ঘরে এল। টাইপ করা একটা কাগজ অতনুকে দিল। তিনি কাগজটা দেখে নিয়ে তলায় সই করে দিয়ে বললেন, এতে মিতার নাম লিখে সোমবারের তারিখ নির্দেশ করে তার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেও মুখে কিছু বলল না শুভাশীষ।

ডাঃ রায় বললেন, আমি তাহলে উঠি মিঃ মল্লিক। চারতলায় যেতে হবে, পারচেজিং ডিপার্টমেন্টে।

—আমিও উঠব। অফিসে কাজ আর ভাল লাগছে না। শুভাশীষ সন্ধ্যার পর তুমি একবার বাড়িতে এস।

—আপনি আজ আর ফিরবেন না স্যার?

—না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনজনে। ডাঃ রায় চারতলায় চলে গেলেন। লিফটকেসের কাছে এসে বোতাম টিপলেন অতনু। বিশেষভাবে প্রস্তুত ডিরেক্টারদের লিফট ওপরে চলে এল। তিনি পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে লিফটের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। শুভাশীষ ফিরে এল নিজের ঘরে। বেয়ারাকে ডেকে ট্রান্সফার অর্ডারটা পাঠিয়ে দিল মিতার কাছে।

নানা কাজের মধ্যে আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল শুভাশীষ। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর আর অফিসে ফিরবে না ও। অফিসে থাকতে কেমন আজ

আর ভাল লাগছে না ওর। কর্তার যখন আর ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই, তখন সহজেই অফিস ফাঁকি দেওয়া যায়।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ি বেয়েই নিচে নেমে চলল শুভাশীষ। মাঝপথে দেখা হল অধীর মল্লিকের সঙ্গে। তিনি ওকে দেখে প্রশ্ন করলেন, দাদা নিজের রুমেই আছেন তো?

—না। বেরিয়ে গেছেন, আজ আর ফিরবেন না।

এই সময় হন্তদন্তভাবে অসিত মল্লিককেও সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখা গেল।

তিনি বিরক্তিভরে বললেন, আমাদের লিফটটা আজও বিগড়েছে। মাঝপথে আটকে রয়েছে দেখছি।

—আমিও তো তাই দেখলাম। অধীর বললেন, শুভাশীষবাবু, টমসন কোম্পানিকে ফোন করে দিন। এখনই যেন মিস্ত্রী পাঠিয়ে দেয়।

শুভাশীষ কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছে। মিঃ মল্লিক কি তবে নিচে নামেননি? মাঝপথে এতক্ষণ ধরে আটকে রয়েছেন? কিন্তু চেঁচামেচি করছেন না কেন? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন নাকি? বিচিত্র নয়।

ও দ্রুত গলায় বলল, আমার মনে হচ্ছে মিঃ মল্লিক ওতে আটকে রয়েছেন।

—সেকি! অধীর ও অসিত একসঙ্গে বলে উঠলেন।

—কারণ, উনিই তো লিফটে করে নিচে নামছিলেন।

শুভাশীষ আর না দাঁড়িয়ে নিচে নেমে গেল। সত্যিই লিফটটা মাঝপথে ঝুলছে। অধীর ও অসিত নেমে এসেছিলেন। অসিতের একটা কথা মনে হওয়ায় তিনি অফিসের বাইরে গিয়ে দেখলেন অতনু মল্লিকের গাড়ি যথানিয়মে নির্দিষ্ট জায়গাতেই পার্ক করা রয়েছে। সোফারকে ডেকে প্রশ্ন করতেই জানা গেল, মিঃ মল্লিক এখনও অফিস থেকে বাইরে আসেননি।

শুভাশীষের ধারণাই তাহলে সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। উনিই আটকে পড়েছেন লিফটে। এরপর হৈ-চৈ পড়ে গেল চতুর্দিকে। শুধু ফোন নয়, মোটর নিয়ে লোক ছুটল টমসন কোম্পানির মিস্ত্রী আনতে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে মিস্ত্রী এসে পড়ল। সে কাজে লেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এরও আধ ঘণ্টা পরে বহু কষ্টে লিফটকে নিচে নামানো সম্ভব হল। তারপর চাড় দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলতেই দেখা গেল, লিফটের মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন অতনু মল্লিক। স্থির, নিষ্কম্প তাঁর দেহ। অধীর ও অসিত মল্লিক ছুটে গেলেন। শুভাশীষও গেল। তিনজনে মিলে ধরাধরি করে তাঁর দেহ ওয়েটিং-হলে নিয়ে এল। তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল চামড়ায় মোড়া সোফায়।

ডাঃ রায় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন। এগিয়ে এসে অতনু মল্লিকের নাড়ি পরীক্ষা করলেন।

ব্যগ্র গলায় অধীর প্রশ্ন করলেন, দাদার জ্ঞান কতক্ষণে ভাঙবে, ডাক্তার?

ধরা গলায় ডাঃ রায় বললেন, জ্ঞান আর ফিরবে না। উনি মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! প্রবল গুঞ্জন উঠল।

—না না, আপনি ভুল করছেন ডাঃ রায়। দাদা মারা যেতে পারেন না, আরেকবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন। অসিত মল্লিকের চোখে-মুখে কাকুতি।

—পরীক্ষা করে দেখবার আর কিছু নেই, মিঃ মল্লিক। দুর্বলচিত্ত লোক ছিলেন উনি। হার্টফেল করে মারা গেছেন।

সমস্ত অফিসের লোক তখন ওয়েটিং-হলের ভেতরে এবং বাইরে ভেঙে পড়েছে। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ। শেষে অসিত মল্লিক বললেন, ভাবতেও পারা যায় না যে দাদা হঠাৎ এইভাবে মারা যাবেন।

—হা-হুতাশ করে এখন আর কি লাভ অসিত! যা হবার তা হয়ে গেছে। অধীর বললেন, এখন দাদার দেহ বাড়ি নিয়ে চল। সৎকারের আয়োজন করতে হবে।

শুভাশীষ বলে উঠল, আমার মনে হয় তার আগে পুলিসে খবর দেওয়া বোধহয় প্রয়োজন।

—পুলিস!

কথাটা প্রতিধ্বনিত হল দেওয়ালে-দেওয়ালে।

—পুলিসে খবর দেওয়া প্রয়োজন কেন? অসিতের তীব্র জিজ্ঞাসা।

—মিঃ মল্লিক সাধারণভাবে মারা যাননি বলেই আমার ধারণা।

—এরকম ধারণা হবার কারণ?

—পুলিসের কাছে আমি সে কারণ বর্ণনা করব।

—কিন্তু আপনার ধারণার ওপর নির্ভর করে আমরা বোধহয় পুলিসে খবর দিতে পারি না!

দৃঢ়তার সঙ্গে শুভাশীষ বলল, আমি পুলিসে খবর দেব। কোন যুক্তিতেই খুনকে সাধারণ মৃত্যু হিসেবে মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত পুলিসে খবর দেওয়া হল। শুভাশীষই খবর দিল।

ইন্সপেক্টার সৌমেন দত্ত তদন্তে এলেন। তরুণ পুলিস কর্মচারিদের মধ্যে তিনি বেশ নাম করেছেন। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন তিনি। ঘটনাটির বিষয় মোটামুটি শুনলেন। তারপর শুভাশীষকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, মিঃ মল্লিক যে খুন হয়েছেন এই ধারণা আপনার মনে উদয় হল কেন?

—দুটো কারণে। প্রথম, লিফটের মাঝপথে ওইভাবে আটকে থাকা। দ্বিতীয়, মিঃ মল্লিকের ডান হাতের বুড়ো আঙুলে রক্তের ছোপ দেখা যায়।

হার্টফেল করে মারা গেলে আঙ্গুলে রক্তের দাগ থাকবে কেন ?

এরপর আরো গোটাকতক প্রশ্ন করে শুভাশীষকে ছেড়ে দিলেন সৌমেন দত্ত। প্রশ্নের উত্তরে শুভাশীষ তাঁকে মৃত্যুর পূর্বে অতনু মল্লিক যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তা জানাল। মিতা সেনের ট্রান্সফার অর্ডারের কথাও বলতে ভুলল না।

শুভাশীষের সঙ্গে কথা শেষ করে ডাঃ রায়কে ডেকে পাঠালেন ইন্সপেক্টার দত্ত। অতনু মল্লিকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন তাঁকে। তিনি যে শুধু ব্ল্যাডপ্রেসারেই ভুগছিলেন তাই নয়, দুর্বলচিত্তও ছিলেন।

—আচ্ছা, আপনি ওঁর মৃতদেহ পরীক্ষা করবার সময় ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর ছোট একটা ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন ?

—না। ক্ষতচিহ্ন আছে নাকি ?

—আছে। আপনার সঙ্গে আজ মিঃ মল্লিকের দেখা হয়েছিল ?

—দেখা হয়েছিল, বেলা বারোটা আন্দাজ হবে।

—তাঁকে দেখে অসুস্থ মনে হয়েছিল কি ?

—না। বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল ছিল।

—কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে ?

চেক সংক্রান্ত যে সমস্ত কথা তাঁর ও মিঃ মল্লিকের মধ্যে হয়েছিল, তা সবিস্তারে বললেন ডাঃ রায়।

কথাগুলি শুনে সৌমেন দত্ত খানিক কি চিন্তা করলেন, তারপর ওয়েটিং-হল থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। সেখানে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছিল এক জনসমুদ্র।

অধীর মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টার দত্ত বললেন, আপনার দাদার মৃতদেহ আমি পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যেতে চাই, মিঃ মল্লিক।

—পোস্টমর্টেমে ? তিনি খুন হয়েছেন এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত ইন্সপেক্টার ?

—নিশ্চিত বললে ভুল বলা হবে। মনে খটকা লেগেছে। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে মৃতদেহ সৎকারের অনুমতি আমি দিতে পারি না। অবশ্য আপনাদের যদি এতে আপত্তি থাকে, তবে আইনের বিশেষ এক ধারার সাহায্য নিয়ে···

—তার কোন প্রয়োজন হবে না। অধীর মল্লিক বললেন, আপনার মনে যখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তখন দাদার মৃতদেহ পোস্টমর্টেম হওয়া নিশ্চয় উচিত। এতে আমাদের আপত্তি নেই।

আর বাক্যব্যয় না করে ইন্সপেক্টার দত্ত অতনু মল্লিকের মৃতদেহ মর্গে চালান করে দিলেন।

এই ঘটনার পর দিনকয়েক পার হয়ে গেছে।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট আজই পেয়েছেন সৌমেন দত্ত। রিপোর্ট তাঁর অনুমানের বাইরে যায়নি। খুনই হয়েছেন মিঃ মল্লিক। শরীরের মধ্যে বিষ পাওয়া গেছে। তাছাড়া প্রচণ্ড ইলেকট্রিক কারেন্টের শক খেয়েছেন তিনি।

কেসটি বেশ জটিল, সন্দেহ নেই। গা ঝাড়া দিয়ে তদন্তে লেগে পড়লেন ইন্সপেক্টার। দুপুরে গেলেন মল্লিক হাউসে। প্রতিটি ডিপার্টমেণ্টেই যথানিয়মে কাজকর্ম হচ্ছে। তবে চতুর্দিকে কেমন একটা শান্ত ভাব। একজনের অভাবে সমস্ত উদ্দামতার রেশ কেটে গেছে যেন।

অধীর মল্লিক নিজের অফিস-ঘরেই ছিলেন। সাদরে আহ্বান জানালেন ইন্সপেক্টারকে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সৌমেন দত্ত বললেন, শুভাশীষবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। আপনার দাদা খুন হয়েছেন।

—খুন হয়েছেন ?

—বলা বাহুল্য এটি একটি রহস্যজনক খুন। কেউ অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জটিল পরিকল্পনার সাহায্যে আপনার দাদাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এবার আমি এই খুনের তদন্ত আরম্ভ করতে চাই। আপনার ছোটভাইকে এখানে ডেকে পাঠান।

বেয়ারার সাহায্যে অসিত মল্লিককে ডেকে পাঠানো হল।

তিনিও সমস্ত কথা শুনলেন। এ সম্পর্কে তাঁর আর কি বলার থাকতে পারে !

—এবার তাহলে আমি নিজের কাজ আরম্ভ করি! ইন্সপেক্টার দত্ত বললেন, আপনাদের দাদা মারা যাবার আগের দিন মোটা টাকার একটা চেক নিয়ে যে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল, তা শুনেছি। সে সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে নিশ্চয়ই অসিতবাবু আমাকে বলতে পারবেন !

—ঘটনাটা এমন অদ্ভুতভাবে ঘটে গেছে যে, সে সম্পর্কে আমি এখনও অন্ধকারে আছি। অসিত মল্লিক বললেন, দাদার কাছ থেকে চেক নিয়ে আমি মিতা সেনের ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে স্নেহাংশু অপেক্ষা করছিল। তাকেই দেবার কথা ছিল চেকটা। কথায় কথায় তাকে যখন বিদায় দিলাম, তখন চেকটা নিজের পকেটেই রেখেছিলাম মনে আছে। তারপর ও-বিষয়ে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ল পরের দিন দাদার কথায়। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, চেক নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, যার নামে চেক ছিল, তার নাম সই করে অন্য কেউ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়েছে।

—কিন্তু এখানে যে একটা বড় রকম টেকনিক্যাল মিস্টেক থেকে যাচ্ছে, মিঃ মল্লিক !

—কি বলুন তো ?

—চেকটা আপনার স্নেহাংশুবাবুকে দেবার কথা ছিল, কিন্তু তা না দিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলেন কেন ?

—ইয়ে ·· মানে···কোন গুরুতর কারণে নয়। ভেবেছিলাম আমিই চেকটা ক্যাস করে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

—স্নেহাংশুবাবুর বোন হলেন মায়াদেবী। এই মায়াদেবীর সঙ্গে আপনার দাদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপনারা এই ঘনিষ্ঠতা সমর্থন করতেন না—

—কোন ভদ্রব্যক্তির পক্ষে এই ধরনের নৈতিক অধঃপতনকে সমর্থন করা যায় না।

—যাক ওকথা। চেকের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। পকেটে রাখবার পর আর চেকটা পকেট থেকে একবারও বার করেননি, কি বলেন ?

—যতদূর মনে পড়ছে চেকটা বার করিনি।

—কিন্তু আপনি চেক নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? দাদার মৃত্যুর সঙ্গে—

—হয়ত সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, মিঃ মল্লিক। খুনের কেস ডিল করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সৌমেন দত্ত বললেন, তারপর, সেদিন আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, মনে আছে ?

—আছে। মিতার ঘর থেকে দাদার ঘরে গিয়েছিলাম একবার। তারপর মেজদার ঘরে, অর্থাৎ এই ঘরে এসে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম মেজদার সঙ্গে। শেষে আন্দাজ তিনটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

—যেদিন অতনুবাবু খুন হন সেদিন আপনি বা আপনার মেজদা ফার্স্ট আওয়ারে অফিসে আসেননি, কোথায় ছিলেন ?

অসিত মল্লিক বললেন, আমি চেকটার বিষয় খোঁজ নিতে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। মেজদার কথা বলতে পারব না।

—অধীরবাবু, সেদিন অফিসে আসতে আপনার দেরি হবার কারণ ?

—কারণ, আমি ব্যবসার কাজে কোন্নগর গিয়েছিলাম। দাদাই আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

—কিছু মনে করবেন না, আমার যেন ধারণা হচ্ছে অতনু মল্লিকের মৃত্যুতে আপনারা দুজন তেমন শোকাহত হননি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অধীর মল্লিক বললেন, দাদার এইরকম শোচনীয় মৃত্যু হোক আমি আর অসিত তা চাইনি। তবে এটা ঠিক, তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকে একেবারে ভেঙে পড়িনি। কারণ, তিনি তাঁর ব্যবহারে আমাদের

মন বিষাক্ত করে রেখেছিলেন।

—হুঁ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। মিতা সেন কোন্ ঘরে বসেন অনুগ্রহ করে একবার দেখিয়ে দিন।

অসিত মল্লিক সৌমেন দত্তকে মিতার ঘরে পেঁছে দিলেন। মিতা তখন টাইপরাইটারের সামনে স্তব্ধভাবে বসেছিল। ইন্সপেক্টারকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—আপনি বসুন। সৌমেন দত্ত বললেন, খুন সংক্রান্ত ব্যাপারে গোটা-কয়েক প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

—আমি ও সম্বন্ধে কিছু জানি না।

—আপনি জানেন, এ-কথা তো আমি বলিনি। আপনার কাছ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর পেলে হয়ত কাজের কিছু সুবিধে হতে পারে।

—বলুন?

—এই ঘরে স্নেহাংশুবাবুকে অসিত মল্লিক একটা চেক দিতে এসেছিলেন। কিন্তু চেকটা তাঁকে না দিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। আপনি মনে করে বলুন, সত্যিই কি তিনি চেকটা পকেটে রেখেছিলেন, না⋯

ইচ্ছে করেই নিজের কথা শেষ করলেন না ইন্সপেক্টার দত্ত। চিন্তিত গলায় মিতা বলল, চেকটা তাঁর হাতেই ছিল। পকেটে রাখতে তো দেখিনি।

—আচ্ছা, এমনকি হতে পারে না, অসিত মল্লিক চেকটা ভাঙিয়ে নিয়ে পরে চমৎকার একটা সিন খাড়া করে রেখেছেন?

—না।

—না কেন?

দৃঢ় গলায় মিতা বলল, কোন ছোট কাজ উনি করতে পারেন না।

—অতনু মল্লিককে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা?

—ও বিষয় আমার কোন ধারণা নেই।

সৌমেন দত্ত আর কোন প্রশ্ন করলেন না। মিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নিচে নেমে নিজের জিপে গিয়ে বসলেন। রাজ্যের চিন্তা তখন তাঁকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। অতনু মল্লিককে খুন করেছে কে এবং খুনের মোটিভই বা কি? ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, সন্দেহ নেই। সহজে হালে পানি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ একটা কথা ইন্সপেক্টার দত্তর মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। তাই তো, এ বিষয়ে তাঁকে অত্যন্ত ভালভাবে সাহায্য করবার লোক তো রয়েছেই। জিপ তখন এসপ্ল্যানেড অতিক্রম করেছে। তিনি ড্রাইভারকে বললেন, হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটে চল।

কৌচে আড় হয়ে বসে বাসব 'লাপাজের' পাতা ওল্টাচ্ছিল। এই ফ্রেঞ্চ পত্রিকাটি

ওর অত্যন্ত প্রিয়। সম্প্রতি একটি জটিল তদন্ত নিয়ে বাসব বিশেষ ব্যস্ত আছে। এতক্ষণ ছিল ল্যাবরেটারিতে। ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পাওয়া ছোট-খাট কয়েকটি জিনিসের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। এক নাগাড়ে বহুক্ষণ কাজ করার পর কিছু ক্লান্ত বোধ করায় এই মিনিট দশেক হল 'লাপাজের' পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।

সৌমেন দত্ত ঘরে এলেন।

বাসব দৃষ্টি তুলেই সোল্লাসে বলল, কি সৌভাগ্য! এই নিদাঘ দুপুরে আমার বাড়িতে পুলিশের প্রতিনিধি!

মৃদু হেসে ইন্সপেক্টার দত্ত বললেন, দায়ে পড়েই এই প্রতিনিধিটিকে আপনার স্মরণে আসতে হয়েছে।

—বসুন—বসুন! বলুন কি ব্যাপার? দেখি আপনাকে দায় থেকে মুক্ত করতে পারি কিনা!

—পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমার চেয়ে আপনার মাথায় বুদ্ধি খোলে বেশি।

দুটি কেসে বাসবের সঙ্গে সৌমেন দত্ত কাজ করেছেন। দুটি কেসই অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ও সমাধান করেছিল। সেই থেকেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা।

সৌমেন দত্ত একে একে সমস্ত ঘটনা বলে গেলেন। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিলেন না। বাসব একমনে শুনল। তারপর বলল, আপনার এখন প্রশ্ন হল খুনী কে, এই তো?

—হ্যাঁ।

—এই মুহূর্তে তা অবশ্য বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে আমি খুবই ব্যস্ত আছি, তবে আপনার মুশকিল আশানে আমি সহযোগিতা করব। আগামীকাল বেলা এগারটার সময় এখানে আসবেন। তারপর দুজনে যাওয়া যাবে মল্লিক হাউসে।

—বেশ। কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে আপনি এই সম্পর্কে কোন মন্তব্যই কি করতে পারেন না?

বাসব একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এখন এতটুকু বলতে পারি, মিতা সেনের দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথায় মনে হয়, তিনি অসিত মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত।

বাহাদুর কফি নিয়ে এল এই সময়।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দুজনের আলোচনা এগিয়ে চলল।

বাসবকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় মল্লিক হাউসে পৌঁছলেন সৌমেন দত্ত। পুলিশের পক্ষ থেকেই ডিরেক্টারদের লিফট সীল

করা ছিল। বাসবের কথায় সীল ভাঙতে হল।

লিফটের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখল বাসব। জন-আটেক লোক স্বচ্ছন্দে এতে ওঠা-নামা করতে পারে। মেহগিনি কাঠের দেওয়ালের সঙ্গে দুদিকে দুটো আয়না যুক্ত। মেঝেয় কার্পেট পাতা। সুদৃশ্য বড় ল্যাম্প শিলিং-এ লাগানো। স্বয়ংক্রিয় দরজার পাশেই লিফটকে চালিত করার বোতাম। বাসব তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বোতামটি পর্যবেক্ষণ করল।

বোতামের নিচের দিকে আলপিনের অগ্রভাগের মত কি একটা বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া গেল। বাসব সন্তর্পণে সেই বস্তুটি বোতামের তলা থেকে খুলে আনল। নিজের হাতের চেটোয় রেখে দেখল, আলপিন নয়, ছুঁচ! ছুঁচটাকে পকেটে রেখে আবার বোতামটা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল। বোতামের সঙ্গে যে ইলেকট্রিকের তার যুক্ত আছে—তার মুখের কাছটায় কিছু জটিলতা লক্ষ্য করা গেল।

বাসব আঙুলি নির্দেশ করে ইন্সপেক্টারকে বলল, দেখছেন—

ইন্সপেক্টার ঝুঁকে পড়ে নিজের আঙুলের সাহায্যে বোতাম স্পর্শ করতে যাচ্ছিলেন, বাসব তাঁর হাত চেপে ধরে বলল, প্রচণ্ড শক খাবেন। শর্ট সার্কিট করা রয়েছে।

—বলেন কি!

—ওই বোতাম পুস করেই অতনু মারা গেছেন।

বাসব আর কিছু না বলে মেঝে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল কার্পেটের খাঁজে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা পাতলা লোহার একটা টুকরো পড়ে আছে। তার একদিকটা ধারালো। অনেকটা ছোট ছুরির মত। বাসব সেটাকেও পকেটস্থ করে লিফটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। হাল্কা গলায় বলল, আপনি এক কাজ করুন, মিঃ দত্ত। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। আপনি সন্দেহভাজনদের কাছে গিয়ে জেনে আসুন, কার কোন্ ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট আছে।

ইন্সপেক্টার চলে গেলেন।

বাসব সিগারেট ধরাল। পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততায় ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

ইন্সপেক্টার ফিরলেন মিনিট দশেক পরে। বললেন, মিতা সেন ছাড়া সকলেরই ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট আছে।

—কার কোন্ ব্যাঙ্কে বলুন তো?

ইন্সপেক্টার একে একে বললেন।

—চলুন, একবার ব্যাঙ্কগুলো থেকে ঘুরে আসি।

বাসবের কথাবার্তায় অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছিলেন ইন্সপেক্টার। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না। কারণ, ওর কর্মপদ্ধতি তাঁর অজানা নয়। মল্লিক হাউস থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে।

বাসব ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে এল মল্লিক হাউসে।

বলল, আমি এই ওয়েটিং-হলে অপেক্ষা করছি। আপনি সকলকে এখানে ডেকে আনুন।

ইন্সপেক্টার সকলকে গিয়ে খবর দিলেন। অধীর মল্লিক, অসিত মল্লিক, ডাঃ বীরেন রায়, শুভাশীষ ও মিতা—এলেন সকলেই ওয়েটিং-হলে। বাসবের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টার।

বাসব পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, এই খুনের তদন্তে বন্ধুবর সৌমেন দত্তের অনুরোধে আমি জড়িয়ে পড়েছি। যাই হোক, অতনু মল্লিকের হত্যার রহস্য মোটামুটি আমি ভেদ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই কথাই এখন আপনাদের বলব।

অসিত মল্লিক সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, আপনি জানেন, দাদাকে কে খুন করেছে?

—জানি বৈকি! সেই ব্যক্তি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করলেও স্থূল কয়েকটি প্রমাণ ঘটনাস্থলেই ফেলে গেছে, যার দরুণ আমি তাকে চিনতে পেরেছি। অতনু মল্লিক কেন খুন হয়েছেন তা জানি না। হয়ত যে খুন করেছে সে অন্য লোক কর্তৃক নিয়োজিত। এবং চতুর্দিক খতিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় তাই সম্ভব। এবার আপনারা অতনু মল্লিক কিভাবে খুন হলেন তাই শুনুন। হত্যাকারী ডিরেক্টারদের লিফটে আগেই কারচুপি করে রেখেছিল। সেই কারচুপি হল, লিফট চালাবার বোতামের তার সর্টসারকিট করে রাখা এবং কৌশলে বোতামের সঙ্গে একটি ছুঁচ যুক্ত করে রাখা। বলা বাহুল্য, এই ছুঁচই বিষ বহন করছিল! অতনুবাবু লিফটে চড়ে যেই বোতাম টেপেন, তাঁর আঙুলে ছুঁচ বিদ্ধ হয় এবং তিনি প্রচণ্ড শক খান। মারা যান সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে শক খাবার পরই লিফটের লাইট কানেকশন ডিসকনেক্ট হয়ে যায়। কাজেই লিফট অচল অবস্থায় ঝুলতে থাকে।

—কিন্তু হত্যাকারীর নাম তো আপনি বলছেন না? শুভাশীষ প্রশ্ন করল।

—বলব বৈকি। অতনু মল্লিকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল, ইলেক্‌ট্রিকের তীব্র শক দুর্বলচিত্ত মল্লিক কখনই সহ্য করতে পারবেন না, এ কাজ তাঁরই। তবু তিনি বিষযুক্ত ছুঁচের আমদানী কেন করেছিলেন, বুঝতে পারলাম না। হয়ত শক খেয়ে যদি মৃত্যু না হয়, বিষে হবেই, এই সম্ভাবনার দরুণ। আপনারা তাও বোধহয় বুঝতে পারছেন না, কে এই মারণ-যজ্ঞের হোতা? বেশ, আমি পরিষ্কার করেই বলছি। ডাঃ রায়, আর কেউ বুঝতে না পারুক আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি কাকে মিন করছি।

—আমি! আমি কিভাবে বুঝতে পারব? আকাশ থেকে পড়লেন

ডাঃ বীরেন রায়।

—বিস্ময়ের ভান করবেন না। আপনি সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথিত পরিকল্পনানুসারে অতনু মল্লিককে খুন করেছেন।

এই অবিশ্বাস্য কথাটা ঘরের কেউই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না।

রাগে ফেটে পড়লেন ডাঃ বীরেন রায়। বললেন, আমি খুন করেছি! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমাকে খুনী প্রমাণিত করতে পারবেন, কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে? তাছাড়া আমার স্বার্থ কি?

—স্বার্থ একটা কিছু নিশ্চয় আছে। নইলে এই মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হত না। কি স্বার্থে আপনি এই কাজ করেছেন সে সম্বন্ধে আমার পুরোপুরি জ্ঞান নেই। এই ব্যাপারে ওই অজ্ঞানতা এমন কিছু মারাত্মক নয়। আসল কথা হল, আপনি অতনু মল্লিককে খুন করেছেন, আর তার মোটামুটি প্রমাণ আমার কাছে আছে। তবু ওই সম্পর্কে একটা আঁচ আমি দিয়ে রাখতে পারি। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, গত পরশুদিন আপনি ব্যাঙ্কে আট হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। এই টাকাটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন তার সঠিক উত্তর নিশ্চয় দেবেন!

—সে টাকার সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কি?

—হয়ত আছে। আমরা ভুলে যাইনি যে, ওই অ্যামাউণ্টেরই একটা চেকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে মায়া অধিকারীর নাম সই করে কেউ চেকটা ভাঙিয়ে নিয়েছিল। সেই টাকাটাই আবার আপনি নিজের অ্যাকাউণ্টে জমা করেছেন বলে আমার ধারণা! যাই হোক, প্রমাণের কথা বলছিলেন, এবার সেই সম্বন্ধেই কিছু বলি। এই নিডলটা দেখতে পাচ্ছেন—বাসব ছুঁচটা তুলে ধরল, এটা সাধারণ নিডল্ নয়। আপনারা ইনজেকশন দিতে যা ব্যবহার করেন, তাই। এটা আমি পেয়েছি লিফটের বোতামের সঙ্গে আটকান অবস্থায়। নিঃসন্দেহে বস্তুটি আপনারই। এরই সাহায্যে অতনু মল্লিককে পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। আর এই অ্যাপল কাটা ছুরিটা—ঝুঁকে কিছু করবার সময় আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল, আমি লিফটের কার্পেটের ওপর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। তাছাড়া পরীক্ষা করলেই লিফটের বোতামের চারপাশে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে, যে ছাপ ওখানে পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

বীরেন রায় দাঁতে দাঁত চেপে কি একটা বলতে গেলেন যেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। ইন্সপেক্টার উঠে দাঁড়ালেন।

বাসবও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, আমি এখন চলি ইন্সপেক্টার। সময় পেলে সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেন আমার ওখানে।

মল্লিক হাউস থেকে বেরিয়ে খুচরো গোটাকয়েক কাজ সেরে বাসব যখন বাড়ি

ফিরল, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। শৈবাল ড্রইংরুমেই অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখে বলল, কি হে, কোথায় গিয়েছিলে? বাহাদুরের মুখে শুনলাম, সেই এগারটার সময় বেরিয়েছ নাকি?

—আর বল কেন? কোচের ওপর বসতে বসতে বাসব বলল, সৌমেন দত্ত এক কেসে হালে পানি না পেয়ে আমার কাছে এসেছিল। তাকেই সাহায্য করতে গিয়েছিলাম।

—কি হল?

—কি আবার হবে! কেসটা সল্‌ভ করলাম। ঘটনাটা শুনতে চাও?

—বেশ তো, বল না!

বাসব সমস্ত ঘটনাটা বলে গেল একে একে। সমস্ত শুনে শৈবাল বলল, একটা কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না!

—কোন্ কথা?

—তোমার কথা অনুসারে যদি ধরেও নেওয়া যায়, অতনু মল্লিকের চেক ডাঃ রায় নিয়ে ভাঙিয়েছিলেন। তবে একটা প্রশ্নও ওই সঙ্গে থেকে যাচ্ছে যে, চেকটা তিনি কিভাবে নিয়েছিলেন!

—তুমি ভাল একটা প্রশ্ন বের করেছ ডাক্তার। তবে ও সম্পর্কে আমি যে কিছুই ভাবিনি, তা নয়। আমার ধারণা, চেকটা অসিত মল্লিক স্বয়ং বীরেন রায়কে ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। কিংবা অসিত মল্লিকের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে অধীর মল্লিক সেখানা হস্তগত করেছিলেন। তারপর তিনিই টাকাটা ক্যাশ করিয়ে ডাঃ রায়কে দিয়েছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, ওঁদের দুজনের মধ্যে কেউ যদি এ কাজ করে থাকেন, তবে কেন করেছেন? আমার বিশ্বাস, ওটাই হল খুনের মোটিভ। অর্থাৎ, ওই টাকাটা বীরেন রায়কে দিয়ে পথের কাঁটা স্বরূপ দাদাকে ওঁরই সাহায্যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—মাত্র আট হাজার টাকার জন্য খুন করবার রিস্ক নিলেন ডাঃ বীরেন রায়! শৈবালের গলায় বিস্ময়ের আমেজ।

—মাত্র আটটা নয়া পয়সার জন্য একজন আরেকজনকে খুন করেছিল এমন নজীরও আমার কাছে আছে ডাক্তার।

বাসব মৃদু হেসে সিগারেট ধরাল।

তরল আঁধার

বাসব বেশ কিছুক্ষণ মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, এবার সরে এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। তারপর পাউচ থেকে মিকশ্চার বার করে পাইপে ঠাসতে ঠাসতে জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করল।

ইন্সপেক্টার বিবেক দত্ত এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, কি রকম বুঝছেন?

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বডির পজিশন দেখে মনে হয় মৃত্যু অতর্কিতে এসেছে। তাছাড়া আমার আর কি মনে হয় জানো, ভদ্রমহিলা কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, এই সময় পেছন দিক থেকে আঘাত আসে। হয়ত হত্যাকারী বাগানে দাঁড়িয়ে জানলার মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়েছিল।

—ভিকটিম যে কারুর সঙ্গে কথা বলছিল, অর্থাৎ এ-ঘরে দুর্ঘটনার সময় আরেকজন যে উপস্থিত ছিল, সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?

—ঠিক নিশ্চিন্ত হচ্ছি না। আমার এই রকমই মনে হচ্ছে। মনে হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করলে তুমিও আমার সঙ্গে একমত হবে। বডি ঘরের এমন জায়গায় পড়ে রয়েছে যেখানে আলনা, আলমারি বা ওই জাতীয় এমন কিছু নেই, যা থেকে বুঝতে পারা যায় মহিলাটি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সামনে রয়েছে একটা চেয়ার। চেয়ারে কেউ বসে ছিল, তার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল—এটাই ভেবে নেওয়া স্বাভাবিক। এরপর প্রশ্ন আসছে, কেউ যে ছিল তার প্রমাণ কি? একটি যুবতী মেয়ে শহর থেকে দূরের এই নির্জন ডাকবাংলোয় একা রাত কাটাতে এসেছিল—এ বড় কষ্ট কল্পনা। নিশ্চয়ই সঙ্গে কেউ ছিল।

—ডাকবাংলোর দারোয়ানকে প্রশ্ন করে অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়। আপাতত আপনার কথাই মেনে নিলাম। তাহলে তো এমন বলা চলে, জানলার বাইরে থেকে কেউ নয়, যে চেয়ারে বসে ছিল সে ই গুলি করেছে—

—তাহলে প্রধান ক্ষত বুক বা তলপেটে হত। বডি পড়ে থাকত চিৎ হয়ে বা পাশ ফিরে। ওসব কথা এখন থাক, পরে মাথা ঘামালেই চলবে। তুমি বডি সরাবার ব্যবস্থা কর—

—থানায় গিয়ে লোকজন নিয়ে আসি তাহলে! আপনি··

—আমি বডি পাহারা দেব। যাবার সময় দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিও, ওকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি।

বিবেক দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শব্দ পাওয়া গেল জিপ স্টার্ট নেবার। পাইপ নিভে গিয়েছিল। সেটা ধরিয়ে নিয়ে বাসব ঘরের

বাইরে এল। মৃতদেহের চারপাশে ক্রমেই মাছি জমতে আরম্ভ করেছে। মেঝেয় কার্পেট পাতা নেই। এখানে-ওখানে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

হিম হয়ে যাওয়া সুরূপা মেয়েটির দিকে তাকালে এখন গা ঘিনঘিন করে ওঠে। অথচ একে ঘিরেই কত উচ্ছল ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার সংবাদ এখন কে দেবে? বাসব ঘরের বাইরে এল। একরকম দৈবাৎ ও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। একটা কেস হাতে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লী। কাজ শেষ করে, ফেরার থ্রু টিকিট থাকা সত্ত্বেও কি খেয়াল হল—নেমে পড়ল হাজারিবাগে।

সুখময় দত্ত বিহার পুলিশে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। বিহারের নানা শহরে বাসব কয়েকবার তাঁর সঙ্গে কাজ করেছে। এই প্রবীণ পুলিশ কর্মচারিটির ওপর বেশ শ্রদ্ধার ভাবই ছিল। উনি প্রায়ই ওকে লিখছিলেন হাজারিবাগে 'দত্ত ভিলা'য় কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে। সময় করে উঠতে পারছিল না সে। দিল্লী মেল গয়া অতিক্রম করবার পর বাসবের মনে হল, হাজারিবাগে নেমে পড়াই ভাল। হাতে এখন সময় আছে।

বাসবকে কাছে পেয়ে সুখময় সবিশেষ আনন্দিত হলেন। প্রথম দুদিন কেটে গেল স্মৃতিচারণ করেই। এবার শহর এবং তার চারপাশ ঘুরে দেখার পালা। সুখময় ওঁর সঙ্গী হতে পারলেন না। সারা জীবন ছুটে বেড়িয়েছেন, অথচ অবসর নেবার পরই বাত তাঁর শরীরে আশ্রয় নিয়েছে। বাসবকে সঙ্গ দিল বিবেক। সুখময়ের এই ভাইটি পুলিশ লাইনে যে দাদার মতই জনপ্রিয়তা অর্জন করবে, তার লক্ষণ এখন থেকেই প্রকট। এখন সে এখানেই পোস্টেড।

প্রথম দিন ওরা সংরক্ষিত জঙ্গলে বন্য পশুদের অবাধ জীবন দেখে এল। সত্যি, অপূর্ব ব্যবস্থা! এত কাছ থেকে হিংস্র জন্তু দেখার ব্যবস্থা এখানে ছাড়া উত্তর-ভারতে আর কোথাও নেই। বাসবের খুব ভাল লেগে গেল। আরেকদিন শুধু খুঁটিয়ে দেখা নয়, সম্ভব হলে ছবিও তুলতে হবে কিছু।

আজ সকালে চায়ের টেবিলে বাসব কথাটা পাড়ল।

—আজ আবার যেতে হবে সাংচুয়ারিতে। দিনের বেলা বাঘের সাক্ষাত পাওয়া যাবে কি?

—দেখা পেলে ভাগ্য ভাল বলতে হবে! সুখময় বললেন, ওরা র‍্যাব-সোলিউটলি নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলা যে কোথায় ঘাপটি মেরে থাকে ঈশ্বর জানেন! আপনার তাহলে দারুণ ভাল লেগে গেছে জায়গাটা!

—সত্যিই ভাল লেগেছে। আমি একাই যাব; বিবেক আর কত আমার জন্য কাজ কামাই করবে!

বিবেক বলল, আমার কোন অসুবিধে হবে না। যেতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া ভাল।

কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুটা চক্কর দিয়ে সাংচুয়ারিতে প্রবেশ করবে এই রকম স্থির হয়ে আছে। বেশ কিছুটা ঘোরাঘুরির পর ওরা যখন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে— বাসবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা সুদৃশ্য বাড়ি। বাগানে ঘেরা. টালি-ছাওয়া বাড়িখানা যেন বড় একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—ও-বাড়িটা কার ?

—ডাকবাংলো।

—ভালই হল। চল, ওখানে গিয়ে চায়ে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

বিবেক ডাকবাংলোর হাতায় জিপ নিয়ে ঢুকল। দারোয়ান বা ওই জাতীয় কেউ এগিয়ে এল না। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি বারান্দায় দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া বাড়িটাও কেমন থমথম করছে। ওরা জিপ থেকে নামল।

বাসব বলল, এখানে কিন্তু লোক আছে। ওই দিকের ঘরের দরজাটা দেখ—

বাসবের প্রসারিত আঙুল অনুসরণ করে বিবেক দেখল, কোণের দিকের ঘরখানার দরজার একটা পাল্লা খোলা। দুজনে সেদিকেই এগিয়ে গেল। ঘরে পা দেবার মুহূর্তে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না।

চাপ চাপ কালো হয়ে যাওয়া রক্তের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি তরুণীর মৃতদেহ। বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে।

তারপর··

বারান্দাতেই দেখা হয়ে গেল ডাকবাংলোর দারোয়ান রূপচাঁদের সঙ্গে। সে ভীত সন্ত্রস্তভাবে ঘরের দিকেই আসছিল। মিনিট দশেক আগেই রূপচাঁদের দেখা পাওয়া যায়। বিবেক তখন ঘরে তাকে ঢুকতে দেয়নি। বলেছিল, অপেক্ষা কর—পরে কথা হবে।

—আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও। কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে ভীষণ বিপদে পড়বে।

কাঁপাগলায় রূপচাঁদ বলল, আমি খুন-খারাপির কিছু জানি না বাবু। রাত্রে বাংলোয় ছিলাম না।

—নিজের ডিউটি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে····

—বাঁচতে যদি চাও সমস্ত খুলে বল—

এরপর রূপচাঁদ যা বলল তার সারমর্ম হল, গত সন্ধ্যায় ওই মহিলাটি রিক্সায় চেপে এখানে এসেছিলেন। সঙ্গে কোন মালপত্তর ছিল না। একলা রাত্রে এখানে থাকতে চান জেনে রূপচাঁদ অবাক হলেও ঘরের ব্যবস্থা করে

দিয়েছিল। আধঘণ্টা পরে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক। দরজা বন্ধ করে দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। তারপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রূপচাঁদের হাতে চারটে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলেন, আজ রাত্রের মত সে অন্যত্র কোথাও গিয়ে ফূর্তি করলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে বাবুরা এখানে আসেন মেয়েদের নিয়ে আমোদ করতে। টাকা-পয়সা পেলেই রূপচাঁদ বাংলো থেকে সরে পড়ে রাতের মত। কাজটা বে-আইনী সে জানে, শুধু নিজের সংসারের অভাব মেটাবার জন্যই লোভ সামলাতে পারে না। ভোরেই তার ফিরে আসার কথা। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যাওয়ায় দূর গ্রাম থেকে পথ ভেঙে আসতে এতটা দেরি হয়ে গেছে। খুনের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সমস্ত রাত যে গ্রামের বাড়িতেই ছিল, তার অনেক সাক্ষী আছে।

—হুঁ। সেই ভদ্রলোককে আবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?

—পারব সাব।

—দেখতে কেমন?

—গায়ের রঙ কালো হলেও মুখ-চোখ ভাল। বেশ লম্বা-চওড়া। চোখে চশমা আছে।

—ভদ্রলোকও কি রিক্সায় চেপে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, সাব।

—দুটো রিক্সাওয়ালার মধ্যে কাউকে তুমি চেনো?

—প্রথম রিক্সাওয়ালাটাকে চিনি সাব। সে কয়েকবারই এখানে লোক নিয়ে এসেছে। ওর নাম বিল্টু।

এগিয়ে যাবার পথের সন্ধান এতক্ষণে পেয়ে বাসব খুশি হল। বিল্টুর সন্ধান পেলে বেশ কিছুটা কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে নিঃসন্দেহে। ও পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিল।

—এখানে তুমি একলা কেন? একজন বাবুর্চিরও তো থাকবার কথা?

—বাবুর্চি অসুস্থ হয়ে দিন দশেক আগে বাড়ি চলে গেছে। নতুন বাবুর্চি তারপর থেকে আর আসেনি। বাংলোয় যে খুন হবে আমি ভাবতেই পারিনি। ভগবান জানেন, এসবের মধ্যে আমি নেই সাব। পুলিশ যদি····

—তুমি সত্যি কথা বলে থাকলে পুলিশ তোমাকে কিছু করবে না। এখন নিজের ঘরে যাও। ভয় পেয়ে পালাবার যেন চেষ্টা করো না।

রূপচাঁদ চলে গেল। বারান্দার রেলিং চেপে ধরে বাসব চিন্তার জাল বুনতে লাগল। যদিও তার কোন দায় নেই। হাজারিবাগের পুলিশ যথা-কর্তব্য করবে। ঘটনাটা রহস্যজনক হওয়ায় শুধু এই কেস সম্পর্কেও উৎহাস বোধ করছে। তাছাড়া এখানকার পুলিশ যে ওর সহযোগিতা চাইবে এ-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আরও আধ ঘণ্টা পরে সদলবলে বিবেক দত্ত ফিরে এল।

ফটোগ্রাফার নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিল মৃতদেহের। আগত চিকিৎসক দেহ পরীক্ষা করে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করলেন। অন্যান্য করণীয় কাজগুলি দ্রুত শেষ করল বিবেক দত্ত।

রূপচাঁদের সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে বাসব বলল তাকে। মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে চালান দিয়ে ঘরখানা সীল করা হল। রূপচাঁদকে বর্তমানে গ্রেপ্তার করারই ইচ্ছে ছিল বিবেকের। বাসব বাধা দিল। ওকে এখন নজরবন্দী করে রাখাই ভাল। এই খুনে তার কোন অংশ থাকলে আঁচ পাওয়া যেতে পারে। অ্যারেস্ট করলে সে মুখ টিপে বসে থাকবে, একটি কথাও বার করা সম্ভব হবে না।

বিবেক বলল, তাই হবে। একটা কথা, আপনাকে কিন্তু এই কেস সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড হতে হবে। আমি অনুমতি নিয়ে রাখব।

—বেশ। এখন আমাদের প্রধান কাজ হল ভিকটিমের পরিচয় সংগ্রহ করা। আমার মনে হয় রিক্সাওয়ালা বিল্টু এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে। তাকে খুঁজে বার করা দরকার।

—বিল্টুর সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে না। শহরে ফিরেই রিক্সার আড্ডাগুলোয় লোক পাঠাব।

—এবার আমরা বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখতে পারি—যদি কোন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাল কথা, মেয়েটির ভ্যানিটি ব্যাগটা তোমার কাছে রয়েছে তো? ওটা ঘেঁটে-ঘুঁটে দেখতে হবে।

বাগানের ফুলগাছগুলি বেশ সযত্নে বর্ধিত। নিশ্চয় কোন চৌকস মালি তত্ত্বাবধান করে থাকে। ওরা পায়ে পায়ে বাংলোর পেছন দিকে এল। যে ঘরে খুন হয়েছে তার জানলার তলায় এসে দাঁড়াল দুজনে। বাসব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল। চমৎকারভাবে ছাঁটা ঘাসজমি। ইতরবিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। বাসব বিলক্ষণ নিরাশ হল। ওর ধারণা ছিল, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু এখানে চোখে পড়তে পারে।

বিবেক বলল, এধারে একটা ছোট গেট রয়েছে দেখছি!

বাসব মুখ তুলে দেখল, এধারের বাউণ্ডারি-ওয়াল বেশ উঁচু। একজন মানুষ যাতায়াত করতে পারে, এমন একটি পথ ওই পাঁচিলের সঙ্গেই যুক্ত। মরচে ধরা বহু পুরনো একটা পাল্লাও আছে। বোধহয় মালি, মেথর এরা এই পথ দিয়েই যাওয়া-আসা করে। বাসব কোন কথা না বলে মন্থর পায়ে এগিয়ে ওই গেট পেরিয়ে বাইরে গেল। বলা বাহুল্য বিবেক ওকে অনুসরণ করেছে।

শহর থেকে আগত পিচ-ঢালা সড়ক এখান থেকে দেখা যায় না। সরু পায়ে চলা একটা পথ এধার দিয়ে চলে গেছে। বোধহয় জঙ্গলে যাবার সর্টকাট। জায়গাটার ওপর দিয়ে বাসবের দৃষ্টি দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল। এক

জায়গায় হোঁচট খেল। জল নয়, অন্য কোন ভারি জলীয় পদার্থ বিঘতখানেক জায়গাকে ভিজিয়ে রেখেছে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখল। ওই বিঘতখানেক মাটি তেলতেলে অবস্থায় কালচে হয়ে আছে। আঙুলের ডগায় একটু মাটি তুলে নিয়ে শুঁকল। মবিলঅয়েলের গন্ধ বেরুচ্ছে। তাই তো, ধুলোর ওপর চাকার দাগও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে একটা মোটরকার এখানে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ, লিকেজ থাকায় মবিলঅয়েল চুঁইয়ে পড়েছে তা থেকে। বিবেকও বিষয়টি মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছিল।

সে দ্রুতগলায় বলল, আপনার থিওরিটাই বোধহয় ঠিক। হত্যাকারী মোটর এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

—ঠিক তাই। একসঙ্গে আরও একটা বিষয় ভেবে নেওয়া যায়, এখানে হত্যাকারীর আগে থেকেই যাতায়াত ছিল। নইলে প্রথমবার এসেই সে অন্ধকারের মধ্যে এই দরজা আবিষ্কার করতে পারত না।

আর কথা না বলে দুজনে চারদিকের জমি ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগল। এমন কিছু যদি পাওয়া যায়, যাতে খুনীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। কিছুক্ষণ এধার-ওধার ঘুরেও অভিষ্টবস্তু পাওয়া গেল না। দুজনে আবার ফিরে চলল বাংলোর ভেতর। ছোট দরজাটা সবে পেরিয়েছে, বাসবের দৃষ্টি এক জায়গায় আটকে গেল।

শুকনো পাতার ওপর কি পড়ে রয়েছে যেন। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল, ছোট আকারের টর্চ। বাসব তুলে নিল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। মিনি টর্চ বলতে যা বোঝায় তাই। ব্যাটারি এবং বাল্ব দুই চালু আছে। বোতাম টিপতেই আলো জ্বলল।

সাগ্রহে বিবেক বলল, হত্যাকারী বোধহয় ফেলে গেছে।

—হয়ত। এটা আমার কাছে থাক।

দুজন কনস্টেবলকে ডাকবাংলোয় মোতায়েন করে ওরা যখন গাড়িতে এসে বসল, তখন মনে হল খিদেটা অনেকক্ষণ থেকে চাগাড় দিচ্ছে। সঙ্গে খাবার আছে। স্যাণ্ডউইচ আর কফির সদ্ব্যবহার করে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হল।

মৃতার ভ্যানিটি ব্যাগ ঘরেই পাওয়া গিয়েছিল। ওটা এতক্ষণ খুলে দেখা হয়নি। বাসব ব্যাগটা খুলে ভেতরটা দেখল। চিরুণী, লিপস্টিক, রুমাল, আয়না, ছোট একটা পার্স—অর্থাৎ আধুনিকা তরুণীর ভ্যানিটি ব্যাগে যা থাকা স্বাভাবিক তাই আছে। দুটো ফ্ল্যাপ আছে। একটা ফ্ল্যাপের মধ্যে থেকে পাওয়া গেল একখানা ভাঁজ করা কাগজ। ভাঁজ খুলতেই বোঝা গেল, সেখানা চিঠি। সুছাঁদ অক্ষরে লেখা চিঠিখানা বাসব পড়ল ঃ

প্রিয় রুমা,

তুমি সোমবার দিন আসছো লিখেছ। বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় সারা দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। বিকেলে ডাকবাংলোয় চলে যেও, আমি ওখানে আসব। তোমার বিশেষ কথা তখন শোনা যাবে। এই রকম লুকোচুরি আরও দেড় বছর চালাতে হবে ভাবলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

ভালবাসা রইল।

—তোমার নীলাংশু

চারদিন আগে হাজারিবাগ থেকেই চিঠিখানা লেখা হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। বাসব বিবেকের দিকে চিঠিখানা এগিয়ে ধরলেও কিছু বলল না। দ্রুত সরে যাওয়া গাছপালার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় ডুবে রইল।

পরের দিন সকালে রহস্য একটু পরিষ্কার হল। হত্যাকারী অবশ্য তিমিরেই রয়ে গেছে। বিবেক থানাতেই ছিল। গতকালকার হত্যাকাণ্ড যতই জট পাকানো হোক, বাসব যখন এখানে উপস্থিত আছে তখন সুরাহার আশা সে রাখে। বিল্টুকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছে। বাসব ন-টার মধ্যে থানায় আসবে বলেছিল বলে এখনও তাকে জেরা করেনি বিবেক।

এই সময়ই মৃতা তরুণীটির পরিচয় আবিষ্কৃত হল। সম্ভ্রান্ত-দর্শন এক ভদ্রলোক মহাচিন্তিতভাবে এসে রিপোর্ট করলেন, তাঁর স্ত্রীর সহোদরাকে পরশু বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হবার পর পুলিশের সাহায্য নিতে এসেছেন। বিবেক গোটা কয়েক প্রশ্নের মাধ্যমে চেহারার বর্ণনা ও নাম জেনে নেবার পর নিশ্চিন্ত হল, এঁর আত্মীয়াই ডাকবাংলোয় নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

পুলিশী গাম্ভীর্য বজায় রেখে বিবেক বলল, গতকাল আমরা একটি তরুণীর মৃতদেহ পেয়েছি। আপনি যে চেহারার বর্ণনা দিলেন, তার সঙ্গে

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে উত্তেজিতভাবে ভদ্রলোক বললেন, বলেন কি! রুমা মারা গেছে?

—বডি আপনি দেখে নিন। আমার সন্দেহ অমূলকও হতে পারে!

সন্দেহ অমূলক নয়, বডি দেখার পর নিজের শালীকে সনাক্ত করলেন ভদ্রলোক। ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। মৃতদেহ কোথায় পাওয়া গেছে ইত্যাদি সমস্ত কথা বিবেক তাঁকে বলল। এবং এ-কথাও জানাল, হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

বাসব এসে পড়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল বিবেক। ভদ্রলোকও নিজের পরিচয় দিলেন। নাম হিমাংশু গুপ্ত। অবস্থাপন্ন কাঠের

ব্যবসায়ী। আগে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন, সম্প্রতি অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি করেছেন। স্বামী-স্ত্রী থাকেন সেখানে। ছেলেমেয়ে নেই। রুমা আসানসোল কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। ছুটি-ছাটাতে এসে তাঁদের কাছে থাকে। গত পরশুদিন ভোরের ট্রেনে এসেছিল এখানে। সারাদিন বাড়িতেই ছিল। আন্দাজ চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোয়—তারপর আর ফিরে আসেনি। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কাল প্রচুর খোঁজাখুঁজি করে তার সন্ধান না পেয়ে আজ পুলিশের কাছে এসেছেন।

বাসব বলল, আপনার শ্বশুরবাড়ির আর সকলে কোথায় ?

—শ্বশুরমশাই কলকাতায় থাকেন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি। তবে আর্থিক দিক থেকে রুমা যাতে কোন অসুবিধেয় না পড়ে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

—কি রকম ?

—ত্রিশ হাজার টাকা ওর নামে জমা রেখেছেন। এ্যাটর্নির মারফৎ রুমা প্রতি মাসে দুশো টাকা করে পেত। এই ব্যবস্থা ওর একুশ বছর পর্যন্ত চলার কথা ছিল।

—তারপর ?

—তারপর ও বিয়ে করতে পারত। ব্যালেন্স টাকাটা ইচ্ছে করলে তখন ওর তুলে নেবার অধিকার ছিল।

বাসব হিমাংশু গুপ্তর মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। চোখ না সরিয়ে বলল, এখন তো উনি বেঁচে নেই। এবার ব্যালেন্স টাকাটার কি হবে ?

—আমি যতদূর জানি টাকাটা শ্বশুরমশাইয়ের তহবিলে আবার ফিরে যাবে।

—হুঁ। আপনার শালী কারুর প্রেমে পড়েছিলেন কিনা জানেন ?

এই প্রশ্নে হিমাংশু গুপ্ত একটু সচকিত হলেন। পরমুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, আমার জানা নেই।

—নীলাংশু নামে কাউকে চেনেন ?

—নীলাংশু ! সে আমার ছোট ভাই। তার নাম আপনি···

—ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি। কি করেন ভদ্রলোক ? থাকেন কোথায় ?

—অধ্যাপনা করে। আমাদের পাড়াতেই থাকে।

—বিচিত্র ব্যাপার মিস্টার গুপ্ত ! আপনারা একই পাড়ায় থাকেন অথচ এক বাড়িতে থাকেন না ?

একটু ইতস্তত করে গুপ্ত বললেন, বাড়িটা তো পৈতৃক নয়। আমি নিজের রোজগারে করেছি, তাই সে সেখানে থাকতে চায় না। আসল কথা হল, নীলু অত্যন্ত স্বাধীনচেতা।

বুঝতে পারা গেল হিমাংশু গুপ্ত আসল কারণটা চেপে গেলেন। বাসব

যেন তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারেনি এইভাবে বলল, স্বাধীনচেতা লোকেরা একটু একগুঁয়ে হয় বটে। আপনার ভাই বিবাহিত ?

—না।

—রুমাদেবীর সঙ্গে আপনার ভাইয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, এরকম সম্ভাবনা আপনার মনকে কখনো নাড়া দিয়েছিল কি ?

—রুমার সঙ্গে নীলুর তা কি করে সম্ভব ? তাছাড়া....

—থামলেন কেন ?

—আমার মনের অবস্থা ভাল নেই। এ সমস্ত অবান্তর আলোচনা চালিয়ে যে কি লাভ তাও বুঝতে পারছি না। এই দুর্ঘটনার কথা আমার স্ত্রী এখনো জানেন না। তাঁকে কিভাবে সান্ত্বনা দেব, তাই ভাবছি। এখন আমি চলি। ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, দরকার পড়লে সংবাদ দেবেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করে টেবিলের ওপর কার্ড রেখে হিমাংশু গুপ্ত দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাসব বিবেকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

বিবেক বলল, লোকটা একটু অদ্ভুত, আপনি কি বলেন ?

—ভয় পেয়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিম্বা ওপর চালাকি করে গেল। গুপ্তর কথা এখন থাক, আমি এখন উঠলাম। সন্ধ্যার মধ্যেই পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া যাবে, কি বল ?

—আশা তো করছি !

—ভাল কথা, ইতিমধ্যে বিল্টুকে পাওয়া গেলে তার কাছ থেকে সমস্ত কথা খুঁটিয়ে জেনে নিও।

থানা থেকে বেরিয়ে বাসব একটা রিক্সায় চেপে বসল। মেন মার্কেট অঞ্চলে গিয়ে গোটা কয়েক বড় দোকানে ঢুঁ মারল। কুড়িয়ে পাওয়া নতুন টর্চটা পকেটেই ছিল ওর। যদি কেউ বলে দিতে পারে এই টর্চ কিনে নিয়ে গিয়েছিল তাদের অমুক পরিচিত ক্রেতা, তাহলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। একটু ঘোরাঘুরি করেই বাসব বুঝতে পারল, অনর্থক পরিশ্রম করে আশার আলো দেখবার চেষ্টা করছে।

বাজার থেকে ও সোজা চলে এল হিমাংশু গুপ্তর পাড়ায়। গুপ্তর বাড়ি যাবার ইচ্ছে এখন নেই। ও নীলাংশুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। এক একবার মনে হচ্ছে এই বেলা এগারোটার সময় তার বাড়ি থাকবার কথা নয়। নিশ্চয় কলেজে গেছে। তবু খোঁজ নিতে দোষ কি !

একজন লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবী চাপিয়ে হাতে পুরুষ্ট বাজারের থলি হাতে আসছিলেন। স্থানীয় লোক বলেই মনে হয়। তাঁর কাছ থেকে খোঁজ পাওয়া গেল নীলাংশুর আবাসস্থলের। বাসব পাইপ ধরিয়ে আলতো পায়ে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট-খাটো একতলা বাড়ি। দরজার ওপর

বসানো কাঠের প্লেটে গৃহস্বামীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কয়েকবার কলিংবেল পুস করবার পর আরক্ত গম্ভীর মুখে যে দরজা খুলল, সে-ই যে নীলাংশু গুপ্ত বাসবের তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। হিমাংশুর সঙ্গে মুখের বেশ মিল আছে। সেই রকম সুশ্রী—তীক্ষ্ন। বয়স ত্রিশের মধ্যেই। মনে হয় দাদার চেয়ে বছর আটেকের ছোট। চোখে চশমা।

—কি চাই? কঠিন গলায় প্রশ্ন হল।

—আমি থানা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

—বলুন?

—বাইরে দাঁড়িয়ে সে সমস্ত কথা হতে পারে না।

বাসব নীলাংশুর পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর বসল চেয়ারে। ওর কাণ্ডকারখানায় নীলাংশু বিলক্ষণ চটেছে বুঝতে পারা গেল।

—থানা থেকে এসেছেন বলে কি আমার মাথা কিনে নিয়েছেন? আচ্ছা অভদ্রলোক তো আপনি!

বাসব নিরাসক্ত গলায় নিজের পরিচয় দেবার পর বলল, আমার নাম আপনি শুনেছেন কিনা জানি না। অবশ্য না শুনে থাকলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এটুকু জেনে রাখুন, একটা খুনের তদন্তে আমি পুলিশকে সাহায্য করছি। সেই সুত্রেই আপনার কাছে আসা। আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিলে আপনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। নইলে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে পুলিশ আপনার কাছ থেকে জোর করে কথা আদায় করবে।

নীলাংশুর মুখের ভাব এবার কিছুটা পাল্টাল। সে গলার স্বর নামিয়ে বলল, কোন খুনের ব্যাপার তো আমার জানা নেই! আপনার সঙ্গে কিভাবে সহযোগিতা করব বুঝতে পারছি না।

—আপনি সবই জানেন, মিস্টার গুপ্ত।

—বিশ্বাস করুন, আমার কিছু জানা নেই।

—রুমাদেবীকে চিনতেন?

—চিনি! আমার দাদার শালী।

—তিনি খুন হয়েছেন।...না, না, বিস্ময়ের ভান করবেন না। আপনার কিছুই অজানা নেই। এই চিঠিখানা দেখুন তো—নিজের হাতের লেখা নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না!

—পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে খোলা অবস্থায় বাসব এগিয়ে ধরল। রুমার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাওয়া এই চিঠিটা আগেই ও বিবেকের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছিল।

খোলা চিঠির দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়েই নীলাংশু মুখ সরিয়ে নিল। তাকে এখন কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে।

—চুপ করে থেকে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন না।

—ওখানা আমারই লেখা।

—তাহলে প্রমাণ হচ্ছে, শুধু মুখ চেনাচিনি নয়, রুমাদেবীর সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্টতাই ছিল। এবার আসল ঘটনাটা বলুন তো ?

—আসল ঘটনা বলতে কি বোঝাচ্ছেন, জানি না। স্বীকার করছি, আপনাকে আমি সত্যি কথাটা বলিনি। রুমার সঙ্গে শুধু আমার ঘনিষ্টতাই ছিল না, তাকে আমি বিয়েও করেছিলাম।

বাসব অবাক হয়ে গেল।

—আপনাদের বিয়ে হয়েছিল !

—হ্যাঁ। একথা কেউ জানত না। ওর বাবার ব্যবস্থা মত একুশ বছরের আগে পর্যন্ত ওর স্বাধীনতা ছিল না। তাই আমরা গোপনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছিলাম। এবার নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন আমার মনের অবস্থা কত খারাপ। কারুর ওপর অকারণে রূঢ় হওয়া আমার স্বভাব নয়।

—আমি দুঃখিত, মিস্টার গুপ্ত। আমার ধারণা ছিল না রুমাদেবী আপনার স্ত্রী। আমার কোন কথায় যদি রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা করবেন। এখন আমার যা উদ্দেশ্য, আপনার তাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ, হত্যাকারীকে ধরা। আপনার চিঠি পেয়েই সেদিন উনি ডাকবাংলোয় গিয়েছিলেন, এটা নিশ্চিত। তারপর কি হল ?

—তারপর····

—বলুন—দ্বিধা করবেন না। আমি পুলিশ নই, এই কথা মনে করেই আমায় সব কথা বলুন।

—ও পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরেই আমি ডাকবাংলোয় গিয়েছিলাম। ওখানকার কেয়ার-টেকারকে সরিয়ে দিয়ে আমরা বেশ কিছুক্ষণ গল্প করি। রুমা খাটের ওপর বসে ছিল। হঠাৎ কথা বলতে বলতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই সময় পেছনের জানলা দিয়ে পর পর দুবার গুলি করল কে যেন। রুমা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর·

নীলাংশুর গলা বুজে এল।

—আপনি কি করলেন তখন ?

নীলাংশু নিজের চোখের ওপর রুমাল বুলিয়ে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। নিজেকে সামলে নিয়েই রুমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম, সে মারা গেছে। মনের মধ্যেটা হু-হু করে উঠল। তবু আমি জানলার কাছে ছুটে গেলাম, যদি হত্যাকারীকে দেখতে পাই। অন্ধকারের মধ্যে দু-একবার আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

—তারপরই বোধহয় আপনাকে ভয় চেপে ধরল ? পুলিশ আপনাকে হত্যাকারী ভাবতে পারে, এই ভয় ? ওখান থেকে পালিয়ে এলেন। আপনি

তো ডাক্তার নন? আপনার পরীক্ষা ভুলও হয়ে থাকতে পারে। হয়ত সে সময় রুমাদেবীর জীবন শেষ হয়ে যায়নি। তাঁকে…

—আর বলবেন না, মিস্টার ব্যানার্জী। আমি কাপুরুষের মত কাজ করে ফেলেছি। খুন না করলেও আমার অপরাধ কিছু কম নয়। আজ তিনদিন ধরে এই চিন্তাই আমায় পেঁচিয়ে চলেছে।

বাসব কিছু না বলে পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কি চিন্তা করে নিয়ে বলল, আপনার চিঠিতে একটা লাইন আছে, 'তখন তোমার বিশেষ কথা শোনা যাবে'। এই বিশেষ কথাটা রুমাদেবী আপনাকে নিশ্চয় বলেছিলেন? এখন আমাকে বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?

ইতস্তত করে নীলাংশু বলল, আপত্তি কিছু নেই। তবে একটা বিশ্রী পারিবারিক ব্যাপারকে টেনে আনা হবে, এই যা!

—কথাটা শুনলে হয়ত আমার তদন্তে কিছু সুবিধে হতে পারে। বলুন?

রুমা বলেছিল, আমার দাদা নাকি তার প্রতি ইন্টারেস্টেড। অবশ্য কথাটা আমার কাছে নতুন ছিল না। আমি অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম। তবে জানতাম না, লোভ দেখিয়ে সম্প্রতি তিনি রুমাকে অবৈধ জীবন-যাপনে বাধ্য করবার চেষ্টা করছিলেন।

—হুঁ! আপনার বৌদি এ-সম্পর্কে কিছু জানতেন?

—না। তাঁর মত সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রী যার, সে লোক কিভাবে অন্য মেয়েকে বদপ্রস্তাব দেয়, ভেবে পাই না।

—আচ্ছা, আপনার দাদা আপনার ও রুমাদেবীর ঘনিষ্টতার কথা ইদানিং টের পেয়েছিলেন কি?

—বলতে পারব না।

—আপনিও নিশ্চয় সমস্ত বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন? হত্যাকারী কে হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—ধারণার কথা শুনে আর কি করবেন! তবে এটা ঠিক, আমি চাই হত্যাকারীর শাস্তি হোক!

ঠিক এই সময় ভেতর দিকের দরজার পর্দা সরিয়ে একজন ঘরে প্রবেশ করল। আগন্তুকের বয়স নীলাংশুর চেয়ে বেশি নয়। দীর্ঘাকৃতি ও স্বাস্থ্যবান। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। নীলাংশু দুজনের সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল। জানা গেল, আগন্তুক নীলাংশুর বন্ধু। নাম তপন দত্ত। একই কলেজে দুজনে পড়ায়, একই বাড়িতে থাকে।

তপন বলল, আমি পাশের ঘরেই ছিলাম। আপনাদের কথাবার্তা সবই শুনেছি। নীলাংশু ভাল মানুষ, সে আপনাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছে। আমি হলে কিন্তু অন্য ব্যাপার ঘটত। যা হোক, এবার আপনি আসতে পারেন।

মোলায়েম কোটিং দিয়ে বাসবকে বেরিয়ে যেতে বলে তখন সিগারেট ধরাল। বাসব কিন্তু তার অভদ্রতা গায়ে না মেখে বলল, আপনি অতি মাত্রায় স্মার্ট হবার চেষ্টা করছেন। ওপর-পড়া হয়ে বিপন্ন বন্ধুকে শুধু বাঁচাতে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে না। অন্য কোন গলদ নিশ্চয় আছে। চললাম। আবার দেখা হবে।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিল্টুর কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেল না। সে নীলাংশুর চেহারারই বর্ণনা দিয়েছে। বিল্টু আরোহীকে ডাকবাংলোয় পেঁছে দিয়ে চলে এসেছে, আর কিছু জানে না।

ইতিমধ্যে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টও পাওয়া গেছে। পয়েন্ট থার্টি সিক্স বোরের দুটো গুলি পিঠ ভেদ করে হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়ে বিঁধেছে। মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্যান্য আরো খুঁটিনাটি তথ্য বাসব পড়ল না। রিপোর্ট থেকে সার কথাটুকুও জেনে নিয়েছে। তা হল, হত্যাকারী যেভাবে টার্গেট পাংচার করেছে তাতে মনে হয় সে অব্যর্থ লক্ষ্যর অধিকারী।

বিবেক বলল, কিছু অনুমান করতে পারছেন ?

অ্যাস্ট্রেতে পাইপ ঝাড়তে ঝাড়তে বাসব বলল, খুনের মোটিভ এখনও ধরতে পারিনি। তবে কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে কেসটা তেমন জটিল নয়। বিরাট একটা ফাঁক আছে। ফাঁকটা দেখতে পাচ্ছি না, এই যা। এখন চল, হিমাংশুবাবুর বাড়ি একবার ঘুরে আসা যাক।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। থানা থেকে খুব বেশি দূরে নয় গন্তব্যস্থল। হিমাংশুবাবু বাড়িতেই ছিলেন। সমাদর করে বসালেন ওদের। হত্যাকারীকে ধরা যাবে কিনা ইত্যাদি ধরনের গোটাকয়েক প্রশ্ন করলেন তিনি। বাসব উত্তর দিতে দিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল ঘরখানার ওপর। বুঝতে পারা যায় গৃহস্বামীর শুধু অর্থ নয়, রুচিও আছে।

—মিসেস গুপ্ত কি এখন আমাদের কাছে আসতে পারবেন ?

বাসবের প্রশ্নের উত্তরে হিমাংশুবাবু বললেন, খুব ভেঙে পড়েছিল। এখন একটু সামলেছে। ডেকে আনছি।

তিনি চলে গেলেন এবং মিনিট কয়েক পরে ফিরে এলেন সস্ত্রীক। সুশ্রী মহিলা বলতে যা বোঝায়, কণা তাই। তবে এখন তাকে বেশ শুকনো দেখাচ্ছে। বোনের মৃত্যুতে মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। স্ত্রীর সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার গুপ্ত। কণা নমস্কার জানিয়ে বসল।

—আপনার মনের অবস্থা ভাল নেই জেনেও আপনাকে আমরা বিরক্ত করতে এসেছি। অবশ্য আপনি নিশ্চয় চান, হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

বাসবের কথার উত্তরে ধীর গলায় কণা বলল, হত্যাকারীকে ধরেই বা কি

লাভ ? রুমা তো আর ফিরে আসবে না ?

—আপনার বোন আর ফিরে আসবে না, এটা ঠিক। তবে লাভ নেই, একথা বলা চলে না। যে এত বড় অন্যায় করেছে, তার শাস্তি হবে না, এটা ঠিক নয়। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক! রুমাদেবী আপনার কাছে প্রায়ই আসতেন ?

—কলেজে ছুটি থাকলেই আসত।

—আপনার কি একবারও মনে হয়নি, উনি কাউকে ভালবাসেন ?

—না। তবে ওর সঙ্গে অনেকেই ঘনিষ্টতা করবার চেষ্টা করত। যেমন···

—বলুন ?

—আমার দেওরের বন্ধু তপন ওর প্রতি ইণ্টারেস্টেড ছিল। বছরখানেক আগে আমায় বলেছিল রুমাকে সে বিয়ে করতে চায়।

—রুমাদেবী একথা জানতেন ?

—আমি তাকে বলেছিলাম। সে রাজি হয়নি।

—আপনার দেওর ? তাঁর মনের ভাব কেমন ছিল ?

—সে কখনও কিছু আমায় বলেনি। তার মনের কথা বলতে পারব না।

—তিনি কি আসেন এ বাড়িতে ?

স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কণা বলল, খুব কম। যখন উনি বাড়ি থাকেন না সেই সময় আসে।

—আপনার বাবাকে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়েছে কি ?

—তার করা হয়েছে। বাবা বোধহয় এখানে আসবেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না।

—আপনার বাবার ঠিকানাটা আমায় দিন তো!

সেণ্টার টেবিলের ওপর প্যাড রাখা ছিল। হিমাংশুবাবুর কাছ থেকে কলম চেয়ে নিয়ে কণা ঠিকানা লিখে দিল।

—আপনাকে আর বিরক্ত করব না, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

কণা চলে যাবার পর বাসব গুপ্তকে প্রশ্ন করল, আপনার রিভলবার আছে ?

—আছে।

—কবে কিনেছেন ?

—তা বছর চারেক হবে। কেনাই সার। আজ পর্যন্ত একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। ব্যবসাদার মানুষ, বুঝলেন না—কখন বিপদ-আপদ এসে পড়ে, তাই ডিফেন্সের জন্য কিনেছিলাম।

—রিভলবারটা নিয়ে আসুন একবার।

গুপ্ত চলে গেলেন। বিবেক এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবার শুধু হাসল। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ভ্রু কুঁচকে কি চিন্তা করতে লাগল।

রেক্সিনে মোড়া সুদৃশ্য একটা বাক্স হাতে নিয়ে হিমাংশু ফিরে এলেন।

তাঁর হাত থেকে নিয়ে বাসব বাক্সর ডালা খ্রলল। সার্টিনের খাঁজের মধ্যে অস্ত্রটা আটকে রয়েছে।

বাক্সর ডালা বন্ধ করে বাসব বলল, এটা থার্টি সিক্স ক্যালিবারের মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—বিবেক, এটা রাখ। থানায় নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু··

—আশঙ্কার কিছ্র নেই। উপয্রক্ত সিকিউরিটি দিয়েই জমা রাখা হবে। কাজ হয়ে গেলেই ফিরে পাবেন। ভাল কথা, রিভলবারটা নিয়ে নিশ্চয় আর কেউ নাড়াচাড়া করে না ?

—কে করবে, বল্রন ? বছর চারেক ধরে ওটা আমার আলমারির ড্রয়ারে পড়ে আছে। আচ্ছা, আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন ?

—আমাদের সকলকেই সন্দেহ করতে হয়।

বাসব নিভন্ত পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরপর দ্রটো দিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল বাসব ও বিবেকের।

থানায় ডাকিয়ে আনা হয়েছিল তপন দত্তকে। প্রথমে সে তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বেঁকিয়ে-চুরিয়ে কথা বলছিল। তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে জেরায় অস্থির করে কিছ্র কথা বার করা সম্ভব হয়েছে। র্রমার প্রতি তার দ্রর্বলতা ছিল এবং তাকে চিরদিনের মত নিজের করে পেতে চেয়েছিল। এত ঘনিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও সে মোটেই জানত না নীলাংশ্র ও র্রমার মধ্যেকার গাঢ় সম্পর্কের কথা। কিছ্রদিন আগে নীলাংশ্রই রহস্য ফাঁস করে এবং এও জানায় যে, তাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে। তপনের মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়—সে হিংস্রটে হয়ে পড়ে। নীলাংশ্রকে অস্রবিধেয় ফেলার জন্য ফোন করে সমস্ত কথা জানিয়ে দেয় মিসেস গ্রপ্তাকে। এরপর স্ত্রীর ম্রখ থেকে একথা শ্রনে বড়ভাই ছোটভাইকে ডেকে কিছ্র বলেছিলেন কিনা, কিংবা র্রমাকে কিছ্র বলা হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই।

বাসব কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের মিঃ সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল একটা বিষয়ের অন্রসন্ধানের অন্ররোধ নিয়ে। ত্রিশ ঘণ্টা পরে মিঃ সামন্ত সন্তোষজনক উত্তরই দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বাসব মিঃ গ্রপ্তর বাড়ির চাকর, ড্রাইভার, বাম্রন ও ঝিকে আলাদা আলাদা ডাকিয়ে কথাবার্তা বলেছে। এইটুকু শ্রধ্র কাজ নয়। ওকে আরো কাজ করতে হয়েছে। দিল্লী থেকে তদন্ত সেরে ফিরছিল। স্রতরাং অন্যান্য অনেক কিছ্রর সঙ্গে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট তোলার যন্ত্রপাতিও ছিল। সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই ও টর্চ ও রিভলবারের ওপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট তুলে নিয়েছে। এবং

অস্ত্রটার কেমিক্যাল এনালিসিসও হয়েছে।

সন্ধ্যার সময় বাসব বিবেককে সঙ্গে নিয়ে হিমাংশু গুপ্তর বাড়ি গেল। গুপ্ত সবে নিজের কর্মস্থল থেকে ফিরেছেন। ড্রইংরুমে বসে সস্ত্রীক চা খাচ্ছিলেন। ওদের দেখে যে খুশি হলেন না, তা তাঁর কথাতেই প্রকাশ পেল।

—এইভাবে যদি যখন-তখন হানা দেন, তাহলে আমাদের শান্তি বজায় থাকে কি ?

বাসব বলল, বিরক্ত হচ্ছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা উপায়হীন। কেসটা শেষ করতে হবে তো! শুনলে খুশি হবেন, হত্যাকারীকে আমরা চিনতে পেরেছি। সেই সূত্রেই এখানে আসা।

—তাই নাকি! বসুন—বসুন! হত্যাকারীকে চিনে থাকলে গ্রেপ্তার করুন। আমার এখানে কেন এলেন বুঝলাম না!

—কারণ, আপনাকে আমার কিছু কথা জানানো দরকার। যেমন আপনি বলেছিলেন, আপনার রিভলবারটা নাকি একবারও ব্যবহার হয়নি। চার বছর ধরে আলমারিতে পড়ে আছে। কথাটা সত্যি নয়। অতি সম্প্রতি ওই রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

উত্তেজিতভাবে গুপ্ত বললেন, অনর্থক মিথ্যা কথা বলা আমার স্বভাব নয় মশাই। আমার রিভলবারের বিষয় আপনি আমার চেয়ে বেশি জানবেন ?

—আপনি যতই জোর দিয়ে কথা বলুন, কেমিক্যাল এনালিসিসে যা ধরা পড়েছে তা মিথ্যা হতে পারে না। আপনি মিথ্যা কথা যে বলেন, তার প্রমাণ আমার কাছে যে একেবারেই নেই, তা নয়। রুমাদেবীর প্রতি আপনার তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাঁকে আপত্তিকর প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কই, একথা আমাদের জানিয়েছিলেন কি ?

কণা বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

ফেটে পড়লেন হিমাংশু, মিথ্যা কথা! আমার বাড়িতে বসে আমাকেই যা-তা বলবেন ? জানেন, আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে বলতে পারি ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, জানি। তবে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখান থেকে এক পাও আমাদের নড়াতে পারবেন না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম! আপনার স্বভাবের কথা রুমাদেবী জানিয়েছিলেন নীলাংশুবাবুকে। নীলাংশুবাবু আমাকে বলেছেন।

—সে তো আমার বিরুদ্ধে বলবেই! তার স্বভাবই ওই রকম। আপনি ভেবে দেখুন, এই ধরনের কথা রুমার পক্ষে কি নীলুকে বলা সম্ভব ?

—স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোন সঙ্কোচ না থাকাই স্বাভাবিক।

এতক্ষণে কথা বলল কণা, স্বামী-স্ত্রী !!

—আপনি কেন আশ্চর্য হচ্ছেন, মিসেস গুপ্তা ? তপনবাবুর মুখে সবই

তো শুনেছেন! তাছাড়া আপনি এও জেনে ফেলেছিলেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার বোনের সম্পর্ক ঘোরাল পথ ধরছে। আপনার মনে এই ধারণাই দৃঢ় হয়ে উঠেছিল যে, রুমাদেবী দুই ভাইকে নাচাচ্ছেন। নীলাংশুবাবুর জন্যে আপনার মাথাব্যথা নেই—আপনি চিন্তিত হলেন নিজের জন্যই। হিমাংশুবাবুকে এই চক্র থেকে বার করতে না পারলে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমার যতদূর ধারণা, শুধু সেই জন্যেই আপনি···

—কি সমস্ত আজে-বাজে বলছেন?

—ভুল যে বলছি না, তা আপনি ঠিকই জানেন। কলকাতা পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানিয়েছে, আপনি রাইফেল ক্লাবের সদস্যা ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কয়েকবারই পিস্তল চালনায় আপনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঝাঁজের সঙ্গে হিমাংশু বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো? মহিলাদের সম্মান দিয়েই আপনাদের কথা বলা উচিত!

–নিশ্চয়। তবে কি জানেন, চরম সত্য প্রকাশ করতে গেলে একটু রূঢ় হতেই হয়। আপনি নিজেকে শক্ত করুন, মিস্টার গুপ্ত। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনার স্ত্রী নিজের বোনকে গুলি করে মেরেছেন।

—সেকি !!!

—না, না, আমি কিছু জানি না। কণা কোচের হাতলে মাথা রাখল।

বাসব পকেট থেকে টর্চটা বার করে বলল, এটা ডাকবাংলোয় পাওয়া গেছে। এর ওপর থেকে যে শুধু আপনার হাতের ছাপ তোলা সম্ভব হয়েছে তাই নয়, আপনাদের চাকর নারায়ণ আমার কাছে স্বীকার করেছে, সে এই টর্চ বাজার থেকে কিনে এনেছিল। এরপর আসছে ড্রাইভার রামপ্রকাশের কথা। সে আপনাকে সেদিন সন্ধ্যায় ডাকবাংলোর পেছন দিকে নিয়ে গিয়েছিল। একথা আমার কাছে রামপ্রকাশ স্বীকার করেছে। বেচারা অজান্তেই এই হত্যাকাণ্ডে আপনাকে সাহায্য করেছে। রিভলবারটাও আপনাকে চিনিয়ে দিতে আমাদের সাহায্য করেছে। মিঃ গুপ্তর আলমারিতে ওটা বহুদিন থেকে পড়ে ছিল। ওটার ওপর আপনার হাতের ছাপ পাওয়া একটু অস্বাভাবিক নয় কি? আমার ধারণা, রাগে আপনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। ঠাণ্ডা মাথায়, প্ল্যান করে যদি খুনটা করতেন, তাহলে এত স্থূল প্রমাণ চোখে পড়ত না। যাক, আমার কাজ শেষ হয়েছে। বিবেক, বাকিটা তুমি সহজেই সামলে নিতে পারবে মনে হয়। চলি—!

কণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গুপ্ত কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

বাসব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পয়েণ্ট থ্রি ম্যাগনাম

রাজনাথ করচৌধুরী হোয়াট নটের সামনে এসে থামলেন।

বাইরে তখন জাফরাণী সন্ধ্যা। এই সময় প্রতিদিন তিনি ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে ব্যস্ত থাকেন। আজ শরীর অসুস্থ থাকায় যে যেতে পারেননি তা নয়, ক্লাবে যাননি অন্য কারণে। বিকেলের ডাকে একখানা চিঠি পেয়েছেন। ওই চিঠিখানাই তাঁর মনে দারুণ অস্বস্তিবোধ জাগিয়ে তুলেছে।

হোয়াট নটের ওপরই সিগারের বাক্স ছিল। একটা সিগার তুলে নিয়ে রাজনাথ সোফায় এসে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তিত মনে পদচারণা করছিলেন। এখন কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছেন। তিনি এখন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার। অবশ্য প্রথম যৌবনে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছেন। তারপর ধৈর্য, ঐকান্তিক পরিশ্রম ও ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ধীরে ধীরে আজকের বৈভবে পেঁৗছন। এই প্রসঙ্গে একটি নাম স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে, তিনি কালীকিঙ্কর হাজরা। তাঁর এই বন্ধুটি তাঁর এই রুপোর সিঁড়ি তৈরি করার সময় নিদারুণ সাহায্য করেছিলেন।

তারপর নানা কারণে দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় দেশ স্বাধীন হবার মুখে। কালীকিঙ্কর তখন ঢাকায় ছিলেন। ঢাকায় প্রবাহিত হচ্ছিল সেই সাম্প্রদায়িকতার রক্তস্রোত। রাজনাথের মনে হয়েছিল বন্ধু দাঙ্গাতেই প্রাণ হারিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ বাইশ বছর পরে সেই কালীকিঙ্করের হাজরার চিঠি পেয়েছেন তিনি আজ।

কালীকিঙ্কর লিখেছেন, সোমবার রাত আটটার মধ্যে দেখা করতে আসছেন। প্রয়োজনীয় কথা আছে। তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা যেন না করা হয়।

আর ঘণ্টা দেড়েক পরেই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। রাজনাথ এক একসময় ভাবছেন, যদি সাক্ষাত না-ই করেন কালীকিঙ্করের সঙ্গে, তাহলে কি এমন ক্ষতি হবে? আবার মনে হচ্ছে, আসুক। কি বলতে চায় এতদিন পরে সেটাও শোনা যাক।

রাজনাথ সিগার ধরালেন।

পাঁশুটে রঙের গাঢ় ধোঁয়া ক্রমাগত মুখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করতে লাগল। সময়ও এগিয়ে চলল ওই তালে। একসময় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। বেয়ারা ঢুকল ড্রইংরুমে ট্রে হাতে করে। ট্রে-র ওপর থেকে কার্ডটা তুলে নিয়ে আগন্তুককে এখানে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন।

মিনিট দুয়েক পরে একজন ঘরে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘকায়, বলশালী

পুরুষ। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। নিখুঁত সাহেবী পোশাকে তিনি সজ্জিত। দু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। গৃহকর্তার অনুরোধের অপেক্ষা না করেই তিনি কোচে বসলেন। তাঁর ভঙ্গিতে কিছুটা বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

—কেমন আছ, চৌধুরী?

রাজনাথ আগন্তুককে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। বললেন, মন্দ কি! বহু বছর পরে আবার যে আমাদের দেখা হবে ভাবতেই পারিনি!

—এ জীবনে আর দেখা না হলে তুমি যে খুশি হতে, তা আমি জানি।

—ও কথা কেন বলছ কালীকিঙ্কর? আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি ভেবেছিলাম·

বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে কালীকিঙ্কর বললেন, দাঙ্গায় মারা গেছি। মারা যে যাইনি, তা দেখতেই পাচ্ছ। এই বাইশটা বছর আমি পাকিস্তানে আটকে ছিলাম বিশেষ এক ব্যাপারে। যাক, সেকথা। ভালই আছ তাহলে?

—তুমি যে খুব মন্দ আছ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না!

—পাকিস্তানে চমৎকারভাবেই ছিলাম বলা চলে। তবে বর্তমান জঙ্গী সরকারের আমলে ওখানে আর টেঁকা গেল না। এদেশে এখন আমি নিতান্তই আগন্তুক। তবে শক্ত মাটিতে দাঁড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে, এই যা রক্ষে!

রাজনাথ সতর্কতার সঙ্গে বললেন, শক্ত মাটি? মানে·······

—বুঝতে পারছ না! তুমি যখন রয়েছ তখন আমার আর ভাবনা কি?

—তা বটে! লাগেজ-পত্তর নিয়ে এখানে চলে এস। আমার বাড়িতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

—একসঙ্গে ভাই দুজনের থাকা চলবে না। বরং বাড়িটা পার্টিশন করিয়ে নেওয়া যাক। কালই কনট্রাকটারকে খবর দেওয়া যেতে পারে।

—তার মানে? তুমি কি বলতে চাইছ!

উচ্চহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করে তুললেন কালীকিঙ্কর। তোমার অবুঝ হবার এই ভঙ্গিটুকু সত্যি চমৎকার। কিন্তু নিরর্থক এই অপচেষ্টায় লাভটা কি? লোকে না জানুক—তুমি তো জান, তোমার যা কিছু আছে তার অর্ধেকের অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ নয়!

বন্ধু ঘরে প্রবেশ করার পর থেকেই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন রাজনাথ। এবার সমস্ত কিছুকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন। দৃঢ় গলায় বললেন, না। আমার যা কিছু আছে তা সমস্ত একান্ত আমারই।

—তুমি অস্বীকার করছ, তোমার আজকের বৈভবের মূলে আমি নেই? ব্যবসা আরম্ভের সময় আমার অর্ধেক মূলধন কি ছিল না?

—না। ছিল না।

—চৌধুরী—

—আমার বাড়িতে বসে আমাকে চোখ রাঙিও না কালীকিঙ্কর। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে··

—গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পার! মেজাজটা খুব কড়া সুরেই বেঁধেছ দেখছি! কিন্তু আমাকে যে দমানো যাবে না, ভাই। নিজের দাবী আদায় না করে আমি তো ক্ষান্ত হব না!

—আমার কাছে তোমার কোন পাওনা নেই।

—ব্যবসার অর্ধেকটাই তো আমার। এতদিনে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেছ। সে সব কথা ছেড়েই দিলাম। এখন শুধু নিজের অংশটুকু পেলেই খুশি। কাগজপত্র সবই আছে। ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়াক, নিজের সম্মানের কথা ভেবে তা তুমি নিশ্চয় চাইবে না?

এবার রাজনাথের হাসবার পালা। বলল, তুমি কি ভেবেছ আমি সেই পলকা সুতোয় ব্যবসাকে ঝুলিয়ে রেখেছি? না কালীকিঙ্কর, তা নয়। দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর জেনে-শুনেই আমি যৌথ ব্যবসাকে ফেল করিয়েছি। তারপর ঐ মূলধনে নিজের নামে আরম্ভ করেছি নতুন ব্যবসা। তাই বলছিলাম, ও সমস্ত কাগজপত্র কোর্টে গ্রাহ্য হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আবার পাকিস্তানে ফিরে যেতে পার।

কালীকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইলেন। যতটা সহজে কাজ উদ্ধার করবেন ভেবেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এই ক-বছরে বন্ধুবর যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছেন বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তিনি কোচ ছেড়ে উঠলেন, তোমার প্রচুর উন্নতি হয়েছে দেখছি! সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না, তখন বাঁকা পথেই শক্তি-পরীক্ষা হোক। যাবার আগে শুধু এইটুকু বলে যাই, নিজের দাবী কিভাবে আদায় করতে হয়, তা আমি ভালভাবেই জানি।

তিনি দরজার দিকে এগোলেন।

—শোন কালীকিঙ্কর, আমার একটা প্রস্তাব আছে। হাজার হোক তুমি আমার পুরনো বন্ধু। খালি পকেটে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াও, এটা ভাল দেখায় না। হাজার দশেক টাকা দিচ্ছি—একটা দোকান-টোকান করলে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান হয়ে যাবে।

—থাক, আর বদান্যতায় কাজ নেই। কালীকিঙ্কর দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

রাজনাথ আবার সিগার ধরালেন। আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে মনে শান্তি আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু পরিবর্তে মন ক্রমেই খিঁচড়ে উঠতে লাগল। অবশ্য তাঁর জীবনে কালীকিঙ্করের অবদান অনেক। সে যা বলে গেল তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। তবু আজকের এই সোনালী দিনে সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন মানে হয় না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই রাজনাথ স্থির

করে ফেললেন, এই মুহূর্ত থেকে কালীকিঙ্কর নামে কাউকে তিনি চেনেন না।

ওদিকে কালীকিঙ্কর 'চৌধুরী হাউস' থেকে বেরিয়েই গুরুসদয় দত্ত রোডের নির্জনতার মধ্যে এসে পড়লেন। শুধু নির্জন নয়, কিছুটা অন্ধকারও। চিন্তার ভারে নত হয়ে শ্লথ গতিতে এগিয়ে চললেন গড়িয়াহাট রোডের দিকে। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছেন, এমন সময় কানে এল, কাজ গোছাতে পারলেন ?

সচকিত কালীকিঙ্কর এধার-ওধার তাকালেন। দেখলেন, হাত তিনেক দূরে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে তার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

ধারে-কাছে যখন আর কেউ নেই তখন কথাটা ওঁকেই উল্লেখ করে বলা হয়েছে নিশ্চয়। তবু তিনি এগিয়ে চললেন।

দণ্ডায়মান ব্যক্তি আবার বলল, নিরাশ হয়ে ফিরছেন বোঝা যাচ্ছে। আমার সঙ্গে হাত মেলালে উপকার পাবেন।

কালীকিঙ্কর থামলেন। কে আপনি ?

—রাজনাথ করচৌধুরীকে যারা বিপাকে ফেলতে পারে, আমি তাদের মধ্যে একজন।

—কি বলতে চাইছেন ?

—এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার চাইতে 'ড্রিমল্যাণ্ড' বার-এ বসে আলাপ-আলোচনা করাটাই বোধহয় সুবিধেজনক হবে।

—'ড্রিমল্যাণ্ড' বার !

—হ্যাঁ। ওখানে আবার রাজনাথ করচৌধুরীর বড় ভাইপো সঞ্জয়ের যাতায়াত আছে। দেখা হয়ে গেলে কাজের সুবিধেই হবে।

কালীকিঙ্কর উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। লোকটা প্রকৃতপক্ষে তার কাছে চায়টা কি ? এই কারণেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত কি ঘটে, তা দেখার আগ্রহ বিদ্যমান রইল।

—চলুন ! কিন্তু আপনার পরিচয়টা····

—আমি বিশ্ববিকাশ দত্ত। আপনার বন্ধুর ফার্মের ম্যানেজার ছিলাম। অন্যায়ভাবে আমাকে উনি তাড়িয়েছেন।

—হুঁ ! আমি এখানে কি জন্যে এসেছিলাম আপনি তা জানলেন কিভাবে ?

—ও বাড়ির একটা বেয়ারা আমার অনুগত। টাকা খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে আর কি ! সে আপনাদের সব কথাই শুনেছিল।

কথায় কথায় তাঁরা ট্রাম রাস্তার মুখে এসে পড়েছেন।

'ড্রিমল্যাণ্ড' বারের কাচের দরজা উন্মুক্ত না করলে বুঝতে পারা যায় না, ভেতরটা কি রকম জমজমাট। টেবিলের চারপাশ ঘিরে মদিরা পিয়াসীরা

বসে। কাচপাত্রের ঠুনঠান্ শব্দ ছাড়াও একটা চাপা গুঞ্জন বিরাজ করছে হলে। অনেকে আবার কেবিনের মধ্যে ঢুকে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন।

সঞ্জয় কোণের দিকে একটা টেবিলের সামনে বসেছিল। হুইস্কির বোতলটা ভরা ছিল নিশ্চয়, এখন অর্ধেক রয়েছে। টেবিলের চারধারের বাকি তিনটে চেয়ার খালি থাকলেও, সামনে একজন দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল ঃ

—দাদা, তোমাকে বার বার মানা করছি, শুনছ না। নিজের ভবিষ্যৎ এভাবে কেন নষ্ট করছ বলতে পার? দীপকদা সমস্ত গুছিয়ে নিলে আমরা যে পথে দাঁড়াব, সেকথা একবারও ভেবে দেখেছ কি?

অনেকখানি অ্যালকহল পেটে পড়লেও সঞ্জয় বেদম হয়ে পড়েনি। পুরনো অভ্যাস, তাই জ্ঞান তার ভালই আছে। সে একটু থেমে থেমে বলল, অজয়, বার-এ আসা আজ আমার শেষ দিন। কাল থেকে দারুণ সিরিয়াস হয়ে পড়ব।

—ও কথা বহুবার বলেছ। কিন্তু আজ পর্যন্ত নেশার দাসত্ব থেকে সরে আসতে পারলে না।

—এবার দেখ, আমি নিশ্চিত নিজের স্বভাব পাল্টে ফেলব। এমনকি, কালই হয়ত বুড়োর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হতে পারে। তুমি যাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি।

অজয় আর কিছু না বলে ধীর পায়ে হল থেকে বেরিয়ে গেল। বিড় বিড় করে বকতে বকতে সঞ্জয় গেলাসটা তুলে নিল। এই সমস্ত উটকো ঝামেলা দেখা দিলে কি নেশা জমে?

ঠিক এই সময় বিশ্ববিকাশ কালীকিঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে বার-এ প্রবেশ করল। খুঁজে-পেতে একটা টেবিল পাওয়ার পর বিশ্ববিকাশ বলল, অলিভ রঙের স্যুটপরা লোকটাকে দেখছেন—ওই যে কোণের দিকে বসে আছে? ওই হল করচৌধুরীর বড় ভাইপো, সঞ্জয়।

সঞ্জয়কে একবার দেখে নিয়ে কালীকিঙ্কর বললেন, এবার আপনার কথা বলুন।

—আমার ও আপনার একই কথা। দুজনের স্বার্থে ঘা পড়েছে, আমরা কেউই আঘাতকারীকে ছাড়ব না।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে?

—আমি কাজ ছেড়ে আসবার সময় অনেক মূল্যবান কাগজপত্র সরিয়ে এনেছি। এখনও আপনার বন্ধু তা বুঝতে পারেননি। এছাড়া ওঁর ফোলিওটা আমি ওই বেয়ারার সাহায্যে সরিয়ে ফেলতে পারব। ওই সমস্ত কাগজপত্রের ওপরই নির্ভর করছে 'করচৌধুরী কনসার্নের' সমস্ত কিছু। ওগুলো আপনাকে দেব। তাহলেই আপনি বন্ধুকে হাতের মুঠোর মধ্যে

পাবেন।

—এতে আপনার স্বার্থ?

একগাল হেসে বিশ্ববিকাশ বলল, স্বার্থ ছাড়া এ জগতে কেউ কি কারুর জন্য কিছু করে? আমি একজন উদারচেতা, দাতা একথা কেউ বলবে না। বিনিময়ে কুড়ি হাজার।

—কুড়ি হাজার টাকা!

আগেই বলা ছিল। বয় বিয়ারের বোতল, গেলাস ইত্যাদি দিয়ে গেল। গেলাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে বিশ্ববিকাশ বলল, ওর কমে রাজি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি কতখানি উপকৃত হচ্ছেন একবার ভেবে দেখেছেন কি?

—কিন্তু কাগজগুলো···

—ভালভাবে পরীক্ষা করে নেবেন। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দেখাতে পারি।

—আর ফোলিওটা?

—আজ রাত্রেই পাবেন। কিন্তু স্যাটিসফাই হবার পরই ট্রানজাকশন শেষ হওয়া চাই। আমি টাকা ঝুলিয়ে রাখব না।

—বেশ!

এক চুমুকে আধ গেলাস বিয়ার শেষ করে কালীকিংকর আবার বললেন, রাজনাথ আমাকে এইভাবে ঠকাবে ভাবতে পারিনি। ইচ্ছে করছিল, ওকে বুলেটের ঘায়ে ঝাঁজরা করে দিই। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। মনে হচ্ছে ওকে দারুণ বিপাকে ফেলতে পারব।

—বোতলটা শেষ করে চলুন ভাইপো-প্রবরের সঙ্গে আলাপ করা যাক।

—তাতে লাভ?

—লাভ আছে মশাই।

আর কথা হল না। বোতল শেষ করার জন্য দুজনের ব্যস্ততা দেখা গেল।

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে।

নিজের শোবার ঘরে হ্যারিংটন চেয়ারে রাজনাথ বসে আছেন। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছেন অনেকক্ষণ ধরে—ঘুম আসেনি। তারপর চেয়ারে বসে বই পড়তে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তাতেও মন বসাতে পারছেন না। কালীকিংকরের কথা অবিরাম মনের মধ্যে ওঠা-নামা করছে। ওর সঙ্গে দেখা না করলেই ভাল করতেন।

রাজনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। টাইমপিসটার ওপর দৃষ্টি পড়ল, বারোটা পঁয়ত্রিশ। অনেক রাত হয়ে গেছে। স্লিপিং পিল না খেলে ঘুম বোধহয় আসবে না। সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল।

টেবিল বা ঐ জাতীয় কিছু টানার অল্প শব্দ। দ্রুত দরজা খুলে বারান্দায় এলেন রাজনাথ। দেখলেন, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অজয়। সে তাঁকে দেখেই দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল।

—শোন—

অজয় থামল।

—কি করছিলে ওখানে?

—কিসের একটা শব্দ হল, তাই দেখতে এসেছিলাম।

—এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ যে?

—না, মানে ·· ঘুম আসছিল না।

—বুঝতে পেরেছি, সঞ্জয়ের অপেক্ষা করছিলে। নিজের লিভারটা না পচিয়ে ছোকরা ছাড়বে না। দীপক কোথায়?

—উনি নিজের ঘরেই আছেন।

—যাও, শুয়ে পড় গিয়ে।

রাজনাথ নিজের ঘরে ফিরে এলেন। সিগার ধরিয়ে সবে কয়েকবার টান দিয়েছেন, আবার একটা শব্দ কানে এল। সতর্ক ছিলেন—ঝটিতে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখলেন, কে একজন আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। রাজনাথ বাধা দিতে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে। কোনরকমে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। আঘাতকারী তখন সিঁড়ির বেশ কয়েক ধাপ নেমে গেছে। তিনি অনুসরণ করলেন তাকে।

অজয় বেরিয়ে এসেছিল নিজের ঘর থেকে। হুটোপুটির শব্দ দীপকেরও কানে গিয়েছিল। সেও বেরিয়ে এল। দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কি ঘটেছে বোঝা যাচ্ছে না তো!

দীপক বলল, মামার ঘরের দরজা খোলা। উনি কি কোন বিপদে পড়লেন?

অজয় বলল, কিছুক্ষণ আগে উনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন।

দীপক রাজনাথের ঘরের দিকে অগ্রসর হল। অজয় নেমে চলল সিঁড়ি দিয়ে। বোধহয় দু-মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে—তারপরই গভীর রাতের স্তব্ধতাকে খান খান করে পর পর দুবার গুলির শব্দ পাওয়া গেল এবং ওই সঙ্গে ভরে উঠল চতুর্দিক তীক্ষ্ণ করুণ আর্তনাদে। মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল বাড়িটা। আউট-হাউস থেকে বেয়ারারা ছুটে আসতে লাগল। দীপক দ্রুত নেমে এল নিচে। সদর দরজার গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন রাজনাথ। অজয় হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে হাত কয়েক দূরে।

দীপক চিৎকার করে বলল, অজয়, ডাঃ সেনকে রিং কর গিয়ে।

অজয় সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটল টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে। বেয়ারারা

এসে পড়েছিল। রাজনাথকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও তাঁর বাঁ হাত দিয়ে অবিরাম রক্ত গড়াচ্ছে। বিস্ময়ের তখনও কিছু বাকি ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ডাঃ সেন এসে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

বললেন, ভয়ের কিছু নেই। বুকে বা পেটে লাগলে দেখতে হত না। হাতের সামান্য মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি, এই-যা রক্ষে! কিন্তু গুলি করল কে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? রাজনাথের জ্ঞান ফিরে এলে যদি কিছু আলোর সন্ধান পাওয়া যায়!

এই সময় বাগানে কোলাহল শোনা গেল। আবার কি হল? দীপক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বাগানের সমস্ত আলোগুলো জ্বলছে, আর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে একটা পড়ে থাকা দেহকে ঘিরে তিনজন বেয়ারা মহা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

ওখানে আবার কে পড়ে আছে? দীপক ছুটল বাগানে। ঘটনাস্থলে পেঁাছে যা কল্পনা করা যায় না, সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

গোলাপ গাছের কেয়ারির পাশে সঞ্জয় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জল, কাদা ও গাঢ় রক্তে তার সমস্ত শরীর মাখামাখি। ডাঃ সেনও পিছু পিছু এসেছিলেন। দেহ পরীক্ষা না করেই গম্ভীর গলায় বললেন, শেষ হয়ে গেছে। কি সমস্ত ঘটে চলেছে এ বাড়িতে! আর দেরি নয়, পুলিশে খবর দাও।

অজয় তখন দোতলার জানলা থেকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করছে, কি হয়েছে দীপকদা? ওখানে কে পড়ে আছে?

কি বলবে দীপক ভেবে পেল না। এরকম মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে মানুষ পড়ে? নিজের স্তম্ভিত ভাবটা কোনরকমে কাটিয়ে অজয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপায়ে দীপক পুলিশকে ফোন করার উদ্দেশে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাতে কোন কাজ ছিল না। বলতে গেলে আড্ডা দেবার উদ্দেশেই বাসব লালবাজারে গিয়েছিল হোমিসাইড স্কোয়াডের মিঃ সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে। সামন্ত নিজের ঘরেই ছিলেন। তবে তৈরি হচ্ছিলেন বাইরে যাবার জন্য। বাসবকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানালেন।

বাসব বলল, এসেছিলাম গল্প-গুজব করতে। আপনি তো বেরুচ্ছেন।

—আপনিও চলুন না সঙ্গে! খুব ইন্টারেস্টিং কেস।

—কোথায়?

—গুরুসদয় রোডে। এক শিল্পপতির ভাইপো খুন হয়েছে। তিনিও আহত হয়েছেন আততায়ীর গুলিতে।

—চলুন, দেখা যাক রহস্য কতটা গভীর।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুজনে ঘটনাস্থলে পৌঁছল। পুলিশ পাহারা মোতায়েন রয়েছে বাড়িটায়। স্থানীয় থানার ও. সি. রমেন ধরের সঙ্গে পার্লারেই দেখা হল। তিনি তখন একজন বেয়ারাকে জেরা করছেন। আর সকলের স্টেটমেণ্ট গত রাত্রেই নেওয়া হয়ে গেছে। তার কপিও পাঠানো হয়েছে হোমিসাইড স্কোয়াডকে। এই বেয়ারা রাত্রে বাড়ি ছিল না, তাই এখন জেরা করা হচ্ছে। সামন্ত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন। রাজনাথ বিছানায় শুয়ে ছিলেন। বাঁ হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজ। তাঁকে কিছুটা কাহিল ও শোকার্ত দেখাচ্ছে। অজয় ও দীপক রয়েছে সেখানে। ডাঃ সেনও আছেন। সামন্ত নিজের পরিচয় দিলেন। বাসবের পরিচয় দিতেও ভুললেন না।

রাজনাথ বললেন, এরকম মর্মন্তুদ ঘটনা যে আমার বাড়িতে ঘটবে স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেটা বয়ে গিয়েছিল ঠিকই, তাই বলে এইভাবে খুন হয়ে যাবে?

—আপনি উতলা হবেন না, মিঃ চৌধুরী। সামন্ত বললেন, আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার।

—হত্যাকারী ধরা পড়লেও কিছুটা সান্ত্বনা। সৌভাগ্যক্রমে বাসববাবু এসে পড়েছেন। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে তাঁর সহযোগিতা আমি চাইছি। অবশ্য তাঁর যা ফি তা আমি দেব।

সামন্ত বললেন, বেশ তো। উনিও লেগে পড়ুন।

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমার আপত্তি নেই। কাজ এখুনি আরম্ভ করা যেতে পারে। আমি একাই মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। বাকি সকলে যদি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করেন তাহলে ভাল হয়।

অজয়, দীপক ও ডাঃ সেন বাইরে চলে গেলেন।

সামন্ত বললেন, আমিও যাই। ধর কতদূর কি করল দেখি গিয়ে।

তিনিও বেরিয়ে গেলেন।

বাসব কাল সকাল থেকে এই দুর্ঘটনা পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি শুনতে চাইল। রাজনাথ বললেন একে একে। কালীকিঙ্করের সঙ্গে তাঁর কি কথাবার্তা হয়েছিল তাও লুকোলেন না।

—আপনি তাহলে চাদর-মুড়ি দেওয়া লোকটাকে চিনতে পারেননি?

—না। সে বোধহয় স্টাডিতে ঢুকেছিল চুরি করতেই।

—কিছু চুরি গেছে কিনা লক্ষ্য করেছেন?

—কি করে করব! আহত অবস্থায় তো এ ঘরে পড়ে আছি।

—আপনি নিচে পৌঁছবার পর কি হল?

—আমি যখন পার্লারে পৌঁছেছি তখন লোকটা বাগানে নেমে গেছে। বেয়ারাদের চেঁচিয়ে ডাকব কি না ভাবছি—এমন সময় দুবার গুলির শব্দ

পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মাটিতে। তবে জ্ঞান হারাবার আগে একটা আর্তনাদ কানে এসেছিল।

—আচ্ছা, সঞ্জয়বাবু কাজকর্ম কি করতেন?

—বলতে গেলে কিছুই নয়। অথচ ওর ওপর আমার অনেক আশা ছিল। বি. এ-তে স্ট্যান্ড করেছিল ইউনিভার্সিটিতে। ওকে বিলেত পাঠিয়েছিলাম ব্যারিস্টারি পড়তে।

—ফিরে এসে বারে জয়েন করলেন না বুঝি?

—পাস করলে তবে তো বারে জয়েন করবে! ওখানে গিয়ে একেবারে বয়ে গিয়েছিল। কথাটা কানে এলেও প্রথমে বিশ্বাস করিনি। এ-বছর প্রথম দিকে ভারত সরকারের ডেলিগেট হয়ে ইংল্যান্ডে যেতে হয়েছিল। ওখানে যাবার পর শ্রীমানের কীর্তিকলাপ দেখে তো আমি হতবাক। তখন বাধ্য হয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে হল।

—হুঁ! আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

—অনেক ভেবেও কূল পাচ্ছি না।

—আর বিরক্ত করব না। ওঁদের সঙ্গে কথা বলি গিয়ে। ভাল কথা, কালীকিঙ্কর হাজরার ঠিকানা জানেন কি?

—না।

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। অজয় ও দীপকের সঙ্গে এবার ওর কথা বলার পালা। প্রথমে অজয়কে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে কথা আরম্ভ করল। অজয় গত কালকের সমস্ত ঘটনাই বলে গেল একে একে।

—আপনার দাদা তাহলে কথামত কিছুক্ষণ পরেই বার থেকে বেরোননি?

—বেরিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত বাড়ি ফেরেননি।

—আপনার কাকার ওয়ারিশন কে?

—এখন বোধহয় আমি আর দীপকদা।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না। এবার দীপকের পালা। সে-ও গত-কালকার অভিজ্ঞতার কথা বলে গেল। প্রশ্নের মাধ্যমে আরো জানা গেল, তার বাবা পাটনায় অধ্যাপনা করেন। বছর পাঁচেক ধরে সে মামার কাছে আছে। আরো জানা গেল, তাদের তিনজনের মধ্যে মামা সঞ্জয়কেই বেশি ভালবাসতেন।

বাসব এবার নিচে নেমে এল। সামন্ত পার্লারেই ছিলেন। ধর তখনও বেয়ারাটাকে জেরা করে চলেছেন। সে ভীত মুখে প্রবলভাবে সমস্ত কিছু অস্বীকার করে যাচ্ছে।

—ব্যাপার কি? লোকটাকে নিয়ে দারুণভাবে পড়েছেন দেখছি!

ধর বললেন, আর বলেন কেন? ব্যাটা সমানে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে।

সামন্তর কাছ থেকে জানা গেল বাকি কথা। এর নাম লোচন। এগারোটা পর্যন্ত সে অন্যান্য বেয়ারাদের সঙ্গে আউট-হাউসেই ছিল। তারপর অদৃশ্য হয়। ফিরে আসে ভোরে। অন্যান্যরা লক্ষ্য করেছে তখন তার হাবভাব একটু কেমন কেমন ছিল। এখন সে সঠিকভাবে বলতে পারছে না নিজের রাত্রের গতিবিধির কথা।

বাসব বলল, কিছু ডোজ না পড়লে বোধহয় কথা আদায় করা যাবে না। নিয়ে যান ওকে সঙ্গে করে।

—মন্দ বলেননি।

—এখন আমি চললাম। পোস্টমর্টেম ও ব্লাস্টিক এক্সপার্টদের রিপোর্ট অনুগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

পরের দিন বিকালে দুটো রিপোর্টই পাওয়া গেল। শব পরীক্ষকরা বলেছেন, গুলি তলপেটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। শরীরে বিশেষ কিছু ছিল না। লিভারে পচন ধরে ছিল। গুলি না খেলেও ভিক্‌টিম বড় জোর আর দু বছর বাঁচত।

ব্লাস্টিক এক্সপার্টের রিপোর্ট হল, গুলিটা সাধারণ কোন রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়নি। পয়েন্ট থ্রি ম্যাগনাম থেকে বেরিয়েছে। এই ধরনের শক্তিশালী রিভলবার এখন আমেরিকায় বহুল প্রচারিত। ভারত সরকার এই অস্ত্র বিদেশ থেকে এনে বিক্রি করবার অনুমতি এখনও দেননি।

মিঃ সামন্তই রিপোর্ট দুটো সঙ্গে করে বাসবের ওখানে নিয়ে এসেছিলেন। এবার তিনি বললেন, লোচন শেষ পর্যন্ত নিজের সে-রাতের এ্যাকটিভিটির কথা বলেছে।

—তাই নাকি! ব্যাপারটা কি?

—সেদিন স্টাডিতে ঢুকে সে-ই মিঃ চৌধুরীর ফোলিওটা চুরি করে পালাচ্ছিল। টাকার বিনিময়ে সে ফোলিওটা দিতে গিয়েছিল 'চৌধুরী কনসার্নের' প্রাক্তন ম্যানেজার বিশ্ববিকাশ দত্তকে।

—বলেন কি! পরিস্থিতি তো দারুণভাবে টার্ন নিল দেখছি! তারপর?

—ফোলিওটা নিয়ে পালাবার সময় সে দেখতে পায় চৌধুরীসাহেব তাকে ধরতে আসছেন। সে বাগানে নেমে পড়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতেই সে শুনতে পেয়েছিল গুলির আওয়াজ। বাগান অন্ধকার থাকায় যে গুলি ছুঁড়েছে তাকে দেখা সম্ভব হয়নি।

—তারপর সে কি করল?

—রাস্তায় নেমে সে একটু দম নিচ্ছিল। এমন সময় বাগান থেকে বেরিয়ে আসেন বিশ্ববিকাশ দত্ত ও কালীকিঙ্কর হাজরা। তারপর তিনজনে দত্তর ফ্ল্যাটের দিকে পা চালায়। বাকি রাতটা সে ওখানেই ছিল।

—কালীকিঙ্কর হাজরা! আমি যে লোকটাকে খ‍ুঁজছিলাম। মনে রাখবেন, অতি সম্প্রতি সে পাকিস্তান থেকে এসেছে।

উত্তেজিতভাবে সামন্ত বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন কালীকিঙ্কর চোরাপথে পাকিস্তান থেকে পয়েণ্ট থি‍্র ম্যাগনাম এদেশে আমদানী করেছে?

—বিচিত্র কি!

—একটা ভাল পয়েণ্ট। আমরা অবশ্য দত্ত আর হাজরা দ‍ুজনের সঙ্গেই কথা বলেছি। তাঁরা খ‍ুন সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ফোলিওটা ওখান থেকে সরিয়ে আনার ব্যাপারটা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। বাগানে নাকি তাঁরা ছিলেন লোচনের অপেক্ষায়। দ‍ুজনের গতিবিধির ওপর কড়া পাহারা রাখা হয়েছে।

—ফোলিওটা চুরি করানোর উদ্দেশ্য বোধহয় মিঃ চৌধ‍ুরীকে বিপাকে ফেলা।

—তাই হয়ত!

বাসব পাইপ ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। মিঃ সামন্তও সিগারেট ধরালেন। মিনিটখানেক পরে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি ভাবছেন?

—ভাবছি মোটিভের কথা। যে লোকটা এমনিতেই দ্র‍ুত ম‍ৃত্যুর দিকে এগোচ্ছিল, তাকে মেরে ফেলে কার লাভ হল?

—লিভার ড্যামেজ হবার কথা হয়ত কার‍ুর জানা ছিল না। অজয়বাব‍ু ও দীপকবাব‍ুর স্বার্থই সবচেয়ে বেশি। একজন ভাগিদার কমে গেল, কম কথা নয়!

—হাজরা বা আর কার‍ুর কাছ থেকে পয়েণ্ট থি‍্র ম্যাগনাম ওঁদের মধ্যে কেউ সংগ্রহ করেছিলেন, বলতে চাইছেন কি? কিন্তু সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দ‍ুজনে বাড়ির মধ্যেই ছিলেন। গ‍ুলি যে বাগানের দিক থেকে এসেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মিঃ চৌধ‍ুরীর আহত হওয়া। তিনিও বলেছেন গ‍ুলিটা বাগানের দিক থেকেই এসেছে। যাই হোক, ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে হবে।

আরো দ‍ু-চার কথার পর সামন্ত উঠলেন। বাসব তাঁর কাছ থেকে হাজরা আর দত্তর ঠিকানাটা চেয়ে নিল। উনি বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেই শৈবাল এল। তাকে সকালেই ঘটনাটা বলেছিল বাসব।

—চল ডাক্তার, মানিকতলা থেকে ঘ‍ুরে আসি।

—সেখানে কে আছে?

—কালীকিঙ্কর হাজরা। ঠিকানাটা কিছ‍ুক্ষণ আগে পাওয়া গেছে।

পরের দিন বাসব ভীষণ ব্যস্ত রইল। মিঃ সামন্তর কাছ থেকে একজন সাব-

ইন্সপেক্টার চেয়ে নিয়ে বিখ্যাত ও অখ্যাত বন্দুকের দোকানগুলিতে ঢুঁ মারল। তার প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে কেউ যাতে অস্বীকার না করে তাই পুলিশ সঙ্গে রাখা। একবার ফোন করেছিল রাজনাথ চৌধুরীকে। শিকদার বাগানে গিয়ে বিশ্ববিকাশ দত্তর সঙ্গেও কথা বলেছে। তারপর গেছে দমদম।

ওর এই ধারাবাহিক ব্যস্ততার শেষ হয়েছে রাত প্রায় ন-টার সময়।

সে-রাত্রে বাসবের ভালই ঘুম হল বলা চলে। পরের দিন বেলা আটটার সময় শৈবাল আসতেই ও বলল, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমাদের মিঃ চৌধুরীর বাড়ি যেতে হবে।

—সাত-সকালে সেখানে?

—তাঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব।

শৈবাল বলল, কাল তো সারাদিন চরকির মত ঘুরে বেড়ালে। কোন ফল হল?

—পাকা ফলটাই হাতে পেয়েছি বলতে পার। এমন সহজ কেস বহুদিন হাতে আসেনি। শুধু চমকের মধ্যে রয়েছে, হত্যার মোটিভের মধ্যে চমৎকার বাঁক।

—অর্থাৎ?

—শুনতে একটু আশ্চর্য লাগলেও কথাটা সত্যি, এই মার্ডার মোটিভ ছাড়াই হয়েছে।

—তার মানে, তুমি…

—ফিরে এসে সব কথা শুনো। চল, বেরিয়ে পড়া যাক।

পৌনে ন-টার মধ্যেই ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। পার্লারে বসেই খবরের কাগজ পড়ছিল দীপক। অজয়ও ছিল ওখানে। শোকের ধাক্কাটা যে দুজনেই কাটিয়ে উঠেছে, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। কুশল বিনিময়ের পর ওদের দীপকনিয়ে চলল ওপরে। রাজনাথ হেলানো বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। হাতে তখনও তাঁর ব্যাণ্ডেজ। মুখের রেখায় ক্লিষ্টতা বিদ্যমান।

—কি সৌভাগ্য, আসুন—আসুন—

—কেমন আছেন মিঃ চৌধুরী?

—মোটামুটি। ডাঃ সেন বলছেন, ঘা শুকোতে এখনও মাসখানেক লাগবে। বসুন! দীপক চা আনতে বল!

—না না, চায়ের দরকার নেই। এইমাত্র খেয়ে আসছি।

বাসব ও শৈবাল বসল।

দীপক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর রাজনাথ বললেন, কেসটার কতদূর কি হল?

—ওই সম্পর্কেই সকালে বিরক্ত করতে এলাম।

—বিরক্ত আর কি—বলুন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে বলল, সঞ্জয়বাবুকে খুন করা হয়েছে পয়েণ্ট থি্র ম্যাগনাম দিয়ে। এই শক্তিশালী রিভলবার কিন্তু আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।

—তবে কি····

—প্রথমে আমি কালীকিঙ্কর হাজরার কথাই ভেবেছিলাম। তিনি হয়ত কোনক্রমে অস্ত্রটি পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তদন্তে বোঝা গেল, ও ধারণা ঠিক নয়। যাকে খুঁজছি সে অন্য ব্যক্তি।

—সে ব্যক্তি কে জানতে পেরেছেন কি?

—হ্যাঁ।

—কে সে?

—তার আগে আমি আপনার ইণ্টারন্যাশনাল গান লাইসেন্সটা দেখতে চাই একবার।

ঘরে যেন বজ্রাঘাত হল।

বিস্মিত গলায় রাজনাথ বললেন, আমার লাইসেন্স?

—বিস্ময়ের ভাবটা আপনার মুখে ভালই ফুটেছে, মিঃ চৌধুরী। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পয়েণ্ট থি্র ম্যাগনাম আপনি ইংল্যাণ্ডে কিনেছিলেন, আমি জেনেছি। সরকারের প্রতিনিধি হয়ে ওখানে গিয়েছিলেন, সুতরাং ইণ্টারন্যাশনাল লাইসেন্স সংগ্রহ করতে আপনার কোন অসুবিধে হয়নি।

ঝলকে ঝলকে রক্ত রাজনাথের গৌরবর্ণ চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। শরীর বুঝি-বা কিছুটা কাঁপছে। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন বেতের চেয়ার ছেড়ে।

বাসব তাঁর কাছে গিয়ে আবার বলল, সঞ্জয়বাবুকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, আমি জানি। সেই ভালবাসার পাত্র আপনারই গুলিতে প্রাণ দিয়েছে—এই ব্যথা যে কত গভীরভাবে আপনার বুকে বেজেছে, তা অনুমান করতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কি করবেন, নিয়তি কে ন বাধ্যতে।

রাজনাথ আবার বসে পড়লেন। চুলের মধ্যে আলতোভাবে বিলি কেটে ভাঙা গলায় বললেন, ঝোঁকের মাথায় আপনাকে নিযুক্ত করার পরই আমার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা আপনি বুঝে ফেলবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ ব্যানার্জী, আমি ওকে মারতে চাইনি। পলাতক চোরকে আহত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ ও সামনে এসে পড়ল। তখন আর কিছু করার নেই। তারপরই····

—আপনি বাগানের দিক থেকে ছুটে আসা গুলিতে আহত হলেন।

আমি তখনকার পরিস্থিতিটা অনুমান করে নিয়েছি। যাক, আমার কাজ শেষ হল। এবার আমরা উঠব।

—কিন্তু—কিন্তু আমার কি হবে?

—সমস্ত দায়িত্ব পুলিশের। তারা তদন্তের মাধ্যমে আপনার দিকে এগিয়ে আসবে কিনা জানি না। মোট কথা আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এস ডাক্তার।

আর কিছু শোনার অপেক্ষা না করে শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

গাড়ি শরৎ বোস রোডে পড়ার পর শৈবাল বলল, পুলিশে খবর না দিয়েই চলে এলে?

বাসব মুখ না ফিরিয়েই বলল, হ্যাঁ ডাক্তার। বিচিত্র এক মনোবিকারের শিকার এখন আমি। একান্ত স্নেহের পাত্রকে সম্পূর্ণ অজান্তে যে লোক খুন করেছে, তাকে ধরিয়ে দিতে কোথায় যেন বাধছে। অবশ্য সামন্তর কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে হবে। ভাবছি বলব, প্রেসার আবার বাড়ার মুখে। বর্তমানে তাই কোন কেস নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়। পুলিশ যদি তাকে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলে ফেলুক। আমি তো তার মধ্যে রইলাম না!

—তুমি কিভাবে ধরতে পারলে মিঃ চৌধুরীই হত্যাকারী?

—প্রথমে বিশ্ববিকাশ দত্ত ও কালীকিঙ্কর হাজরাকে কেন্দ্র করেই আমার সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছিল। পয়েন্ট থ্রি ম্যাগনামের কথা জানার পর ওই অস্ত্রটার ওপর নির্ভর করেই আমাকে এগোতে হল। ওটা পাকিস্তান থেকে হাজরা অবৈধভাবে এখানে এনেছেন, না বৈধ উপায়ে কেউ আমদানী করেছে? অনুসন্ধান করে জানা গেল সংশ্লিষ্ট কারুরই রিভলবারের লাইসেন্স নেই। অবৈধভাবে সংগৃহীত অস্ত্রও তো দোকান বিশেষে রিপেয়ারিং-এ যায়! আমাকে বন্দুকের দোকানে দোকানে অনুসন্ধান চালাতে হল। কেউই আলোর সন্ধান দিতে পারল না। ইতিমধ্যে আমি ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম, মিঃ চৌধুরী ১৯শে জানুয়ারি ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছেন। এখন ডিসেম্বর চলছে। তার মানে, এক বছর পূর্ণ হয়নি এখনও। সঙ্গে সঙ্গে একটা আইডিয়া মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল। অতীন রুদ্রকে নিশ্চয় তোমার মনে আছে? তার ভাই কাস্টমসে ভাল চাকরি করে। ভালই চেনা-জানা ছিল। ছুটলাম দমদমে। সব কথা খুলে বলতেই সে ১৯শে জানুয়ারিতে যে ডিউটিতে ছিল তাকে খুঁজে বার করল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হলে ডায়েরিতে নোট করে রাখা অনেকের অভ্যাস। জানা গেল, রাজনাথ কর-চৌধুরী নামে একজন শিল্পপতি ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স করানো একটা রিভলবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে সেকথা জানানো

হয়েছিল। সুতরাং আমার আর বুঝতে বাকি রইল না হত্যাকারী কে!

—স্থানীয় পুলিশ তবে কেন জানতে পারল না ওঁর বিদেশী রিভলবার আছে? ওটা তো রেকর্ড হয়ে থাকার কথা!

—এক বছর এখনও পূর্ণ হয়নি যে! আগামী জানুয়ারি মাসে লাইসেন্স রিনিউ করতে যাবার সময় ওটা রেকর্ডেড হবে। পুলিশ ওঁকে সন্দেহ করলে অবশ্য কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে এখন সবই জানতে পারবে। এবার বলি ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল। চোর পালিয়ে যাচ্ছে দেখে মিঃ চৌধুরী গুলি ছুঁড়লেন· ওদিকে একই সময় দত্ত বা হাজরার মধ্যে কেউ ট্রিগার টিপেছিলেন যাতে তাঁদের প্রেরিত লোক মালসমেত ধরা না পড়ে যায়। আহত হবার পর চরম যন্ত্রণার মধ্যেও মিঃ চৌধুরীর জ্ঞান টনটনে ছিল। তিনি দ্রুত নিজের পয়েন্ট থ্রি ম্যাগনাম পকেটস্থ করে ফেলেন। তাই অজয়বাবু এসে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাননি।

সেদিন নিশিথে

অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল।

একটানা বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতেই বেশ রাত করে ঘুমিয়েছিলেন অনিমেষ হালদার। কতক্ষণ তারপর ঘুমিয়েছেন তিনি নিজেও জানেন না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেই বুঝি বা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর।

দু'হাত দিয়ে দু'চোখ তিনি রগড়ে নিলেন খানিক। তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার ঘোর এখনও কাটেনি বলেই মনে হচ্ছে, এ ঘরখানা বোধহয় তাঁর নয়।

হাই তুলতে তুলতে বিছানা থেকে অনিমেষ নামলেন।

বাইরে বৃষ্টি ধরে গেছে। শুধু তাই নয়, পুরু মেঘ বিলীন হয়ে গেছে কোন্ অদৃশ্য কোণে। কাচের সার্শি ভেদ করে চাঁদের হাল্কা আলো লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝের ওপর। প্রকৃতির বিচিত্র পরিহাস! কিছুক্ষণ আগে প্রবল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল, আর এখন চাঁদের আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক।

বিছানা থেকে নেমে অনিমেষ এক গেলাস জল খেলেন। টেবিলের ওপর থেকে রেডিয়াম ডায়েল যুক্ত রিস্টওয়াচটা তুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে চারটে দশ। কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তার হিসেব কে রেখেছে! ওই রকম মনের অবস্থা নিয়ে যে ঘুমতে পেরেছেন, এই যথেষ্ট। আর বিছানায় ফিরে গিয়ে লাভ নেই। যদিও দশটার আগে অফিস যাবার কোন তাড়া নেই। তবুও বিছানায় ফিরে যাবার লোভ তিনি সংবরণ করলেন।

দরজা খুলে বারান্দায় এলেন অনিমেষ।

অবশ্য আলোয়ানটা ভালভাবেই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন। পশ্চিমের আকাশে কানা-ভাঙা চাঁদ হেলে পড়েছে। সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকাতে লাগলেন শ্রেণীবদ্ধ কোয়ার্টারগুলোর দিকে। নির্জন রাস্তার দু'পাশে পরপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছবির মত। কথা বলতে পারলে কত ইতিহাসই ওরা শোনাত।

অসংখ্য মানুষ ওই সমস্ত কোয়ার্টারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আর ঘুম ভাঙতে তাদের দেরি নেই। তখন ব্যস্ততা বাড়বে মীরপুরের এই কেণ্ট রোডের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। অনেকেই কারখানার পথে রওনা দেবে দ্রুত ছন্দবদ্ধ পায়ে। এই ব্যস্ত মানুষের দলে অবশ্য অনিমেষ হালদার নেই। তিনি একজন পদস্থ কর্মচারি। ধীরে-সুস্থে, পান চিবতে চিবতে সাইকেলে চেপে

কর্মকেন্দ্রে রওনা হন।

খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়—আগে কলকাতায় চাকরি করতেন। ভাল সুযোগ পাওয়ায় বছর তিনেক আগে চলে এসেছেন এখানে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের প্রায় বর্ডারে এই মীরপুর। কুড়ি বছর আগে ভারতের কোন সাধারণ মানচিত্রে এই গ্রামের উল্লেখ থাকত না। বিরাট মূলধনে আয়রন ফাউণ্ড্রি গড়ে ওঠবার পরই মীরপুরের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনায় এখন ট্রেনের ব্যবস্থাও পাকা হয়েছে এই শিল্পাঞ্চলে।

অনিমেষ একজন পাকাপোক্ত ব্যাচিলার।

এই কোয়ার্টারে তাঁকে বাদ দিয়ে আরো তিনজন আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তারাও কেউ বিয়ে করেনি এখনও। একসঙ্গে মেস করে রয়েছে চারজনে। গত তিনটে বছর চমৎকারভাবে এখানে কেটেছে বলা চলে।

অনিমেষের সিগারেট শেষ হল।

চাঁদ ডুবে গেছে। পূর্বদিকে লাল আভা ফুটে উঠছে ক্রমেই। ভোরের ইসারা। অনিমেষ আরেকবার হাই তুলে ঘরের দিকে ফিরে চললেন। সামান্য কিছু দূরে এগিয়েছেন, দ্রুত পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন –তাপস সেন নাইট ডিউটি সেরে ফিরছে।

কিন্তু ওকে যেন বিশেষ বিচলিত মনে হচ্ছে!

উনি পিছিয়ে এলেন কয়েক পা।

তাপস তাঁর কাছে এসে দ্রুতগলায় বলল, অনিমেষদা, একটা লোককে ওখানে পড়ে থাকতে দেখলাম।

বিস্মিত অনিমেষ বললেন, সে কি! কোথায়?

—আমাদের কোয়ার্টারের পাশেই।

—মাতাল নয়তো?

—কি জানি। লোকটা কিন্তু মরে গেছে মনে হচ্ছে। তার শরীর রক্তে মাখামাখি!

—বল কি? হতবাক হয়ে যান অনিমেষ। তুমি রক্তাক্ত একটা ডেডবডি দেখে এসেছো?

—একজ্যাক্টলি। মনে হচ্ছে সামবডি—

—কিল হিম? আমাদের কাছাকাছির কেউ কি?

—বলতে পারি না। মুখ দেখতে পাইনি। ভীতগলায় তাপস বলল, যাক, ও নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। লোকটাকে সত্যি যদি কেউ মেরে ফেলে থাকে, তাহলে পুলিশের হ্যাঙ্গামায় জড়িয়ে লাভ কি?

দৃঢ় গলায় অনিমেষ বললেন, এ তুমি কি বলছ? বাড়ির পাশে সত্যি যদি কেউ খুন হয়ে পড়ে থাকে, সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর না নেওয়া মনুষ্যত্ব বোধের পরিচায়ক নয়। এখন নিশ্চিতভাবে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে।

এস, টর্চ নিয়ে দেখি কে পড়ে রয়েছে ওখানে।

ঘর থেকে টর্চ নিয়ে তিনি এগোলেন। অগত্যা তাপসকে দারুণ অনিচ্ছা নিয়ে পিছু পিছু যেতে হল। কি সমস্ত উটকো ঝামেলা! যা দেখেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজের বিছানায় চুপচাপ গিয়ে আশ্রয় নিলেই ভাল করত এখন মনে হচ্ছে।

কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ যাবার পর সত্যি দেখা গেল, কে একজন পড়ে রয়েছে।

অনিমেষ টর্চ জ্বাললেন। এক ঝলক আলোয় সমস্ত কিছু দেখা গেল এবার পরিষ্কার। উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা দেহটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে ঘাস জমির এখানে-ওখানে। নিথর নিষ্কম্প দেহ। মুখের একপাশটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

একি! অপরিচিত তো কেউ নয়! এযে তাঁদেরই চাকর রামদয়াল!

দুজনেই স্তম্ভিত। রামদয়াল এখানে মরে পড়ে আছে চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। কে তাকে এই রকম নিষ্ঠুরভাবে খুন করল? দুজনে একইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মৃতদেহ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে, দুজনে দুজনকে লেহন করতে লাগলেন।

শেষে ভীতভাবে তাপস বলল, অনিমেষদা, আর বোধহয় আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক নয়। আসুন—আমরা এখান থেকে যাই।

—চল। পুলিশে কিন্তু খবর দেওয়া দরকার।

—পুলিশ!

—হ্যাঁ। অবশ্য তার আগে অসীম ও প্রভাতকে ঘুম থেকে তুলে সংবাদটা দেওয়া যেতে পারে। কে পুলিশের কাছে যাবে সেটা ঠিক করা দরকার। এস—

মেসের অন্য দুজনকে ঘুম থেকে তোলা হল। সমস্ত কথা শুনে তাদেরও আক্কেল গুড়ুম। পুলিশে খবর দেওয়াই স্থির হল। ফোন নেই। পুলিশ-স্টেশনও কাছে নয়। অসীম সাইকেলে চেপে রওনা হল সংবাদটা দিতে।

খুনের কেস এ অঞ্চলের পুলিশের হাতে বড় একটা আসে না বললেই চলে। চুরি অবশ্য হয় মাঝে-মধ্যে। থানা-ইনচার্জ বিনোদ কাশ্যপ সংবাদ পেয়ে একটু বিরক্ত বোধ করলেন। অর্থাৎ, এই উটকো ঝামেলার জন্য পরিশ্রমের মাত্রা বাড়ল।

যাহোক, ইন্সপেক্টার কাশ্যপ সদলবলে এলেন ঘটনাস্থলে।

ভোর হয়ে গেছে তখন। মৃতদেহ খুঁটিয়ে কাশ্যপ দেখলেন। মাথার ওপর লম্বালম্বিভাবে ক্ষত। বুক ও পেটের ওপর আরো কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন বর্তমান। ঘাসের ওপর দৃষ্টি ফেললেই বুঝতে পারা যায়, মৃতদেহ টেনে আনা হয়েছে এখানে।

রক্ত ও দাগ দেখে কাশ্যপ তাপসদের কোয়ার্টারের পেছন দিকে এলেন। কিছু বড় ও ছোট গাছ মিলে ঝোপের সৃষ্টি করেছে এখানে। ঝোপের তলায় এখানে-ওখানে চাপ চাপ রক্তের সন্ধান পাওয়া গেল। বুঝতে পারা গেল হতভাগ্য রামদয়াল খুন হয়েছে এখানেই।

ইন্সপেক্টার আবার ফিরে এলেন আগের জায়গায়। তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। খবর রাষ্ট হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ অঞ্চলের লোক ভেঙে পড়েছে ঘটনাস্থলে। সারি সারি জানলা খুলে গেছে। মহিলারাও উঁকি-ঝুঁকি মারছেন। কিন্তু কারুর মুখে কথা নেই। এই অচিন্ত্যনীয় দৃশ্যে সকলেই থ মেরে গেছেন।

ইন্সপেক্টার কাশ্যপ এবার তাপসদের কোয়ার্টারে এলেন। কোয়ার্টারের সামনের বারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলেন অনিমেষ হালদার। অন্য তিনজনও সেখানে ছিল। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় হল। রামদয়াল এঁদের এখানেই চাকরি করত একথা অসীমের মুখ থেকে কাশ্যপ শুনেছিলেন।

বললেন, চাকরটার সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনারা অনেক কথাই বলতে পারবেন!

অনিমেষ বললেন, অনেক কথা বলতে আপনি কি মিন করছেন বুঝতে পারলাম না। তবে দু-চার কথা নিশ্চয় বলতে পারব।

--কতদিন ধরে সে কাজ করছিল আপনাদের এখানে?

—বছর আড়াই হবে।

--কোথাকার লোক বলতে পারেন?

এবার অসীম বলল, কাছাকাছিরই। হিসারপুরে ওর বাড়ি ছিল।

—রোজ ওখান থেকেই কাজ করতে আসত নাকি?

—না। আমাদের কোয়ার্টারের পেছন দিকে আউট হাউস আছে। কাজের সুবিধের জন্য ওকে ওখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।

—একাই থাকত?

—না। সপরিবারে।

কাশ্যপ একটু থেমে বললেন, কে কে আছে ওর?

—বৌ আর মেয়ে।

—রামদয়াল কেমন স্বভাবের লোক ছিল?

অনিমেষ বললেন, একটু খিটখিটে ধরনের ছিল।

--খিটখিটে লোকেদের সঙ্গে প্রায়ই কারুর না কারুর ঝগড়া হয়। সম্প্রতি বা মাত্র কিছুদিন আগে তার সঙ্গে কারুর মারাত্মক রকমের ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল কিনা জানেন? ভেবে বলুন?

এতক্ষণে তাপস কথা বলল, ধরমবীর গুপ্তার সঙ্গে মাত্র কয়েকদিন আগে রামদয়ালের প্রায় হাতাহাতি ঝগড়া হয়ে গেছে।

—কেন ?

ইতস্তত করতে লাগল তাপস।

—খুনের কেসে খুঁটিনাটি কথার দাম অনেক। আপনি ইতস্তত করবেন না। ঝগড়ার কারণটা বলুন আমায়।

—বিবাহিতা মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাত না রামদয়াল—এই নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিল ধরমবীর। এতেই ঝগড়া বেধে যায়।

—এই ধরমবীর লোকটা কে ?

—কারখানার একজন ক্লার্ক। তাছাড়া এ অঞ্চলের দুর্নীতিদমন সমিতির একজন পাণ্ডা।

—রামদয়ালের মেয়েকে আপনারা নিশ্চয় চেনেন ? তার স্বভাবচরিত্র সত্যি খারাপের দিকে যাচ্ছে নাকি ?

সকলে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

এতক্ষণ পরে প্রভাত প্রথম কথা বলল, আমরা ঠিক জানি না।

ইন্সপেক্টার এবার প্রশ্নের মোড় ঘোরালেন, আপনাদের মধ্যে প্রথমে কে মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলেন ?

—আমি। নাইট-ডিউটি সেরে কারখানা থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ মৃতদেহটা চোখে পড়ে গেল।

তাপসকে এবার ভাল করে দেখে নিয়ে কাশ্যপ বললেন, আপনি ক'টার সময় কারখানা থেকে বেরিয়েছিলেন ?

—প্রায় পাঁচটা।

—ভাল কথা, আপনারা কে কোন্ পদে কাজ করছেন ?

প্রভাত বলল, আমরা সকলেই চার্জম্যান। শুধু অনিমেষদা আমাদের চেয়ে কিছু সিনিয়ার।

আর কোন প্রশ্ন না করে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলকে পুলিশের অনুমতি ছাড়া মীরপুরের বাইরে যেতে নিষেধ করে কাশ্যপ কোয়ার্টারের বাইরে এলেন। মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে চালান দেওয়ার ব্যাপারে কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর রামদয়ালের বৌ আর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

এই ঘটনায় কেন্ট রোডের গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে অকস্মাৎ পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। চতুর্দিকে নানা বয়সের নানা কণ্ঠের আলোচনার বিষয়বস্তু হল শুধু রামদয়ালের মর্মন্তুদ মৃত্যু। লোকটাকে কে এইভাবে মারল ? আশ্চর্য ব্যাপার!

দিন তিনেক পরের কথা।

রবিবার। কারখানা যাবার তাড়া না থাকায় কোয়ার্টারের সামনেকার বারান্দায় বসে আয়েস করে দৈনিকপত্র পড়ছিলেন অনিমেষ হালদার। অসীম,

তাপস এবং প্রভাত ওখানেই বসেছিল। তাপসের জার্মানি যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল।

কিছু দিন থেকে তাপস চেষ্টা করছিল বাইরে যাবার জন্য। ছোটবেলা থেকে ও স্বপ্ন দেখে আসছে বিদেশে যাবার। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। অভাবনীয়ভাবে একটা ভাল সুযোগ পেয়ে গেছে। ওয়েস্ট জার্মানির স্টুটগার্ড শহরের এক বড় কারখানার কর্তৃপক্ষ ওকে লোভনীয় পদ দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সামনের মাসে সমুদ্রপথে তাপস যাত্রা করবে।

এই সম্পর্কেই তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

এই সময় ইন্সপেক্টার কাশ্যপের জিপ এসে থামল।

উনি গাড়ি থেকে নেমে ওদের কাছে চলে এলেন। মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

কেউ কিছু বলবার আগেই বললেন, একটা অপ্রিয় কাজ করবার জন্য আমায় এখন আসতে হল।

অনিমেষ বললেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ইন্সপেক্টার।

পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে, এগিয়ে ধরে কাশ্যপ বললেন, পড়ে দেখুন।

—একি !! তাপসের নামে ওয়ারেন্ট ?

—ওয়ারেন্ট !!! কোয়ার্টারের ছোট বারান্দায় বিস্ময়ের ঝড় উঠল।

আর্ত গলায় তাপস বলল, আমার নামে ওয়ারেন্ট কেন ?

—রামদয়ালের মার্ডারে আপনি সাসপেক্টেড।

— সেকি !

প্রভাত বলল, ওর বিরুদ্ধে কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন জানতে পারি কি ?

—ও সম্পর্কে এখন কোন কথা বলতে অবশ্য আমি বাধ্য নই। তবু জানাচ্ছি, প্রমাণের কথা আসবে পরে। আগে আমরা সন্দেহজনক চরিত্রকেই নাড়াচাড়া করে থাকি।

অনিমেষ বললেন, কিন্তু ওর ওপরই বা আপনার সন্দেহ পড়ছে কেন ?

—রামদয়ালের স্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। শুনলাম, তার মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছিলেন তাপসবাবু। এই কারণে তাঁরও রামদয়ালের সঙ্গে গুরুতর আকারের গোলমাল পাকিয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাছাড়া উনি আমাকে বলেছিলেন, সেদিন ভোর পাঁচটার সময় কারখানা থেকে বেরিয়েছেন। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখেছি, রাত দুটো থেকেই উনি ওখানে অনুপস্থিত। এনি ওয়ে, এখন ওঁকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। পরে কোর্টে নিজেকে ডিফেন্স করার সমস্ত সুযোগ উনি পাবেন।

তাপস কি করবে ভেবে পেল না।

—আসুন—

এবার ইন্সপেক্টারের পিছু পিছু ওকে বসতে হল গিয়ে জিপে। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল জিপ। কত দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা। কয়েক মিনিট তিনজনের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

শেষে অসীম বলল, আমি বিশ্বাস করি না তাপস রামদয়ালকে খুন করেছে।

অনিমেষ বললেন, পুলিশ যাই বলুক না কেন, তবু আমি মানতে রাজি নই যে, তাপস এই কাজ করেছে।

—ও সমস্ত আলোচনা করে আর এখন কি হবে? প্রভাত বলল, এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে ওর জন্য আমরা কিছু করতে পারব কিনা!

আলোচনা আরম্ভ হল। এই বিপদে তাপসের জন্য কি করা যায়, সেই বিষয়ের আলোচনা। শেষে ঠিক হল, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হবে এখুনি কলকাতায় ওর বাবার কাছে। উনি আসুন। তারপর যা হবার হবে।

টেলিগ্রামের খসড়া তৈরি হল।

বেলা তখন সাড়ে ন-টা।

কলকাতার দুশো একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে বসে বাসব একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। ওর মুখে জ্বলন্ত পাইপ। গত মাসখানেক ধরে হাতে কাজ-কর্ম না থাকায় কিভাবে সময় কাটাবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। শৈবাল এখানেই ছিল। এই কিছুক্ষণ হল বাড়ি গেছে।

বাহাদুর এই সময় একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। আগন্তুক প্রৌঢ়। বিষাদের ছায়া মুখে ছেয়ে রয়েছে। বাসব তাঁকে বসতে বলল। ভদ্রলোক কোন গুরুতর গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন বুঝতে পারা যায়।

—বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

—বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি, মিঃ ব্যানার্জী। কাকুতি মাখানো গলায় ভদ্রলোক বললেন, অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে এসেছি। এখন আপনিই আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

বাসব নরম গলায় বলল, উতলা হবেন না। সাধ্যের অতীত না হলে আপনাকে নিশ্চয় সাহায্য করব। ঘটনাটা এবার খুলে বলুন।

এরপর ভদ্রলোক যা বললেন তার সারমর্ম হল, তাঁর নাম সুরেন সেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে তাপস মীরপুরের 'ইউনাইটেড আয়রন ফাউণ্ড্রি'র চার্জম্যান। সামনের মাসে তার জার্মানি যাবার কথা আছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে, সে জড়িয়ে পড়েছে এক খুনের কেসে। মেসের চাকর খুন হওয়ায় পুলিশ তাপসকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।

বাসব শুনছিল একমনে।

এবার বলল, ওখানে গিয়েছিলেন নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ। তাপসের বন্ধুদের তার পেয়ে গিয়েছিলাম। কাল রাত্রে ফিরেছি। বুঝতেই পারছেন আমাদের মনের অবস্থা। এখন আপনিই ভরসা।

—এখানে বসে তো কেসের কোন সমাধান করতে পারব না। ঘটনাস্থলে যাওয়া দরকার।

—নিশ্চয়। সুরেন সেন বললেন, আজকের রাত্রের গাড়িতেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে যেতে পারি। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

বাসব একটু চুপ করে থেকে বলল, উপস্থিত হাতে কোন কেস নেই। কাজেই আপত্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। ওই কথাই তাহলে রইল, আজ রাত্রের ট্রেনেই আমরা মীরপুর যাত্রা করছি। সঙ্গে কিন্তু আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু যাবেন।

—বেশ তো। কি বুঝছেন, তাপসকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হবে ?

—ওখানে না গেলে তো কিছু বলা যাচ্ছে না।

—আমি তাহলে উঠি। আপনার ফিটা ······

—ব্যস্ত হবেন না। কেসটা ভাল করে বুঝে নিই, তারপর ও সম্পর্কে কথা হবে।

বাসব ও শৈবাল মীরপুর পেঁছিল।

সঙ্গে অবশ্য সুরেনবাবু আছেন। মীরপুরে ভাল কোন হোটেল নেই। অনিমেষ হালদার কারখানা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ওদের অফিসার্স ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সুরেনবাবু ছুটলেন সদরে বেসরকারি তদন্তের অনুমতি নিতে।

সারাটা দুপুর বিশ্রাম করে ওরা বিকেলে এল ঘটনাস্থলে।

আলাপ-পরিচয়ের পর অনিমেষ হালদার, প্রভাত ও অসীমের মুখ থেকে ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনল। সুরেনবাবুর এত জানার কথা নয়। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সমস্ত কিছু মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল বাসব।

শেষে—

—ঘটনাটা খুব জটিল কিনা, এখুনি এই সিদ্ধান্তে আসা একটু মুশকিলের ব্যাপার। যাহোক, এখন যদি আলাদা আলাদাভাবে আপনাদের প্রশ্ন করি তাহলে নিশ্চয় কারুর আপত্তি হবে না ?

প্রভাত বলল, আপত্তি হবে কেন ?

—আমি মিঃ হালদারের সঙ্গে প্রথমে কথা বলব। আপনারা পাশের ঘরে যান। অসীম ও প্রভাত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

বাসব বলল, তাপস সেনের সঙ্গে আপনার আলাপ কতদিনের, মিঃ হালদার ?

—তা বছর তিনেক হয়ে গেল। আমি এখানে এসে কাজে যোগ দেবার পরই কি সূত্রে যেন আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে।

—বছর তিনেক ধরে যখন দেখছেন তখন তাঁর চরিত্র কি রকম, এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গত ধারণা নিশ্চয় আছে ?

—সঙ্গত ধারণা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন, আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে তাপসের চরিত্র সম্বন্ধে বলতে পারি, সে একটু বেপরোয়া ধরনের। কোন নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িত কিনা তার চাক্ষুস প্রমাণ আমার কাছে নেই। কিন্তু—

—থামবেন না। বলুন।

—অসীম বলছিল—

—কি বলছিলেন অসীমবাবু ?

—তাপস নাকি কোন মেয়ের সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড।

—তাঁর এ ধারণা হবার কারণ ?

—অসীম তার হাবভাব দেখে ধারণা করেছিল।

—হুঁ। রামদয়ালের মেয়েকে তাপসবাবুর সঙ্গে জড়িত করেছে পুলিশ। আপনি তাকে দেখেছেন ?

—আমাদের বাউন্ডারির মধ্যেই তো থাকে। বহুবার দেখেছি।

—আপনার মনে এ সন্দেহ কি কখনও ছায়াপাত করেছে যে, তাপসবাবুর সঙ্গে ওই মেয়েটির যোগাযোগ হয়ত থাকতে পারে ?

অনিমেষ মাথা নেড়ে বললেন, আমার মাথায় এ সমস্ত কথা কখনও আসেনি।

—আপনাদের কারুর ফ্যামিলি এখানে আছে নাকি ?

—আমরা চারজনই ব্যাচেলার।

—ধরমবীর নামে যে লোকটার সঙ্গে রামদয়ালের বচসা হয়েছিল, তার সম্পর্কে কিছু বলুন।

—ভাল লোক বলেই তাকে জানি। এ অঞ্চলে যাতে অশোভন কোন কাজ না হয়, তার জন্য সে সব সময় সচেষ্ট।

—আপনাদের কাছে আসে নাকি ?

—কালেভদ্রে।

বাসব বলল, ধন্যবাদ মিঃ হালদার। আর কোন প্রশ্ন নেই। আপনি গিয়ে অসীমবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

অনিমেষ হালদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অসীম ঘরে প্রবেশ করল তারপরই।

বাসব আবার পাইপ ধরিয়েছে।

কোন ভূমিকা না করেই বলল, আপনার নাকি ধারণা হয়েছিল, তাপসবাবু কোন মেয়ে সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড হয়ে পড়েছিলেন ?

—হবে।

—মেয়েটিকে আঁচ করতে পেরেছেন ?

অসীম ইতস্তত করতে লাগল।

—রামদয়ালের মেয়ে কি ?

—হ্যাঁ।

—আপনার এই ধারণার পেছনে নিশ্চয় বলিষ্ঠ যুক্তি আছে ?

—ভাসা ভাসা একটা ধারণা আছে বলতে পারেন। সকলে মেয়েটাকে খারাপ বলে, অথচ তাপস কিছুতেই একথা মানবে না। ওর মতে এর চেয়ে খারাপ মেয়ে প্রচুর আছে। আমরা অনর্থক পরের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এতেই আমার মনে হয়েছিল ও বোধহয় মেয়েটাকে দেখে ভুলেছে।

—দেখতে ভাল বুঝি ?

—উঁচু ঘরের মেয়ে হলে নামকরা সুন্দরী হত।

—হুঁ। আপনার কি ধারণা তাপসবাবু রামদয়ালকে খুন করেছেন ?

—না। তার কি স্বার্থ ?

—ধরুন, আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে এমনও তো হতে পারে, সে রাত্রে রামদয়াল নিজের মেয়ের সঙ্গে তাপসবাবুকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে। তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি তাকে খুন করেছেন ?

—আপনি যা বলছেন, তা হতেও পারে। তবে এ সম্পর্কে সঠিক কোন বক্তব্য আমার নেই।

বাসব একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করল।

—রামদয়ালকে কে অ্যাপয়েণ্ট করেছিল ?

—বলতে গেলে আমরা সকলেই।

—কি রকম ?

—এই কোয়ার্টারটা ভাগ্য গুণে প্রভাত পেয়েছিল। তারপর আমরা এসে জুটি। তখন চাকরের অভাব বড় করে দেখা দেয়। আমরা দু-চারজনকে বলেছিলাম চাকরের কথা। শেষে ধরমবীর রামদয়ালের সন্ধান দেয়।

—ধরমবীর! ভেরি ইণ্টারেস্টিং!

আগে তার রামদয়ালের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। পদমর্যাদার প্রচুর পার্থক্য থাকলেও দুজনে একই গ্রামের লোক। আর পরিচয় অনেকদিনের। ইদানিং শুনলাম, ধরমবীর রামদয়ালের মেয়ের চরিত্র নিয়ে হৈ-চৈ করছে।

—আর বিরক্ত করব না। প্রভাতবাবুকে পাঠিয়ে দিন গিয়ে।

অসীম চলে যাবার পর চিন্তিত মনে বাসব নিভে যাওয়া পাইপ আবার

ধরাল।

শৈবাল প্রশ্ন করল, কি রকম বুঝছ ?

—সমস্ত কিছু তলিয়ে ভাববার অবকাশ পাব আজ রাত্রে। তারপরে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

প্রভাত এল।

মৃদু গলায় বলল, নতুন কোন কথা আপনাকে বলতে পারব বলে আমার কিন্তু মনে হয় না।

—এ ধারণা আপনার কেন ?

—অনিমেষদা আর অসীমের কাছ থেকে সমস্তই জানতে পেরেছেন, তাই আর কি।

—হুঁ। আমি বরং আমার পুরনো প্রশ্নের কিছু কিছু নতুনভাবে তুলে ধরি।

—বলুন ?

—সেদিন যখন পুলিশ এল, তখন আপনার মনোভাব কিরকম দাঁড়িয়েছিল ?

—রামদয়াল খুন হওয়ায় খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম, সন্দেহ নেই। পুলিশ দেখে আমার তো ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে তাপস ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তার নার্ভাসনেস দেখে আমি অবাক না হয়ে পারিনি।

—কেন ?

—সে এত নার্ভাস হবে কেন, বলুন ?

—তা বটে। এই খুন সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয় চিন্তা-ভাবনা করেছেন ? সেই চিন্তালব্ধ কথাটা আমি শুনতে চাই।

প্রভাত একটু চুপ করে থাকার পর বলল, নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে অহরহ কত অঘটন ঘটছে। এটা যে তারই আরেক দৃষ্টান্ত নয়, জোর দিয়ে বলা যায় কি ?

—আপনি কি তাপসবাবুকে সন্দেহ করেন ?

—আমি সেরকম কিছু কি আপনাকে বলেছি ? অবশ্য ধরমবীরের কথা আমাকে ভেবে দেখতে হয়েছে। লোকটা ভান করে। দুর্নীতি দমনের কথা বলে বেড়ানোটা হল সস্তায় কিস্তি মারার পথ। আসলে সে মোটেই ভাল নয়।

—আপনার কি মনে হয়, রামদয়ালের মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা আছে ?

—আমার তাই ধারণা।

—আপনার ধারণার কথা আমার মনে থাকবে।

এই সময় সুরেনবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। পুলিশের কাছ থেকে বেসরকারীভাবে তদন্ত করানোর অনুমতি পাওয়া গেছে জানালেন। বাসব প্রভাতকে আর কোন প্রশ্ন করল না। সুরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। অনুমতি যখন নিয়ে এসেছেন তখন

থানায় ঘুরে আসা যেতে পারে।

রিক্সায় চেপে থানায় পেঁছিতে মিনিট-কুড়িক সময় লাগল। নিজের অফিসেই ছিলেন ইন্সপেক্টার কাশ্যপ। বাসব নিজের পরিচয় দিতেই সমাদরে ওদের বসালেন। তিনি ইতিমধ্যেই প্রাইভেট-এনকোয়ারির ইন্সট্রাকশন পেয়েছিলেন। কুশল-বিনিময় হল। চা আনবার জন্য একজন কনেস্টেবলকে আদেশ দিলেন কাশ্যপ।

বাসব বলল, আপনার আপত্তি না থাকলে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা একবার দেখতাম।

—আপত্তি কিসের? দেখুন না!

তিনি রিপোর্ট বার করে দিলেন। বাসব মন দিয়ে পড়তে লাগল। ততক্ষণ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল ইন্সপেক্টার ও শৈবালের মধ্যে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রামদয়াল মারা গেছে রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। প্রথমে লাঠি বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। তারপর ভারি ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে অত্যধিক রক্তপাতের ফলে।

রিপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বাসব বলল, তাপসবাবু সম্পর্কে আপনাদের আবার বিবেচনা করে দেখবার কিছু নেই বোধহয়?

—আমরা স্থির নিশ্চিত হয়েছি। অবশ্য আপনার কথা স্বতন্ত্র। তাঁকে সন্দেহমুক্ত করার জন্যই আপনি নিযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের সঙ্গে আপনার।

—তাঁকে সন্দেহ করার কারণ?

—তিনি মিথ্যা অ্যালিবাই সৃষ্টি করেছিলেন।

—কি রকম?

—তিনি নিজের স্টেটমেণ্টে বলেছিলেন, ভোর পাঁচটার পর কারখানা থেকে বেরিয়েছেন। অথচ আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি, তিনি বেরিয়েছিলেন রাত দুটোর সময়। এই মিথ্যা ভাষণের উদ্দেশ্য কি? তাছাড়া রামদয়ালের বৌ বলেছে, তার মেয়ের প্রতি তাপসবাবুর কু-দৃষ্টি ছিল। এটাই হল ভাইটাল পয়েণ্ট। কারখানা থেকে পালিয়ে তিনি মেয়েটার কাছে গিয়েছিলেন। এই সময় ধরা পড়ে যান রামদয়ালের হাতে। তখন বাধ্য হয়েই ···

—তাঁকে খুন করতে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা ওইভাবে ঘটেছে মনে হয় বটে। তবে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাবার পরই ধরা পড়ে গোড়ায় গলদটা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাত বারোটার মধ্যে রামদয়াল মারা গেছে। অথচ আপনাদের কথা অনুসারে তাপসবাবু রাত দুটো পর্যন্ত কারখানাতেই ছিলেন। এখন বলুন, শুধু এই পয়েণ্টটাই কোর্টে

সমস্ত কেসটাকে কাঁচিয়ে দেবে না কি ?

ইন্সপেক্টার থতমত খেলেন।

—ও পয়েন্টটা আমাদেরও নজরে এসেছে। প্রকৃত তথ্য খুঁজে বার করবার জন্য লোক নিযুক্ত করেছি। আমার মনে হয়, তাপসবাবু খুনের ঘটনার পর কারখানায় গিয়েছিলেন। তারপর দুটো পর্যন্ত সেখানে থেকে, আবার কোন কারণে বেরিয়ে আসেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে একমনে ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ।

—লাঠি বা ছোরা—ঘটনাস্থলে এই দুটো পেয়েছেন কি ?

—ঘটনাস্থলের কিছু দূরে লাঠিটা পাওয়া গেছে। ছোরার সন্ধান অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যাচ্ছে না।

—লাঠিটা দেখাবেন একবার।

কাশ্যপ একটা লোহার আলমারি থেকে লাঠিটা বার করলেন। গোল মুঠাযুক্ত লাঠি। হাল্কা নয়, আবার ভারিও নয় খুব। তার মাঝামাঝি জায়গায় হাল্কা লাল ছোপ। রক্তের দাগ হতে পারে। বাসব ভ্রূ কুঁচকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

—কয়েক ঘণ্টার জন্যে এটা আমায় দিতে পারেন ?

—নিয়ে যান। আপনার জন্যে আর কি করতে পারি, বলুন ?

—উপস্থিত আরেকটা কাজ করতে হবে। নিতান্ত অসুবিধে না হলে তাপসবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

—এতে অসুবিধের আর কি আছে ? উনি কিন্তু থানার লক-আপে নেই। জেলে আছেন। এখন যদি চান তো চলুন।

—যাওয়া যেতে পারে।

এই সময় একজন ইউরোপিয়ান ভদ্রমহিলা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর অভাবনীয় আগমনে তিনজনেই সচকিত। ভদ্রমহিলার বয়স ত্রিশের সামান্য কিছু ওপরে হতে পারে। সুরূপা।

তিনি ইন্সপেক্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একজন জার্মান মহিলা। ভারতীয় স্বামীর সঙ্গে আমি এখানে থাকি। একটা স্টেটমেন্ট দিতে চাই।

—বসুন। কিসের স্টেটমেন্ট ?

—আজ সকালেই আমি খবর পেয়েছি, আপনারা তাপস সেনকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছেন। সেই সম্পর্কেই স্টেটমেন্ট দেব।

বাসব ও কাশ্যপের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হল।

—বলুন।

—শুনলাম, দুর্ঘটনার দিন রাত দুটোর পর কারখানা থেকে কোথায় গিয়েছিল তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার সম্মানের কথা চিন্তা করেই সে কিছু বলতে পারেনি। আসলে সে

তখন আমাদের কোয়ার্টারে ছিল।

—আপনাদের কোয়ার্টারে।

—দুটো কারণে সে আমাদের কোয়ার্টারে আসত। এক, আমার ননদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে। ওদের বিয়ে হবে। দুই, তাপস জার্মান যাচ্ছে। আমার কাছে জার্মান ভাষাটা শিখে নিচ্ছিল। আমার স্বামী অবশ্য আগে এত কথা জানতেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতেই সে আসত।

—আপনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কেন ?

—পদমর্যাদায় তিনি তাপসের অনেক ওপরে। তাই তাঁর চোখ বাঁচিয়ে সে যাওয়া-আসা করত। তাপস একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে।

—রাত্রে তো আপনার স্বামীর বাড়ি থাকবারই কথা ?

—তিনি নিয়মিত নাইট ডিউটি করছেন।

বাসব বলল, তাপসবাবুকে প্রশংসা করতে হবে। এরকম বিপদের মধ্যেও তিনি আপনাদের নাম করেননি। কিন্তু এবার তো আপনার স্বামীর সমস্তই জানতে পারার কথা ?

—এরকম সংকটে চুপ করে থাকাটা মনুষ্যত্ব নয়। আমি সমস্ত কথা তাঁকে বলেছি। তিনিই আমাকে পুলিশের কাছে আসতে পরামর্শ দিয়েছেন।

—ক'দিন চুপ করে ছিলেন কেন ? আপনার তো আগেই এখানে আসা উচিত ছিল ?

—ওই ঘটনার পরের দিন আমরা দিল্লী চলে গিয়েছিলাম। আজ ফিরে এসে তাপসের গ্রেপ্তার হওয়ার কথা জানতে পারি।

ভদ্রমহিলা নিজের স্টেটমেন্ট লিখে এনেছিলেন। কয়েক সিট ভাঁজ করা কাগজ কাশ্যপের হাতে তুলে ধরে তিনি বিদায় নিলেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এই স্টেটমেণ্টের পর আপনার থিওরি তো আর টিকছে না, মিঃ কাশ্যপ ? পাল্লা আমার দিকেই হেলেছে মনে হচ্ছে।

—হুঁ! চলুন, ওঠা যাক।

সারা দুপুর বাসব লাঠিটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ওর মুখ দেখে শৈবালের মনে হল, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা আশাপ্রদ হয়েছে। তাপসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য বাসব সংগ্রহ করতে পারেনি

বেলা পড়ে এল।

শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ও কেন্ট রোডের উদ্দেশে যাত্রা করল। রামদয়ালের বাসায় যাওয়াই ওর উদ্দেশ্য। দেখা হল তার বৌয়ের সঙ্গে। নিজেদের পুলিশের লোক বলে পরিচয় দিতে হয়, কারণ, বেসরকারি গোয়েন্দা যে কোন্ জন্তু, তার পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর হবে।

রামদয়ালের বৌয়ের বয়স খুব বেশি নয়। বছর ছত্রিশ হবে। এখনও চেহারায় বেশ চটক আছে। স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীর ভেঙে পড়ার কথা, এর হাবভাব দেখে সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না। ওদের সামনে সে চোখ-মুখ নাচিয়ে বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলল।

প্রশ্ন করে যা জানা গেল, তার সারমর্ম হচ্ছে, রামদয়ালের সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। লোকটা ছিল খিটখিটে। সন্দেহপ্রবণ। কে তাকে মেরেছে, তা সে বলতে পারে না। তবে তার মেয়ের ওপর তাপসবাবুর খারাপ দৃষ্টি ছিল। রামদয়াল একথা জানতে পেরে তাপসবাবুকে একদিন সাবধান করে দিয়েছিল, ইত্যাদি।

এবার রামদয়ালের মেয়েকে ডাকা হল। তার নাম রুপো। সার্থকনামা মেয়ে। বয়স বছর আঠারো হতে পারে। বিবাহিতা। স্বীকার করতেই হবে, রূপের জেল্লায় সে তার মাকে অনেক পেছনে ফেলেছে। সাজ-পোশাকেও পারিপাট্য রয়েছে। নিচুঘরে এরকম অনিন্দ্যসুন্দরী বড় একটা চোখে পড়ে না। এরকম একটি মেয়ের জন্য যদি কোন পুরুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কাউকে খুন করে বসে, তাহলে তাকে বোধহয় খুব দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তার হাতের চেটো আর পায়ের পাতা মেহদি দিয়ে ছোপানো।

রুপোর বক্তব্য হল, ধরমবীরকে সে চেনে। একই গাঁয়ে বাড়ি, বাপুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। পরে কেন দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে সে কিছু জানে না। তাপসবাবু প্রায়ই তাকে বিরক্ত করতেন। এমন সমস্ত কথা বলতেন, যা বলতে সে লজ্জা পাচ্ছে।

ওখান থেকে বাসব ও শৈবাল কোয়ার্টারে এল। অনিমেষ হালদার কিছুক্ষণ হল ফিরেছেন কারখানা থেকে। অসীম ও প্রভাতও রয়েছে। চা-পর্ব শেষ হবার পর বাসব বলল, ধরমবীরকে যে একবার ডাকাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

অসীম সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ফিরে এল মিনিট কয়েক পরে, ধরমবীরকে সঙ্গে নিয়ে। মাঝ-বয়সী নিরেট চেহারার একটা লোক। বিরাট জমকালো গোঁফ মুখটাকে ভয়াবহ করে তুলেছে। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরনে। পানের রসে ঠোঁট দুটো টকটকে লাল।

ধরমবীর চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বেসরকারি ভাবে তদন্ত করতে আপনি এসেছেন, আজ সকালেই জানতে পেরেছি। ওকে না পাঠালেও দেখা করতাম। আপনাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

বাসব বলল, আপনার সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখে খুশি হচ্ছি। দু-চারটে প্রশ্ন তাহলে করা যেতে পারে?

—নিশ্চয়ই।

—রূপাকে নিয়ে আপনার ও রামদয়ালের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল, একথা সত্যি ?

—হ্যাঁ। মেয়েটা বয়ে যাচ্ছিল—ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছিল না—

—তার নৈতিক পতন সম্পর্কে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ আপনার কাছে আছে ?

—রামদয়ালের বৌ এ বিষয়ে আমায় বলেছিল। তাছাড়া একদিন রূপাকে অন্ধকারের মধ্যে একজনের সঙ্গে ফুসফুস করে কথা বলতে শুনেছি। আমার বিশ্বাস, সে লোকটা তাপসবাবু। একথা রামদয়ালকে বলতেই সে আমার ওপর ক্ষেপে উঠল।

—এ সমস্ত কথা রামদয়াল আগে আর কারুর কাছ থেকে শুনেছিল ?

—না। আমি তাকে প্রথম বলি।

—বিচিত্র ব্যাপার ধরমবীরবাবু। মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবার কথা স্ত্রীর স্বামীকে বলাই স্বাভাবিক। তা না বলে, রামদয়ালের স্ত্রী আপনাকে বলতে গেল কেন ?

আমতা আমতা করে ধরমবীর বলল, না —ইয়ে ···মানে····আমার সঙ্গে তার অনেক দিনের চেনা-জানা কিনা, তাই ·· ····

বাসব আর কোন প্রশ্ন না করে তাকে বিদায় দিল।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর শৈবাল প্রশ্ন করল, কি রকম বুঝছ কেসটা ?

বাসব পাইপে দীর্ঘটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, কেসের মধ্যে কোন জটিলতা নেই ডাক্তার। নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে সাদামাটা খুন।

—হত্যাকারী কে জানতে পেরেছ ?

—রামদয়ালের মাথায় যে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, সেই লাঠিই আমাকে অনেক কিছুর সন্ধান দিয়েছে।

—লাঠি। কি রকম ?

—লাঠিটা পরীক্ষা করে দেখেছি, তার মুঠোয় মেহদি রঙয়ের ছোপ লেগেছে। ওই ছোপই আমাকে এই হত্যাকাণ্ডের ওপর যবনিকা ফেলতে সাহায্য করবে। কিন্তু আর কথা নয়। রাত বাড়ছে। এবার ঘুমাতে পেলেই বোধহয় ভাল হয়।

পরের দিন বিকেল পাঁচটায় ইন্সপেক্টার কাশ্যপ কেণ্ট রোডের কোয়ার্টারে পেঁাছলেন। তখন সেখানে বাসব, শৈবাল, অনিমেষ হালদার, অসীম, প্রভাত ও সুরেনবাবু উপস্থিত রয়েছেন। বাসবের অনুরোধেই কাশ্যপ এখন এখানে এসেছেন।

বাসব বলল, কয়েক মিনিটের জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন !

ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে।

—এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য আমি মর্মাহত। বাসব বলল, এবার কেসটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য তুলে ধরছি। প্রভাতবাবু ঠিকই বলেছিলেন, নারী-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীতে অহরহ কত অঘটনই ঘটছে। রামদয়ালের খুন তারই এক দৃষ্টান্ত। তবে ধরমবীর সম্বন্ধে তিনি যে ইঙ্গিত করেছিলেন, তা অন্য ধার ঘেঁষে গেছে। ধরমবীর রূপার প্রতি নয়, তার মায়ের প্রতি আকৃষ্ট। দুজনকে রামদয়াল যাতে সন্দেহ না করে তাই তার মনকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেয়ের চরিত্রের দিকে। এখন প্রশ্ন উঠবে, রূপা কি তাহলে নির্মল চরিত্রের মেয়ে? না—তারও একজন মনের মানুষ আছে। একথা তার মার অজানা ছিল না। রূপের জোরে মা ও মেয়ে রোজগার করছিল ভালই। হঠাৎ সেদিন রূপাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলল রামদয়াল। রূপার মনের মানুষ ঘাবড়ে গেল। রাগে অন্ধ হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছোরা মারতে গেল রামদয়াল। তখন অনন্যোপায় হয়ে রূপা তার বাপের মাথায় লাঠি মারতে বাধ্য হল। এরপর প্রেমিক-প্রবর ছুরি কুড়িয়ে নিয়ে দু-চার ঘায়ে তাকে বিদায় দিল পৃথিবী থেকে। বলা বাহুল্য, এতে রূপা বা তার মা ব্যথিত হল না। রামদয়ালকে দুজনেই প্রতিবন্ধক মনে করেছিল। এবং এই সঙ্গে একথা স্থির হয়ে রইল, পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, তাপসবাবুর রূপার ওপর দুর্বলতা ছিল। পুলিশ যাতে তাঁকেই সন্দেহ করে। অবশ্য হত্যাকারী ওই সঙ্গে রূপা এবং তার মাকে বলে রেখেছিল, বেফাঁস কিছু বললে তারাও বিপদে পড়বে। কারণ, রামদয়ালকে হত্যা করার সময় হত্যাকারীকে তারা সাহায্য করেছে।

সুরেনবাবু বললেন, হত্যাকারী কে, তা তো বলছেন না?

—হ্যাঁ। এইবার তার নাম আমি প্রকাশ করব। হত্যাকারি যদি এই লাইনের ঝানু লোক হত, তাহলে এত কাঁচা কাজ সে কখনই করত না। দুজনের সামনে তৃতীয় একজনকে খুন করা যে কত বড় রিস্ক, এ সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই ছিল না। যাই হোক, উচ্চপদস্থ এই লোকটি আপনাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত। আপনারা বোধহয় বুঝতে পারছেন না, আমি অনিমেষ হালদার মহাশয়ের সম্পর্কে বলছি।

হত্যাকারীর নাম শুনে সকলে হতবাক হয়ে গেলেন। অনিমেষ হেলে বসেছিলেন চেয়ারে।

ঝটিতে সোজা হয়ে বসলেন। কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।

বাসব আবার বলল, যে লাঠি দিয়ে রূপা তার বাপকে আঘাত করেছিল, তাতে মেহেদির ছোপ দেখতে পাই। আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি, সদ্য মেহেদি ছোপানো হাতে লাঠি ব্যবহার করার দরুণ লাঠির গায়ে সূক্ষ্মভাবে তার ছোপ পড়েছে।

অনিমেষ এবার কথা বললেন, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে কি ?

—সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। একটু আগে আপনাদের বসিয়ে রেখে আমায় রামদয়ালের ঘরে যেতে হয়েছিল। আমি সমস্ত জেনে ফেলেছি এবং এখন সারেন্ডার করলে শাস্তি লঘু হতে পারে, একথা জোর দিয়ে বলতেই মা ও মেয়ে ভেঙে পড়ল। হত্যাকারীর নাম আমার কাছে আর অজানা রইল না। বুঝতেই পারছেন, কোর্টে ওরাই হবে আপনার বিরুদ্ধে পুলিশের মোক্ষম যন্ত্র। —ইন্সপেক্টার, আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আপনি এগিয়ে আসুন।

বাসব উঠে দাঁড়াল। ঘরের কারো মুখে কথা নেই। এই অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিতে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কাশ্যপ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন অনিমেষ হালদারের দিকে।

যেখানে যেমন

বিমান সেন বেশ বিপদে পড়েছেন।

পুলিশের চাকরি তাঁর কমদিন হল না। অনেক খুন জখম দেখেছেন। মড়াও কিছু কম ঘাঁটা-ঘাঁটি করেননি। তবে এমনটি আর দেখেছেন বলে মনে হয় না। এমন বীভৎস মৃতদেহ বোধহয় সচরাচর দেখাও যায় না। বিমান সেন অনেক আগেই নাকে রুমাল দিয়েছিলেন। আবার তাকালেন সেদিকে।

মৃতদেহের অর্ধেক মাংস খসে পড়েছে। জলীয় পদার্থ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকায় জায়গাটাকে ঘিনঘিনে অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। উৎকট বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিধারে। মুখ দেখেও চেনার উপায় নেই। সমস্ত একাকার হয়ে গেছে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারা যায়, মৃতব্যক্তি জীবিত অবস্থায় একজন বয়স্ক পুরুষ ছিলেন। গতকাল বিকেলে এই গলিত মৃতদেহ পাওয়া যায় নাটকীয় ভাবে। ডায়মণ্ডহারবার রোড কল্যাণপুরের যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই জায়গাটা নির্জন এবং জংলা অঞ্চল।

মৃতদেহের বিশেষত্ব হল গায়ে এক সুতো কাপড় না থাকলেও, পায়ে জুতো আছে। বিমান সেন মৃতব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। চতুর্দিকে খোঁজ খবর নিলেন। কিন্তু কেউই এগিয়ে এসে বলল না, ওই মৃতব্যক্তি আমার আত্মীয় বা পরিচিত। অথচ বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে ধামা চাপা দেবেন তাতেও সায় দিচ্ছে না মন। ব্যাপারটা যে নিঃসন্দেহে রহস্যজনক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজেই বিমান সেন একটু বেকায়দায় পড়ে গেছেন।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি শেষে স্থির করলেন, লালবাজারে সংবাদ পাঠানই বাঞ্ছনীয়। হোমিসাইড স্কোয়াড এসে তদন্ত করুক। এই সমস্ত গোলমেলে দায়িত্ব বেশিদিন নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। মন্থর পায়ে তিনি টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হোমিসাইড স্কোয়াডের সুযোগ্য কর্মকর্তা মিঃ সামন্ত আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই মফঃস্বল থানায় পেঁছালেন। সঙ্গে বাসবও আছে। অখণ্ড অবসরে কিছুটা বৈচিত্র আনার জন্যই ও লালবাজারে গিয়েছিল। সামন্ত একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে এলেন।

বিমান সেন যতটুকু জানেন বললেন। সনাক্তকরণের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে কথাও বলতে ভুললেন না। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে মৃতদেহ খুঁটিয়ে দেখার ব্যাপারে মিঃ সামন্তর সঙ্গে যোগ দিল।

বেশ কয়েকদিন আগে যে হত্যাকাণ্ডটি সাধিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া আর কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব হল না।

সামন্ত বললেন, লণ্ড্রির মার্ক বা আর কিছু যাতে চোখে না পড়ে তাই বোধহয় জামাকাপড় খুলে নেওয়া হয়েছে। হত্যাকারীর ইচ্ছা নয় হয়ত যে,

ভিক্‌টিমের পরিচয় প্রকাশিত হোক।

বাসব পাইপে দীর্ঘটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, অনেক ক্ষেত্রে ভিক্‌টিমকে জানা গেলে হত্যাকারী সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাই [illegible]হয় এই সতর্কতা। তবুও ভুল সে করেছে।

কি বলুন তো?

জুতো জোড়া দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তার। লক্ষ্য করুন খুব বেশিদিন কেনা হয়নি। এ থেকে আমরা কোন সূত্র পেয়ে যেতে পারি।

মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠিয়ে দেবার পর বাসব জুতো জোড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, মাস খানেকের বেশি ব্যবহার হয়নি। সামান্য ক্ষয়ে গেলেও ভেতরের লেবেল এখনও পড়া যায়। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ জুতো বিক্রেতা ইয়েন সিনের দোকান থেকে কেনা হয়েছিল।

পথে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম চারদিকটা কেমন ভিজে। এধারে বৃষ্টি হয়েছিল নাকি?

বিস্মিত বিমান সেন বললেন, দিন তিনেক ধরে এধারে খুব বৃষ্টি হয়েছে।

অথচ দেখুন জুতোর তলায় কাদা নেই। এতে প্রমাণিত হচ্ছে অন্য কোথাও থেকে তার মৃতদেহ বাক্সর মধ্যে ভরে হত্যাকারী এখানে এনেছিল। অবশ্যই তাকে মোটরের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

সামন্ত বললেন, আপনার অনুমানই বোধহয় ঠিক। এখনকার মত এখানকার কাজ বোধহয় আমাদের শেষ হয়েছে। এবার ফেরা যেতে পারে।

কলকাতায় পৌঁছেই সামন্ত জুতো জোড়া নিয়ে পড়লেন।

ইয়েন সিনের দোকানে প্রয়োজনীয় তথ্যই পাওয়া গেল। প্রতিদিন এখান থেকে অজস্র জুতো বিক্রি হচ্ছে। প্রত্যেক ক্রেতার নাম বা চেহারা মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছিল। এই জুতো জোড়া অর্ডার দিয়ে করানো হয়েছে মাত্র মাস খানেক আগে। কাজেই ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেল। নাম, জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী। ঠিকানা, আটত্রিশের বি রামনারায়ণ লেন। কলকাতা, নয়।

সামন্ত আর কালবিলম্ব না করে রামনারায়ণ লেনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাড়ির চাকচিক্য দেখেই বুঝতে পারা যায় গৃহকর্তা সম্পদশালী ব্যক্তি। বেল বাজাতেই একজন এসে ঘর খুলে দিল। চাকর বলেই মনে হয়, পুলিশ দেখে সে অদৃশ্য হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরেকজনের দেখা পাওয়া গেল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। সবলদেহী এই ব্যক্তির মুখে চিন্তার গভীর প্রলেপ।

আপনারা...

সামন্ত বললেন—জ্ঞানরঞ্জনবাবু আছেন?

না...মানে...আপনারা ভেতরে আসুন।

সামন্ত দুই সঙ্গীকে নিয়ে যুবকের পিছু পিছু একটি সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনজনকে বসতে অনুরোধ করে বিষণ্ণ গলায় সে আবার বলল, ৮ই জুন থেকে আমার বাবার কোন সংবাদ পাচ্ছি না।

পুলিশে সংবাদ দেননি কেন ?

উনি কাউকে কিছু না বলেই মাঝে মাঝে দেওঘর বা বেনারস চলে যেতেন। প্রথমে আমরা গা করিনি। ভেবেছিলাম যেমন যান তেমনি গেছেন। পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখি দেওঘর বা বেনারস যাননি। তখনই আমাদের চিন্তা বাড়তে থাকে। পুলিশে সংবাদ দেওয়ার কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় আপনারা···

উনি কি কাজ করতেন ?

আমাদের আয়রণ ফাউণ্ড্রী আছে। আপনারা বাবার সম্বন্ধে এত খোঁজ নিচ্ছেন···কি হয়েছে বলুন তো ?

সামন্ত ভারি গলায় বললেন, আপনার বাবা বোধহয় আর বেঁচে নেই। মর্গে লাস এখনও রাখা আছে। সনাক্তকরণের জন্য একবার যেতে হবে।

যুবক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর ভেঙে পড়ল সেণ্টার টেবিলের উপর। কান্নায় তার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হয়ে ভেজা গলায় বলল, বাবা নেই, এ যে আমি ভাবতেও পারছি না!

সামন্ত তাকে অনেক সান্ত্বনার কথা বললেন। তারপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আদায় করে নিলেন। জ্ঞানরঞ্জনের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে অনেকদিন আগেই। একমাত্র সন্তান চিত্তরঞ্জনকে নিয়েই তাঁর সংসার। আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। তাঁর কোন শত্রু ছিল না একথাই জানে চিত্তরঞ্জন।

এরপর চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে সামন্ত মর্গের উদ্দেশে রওনা হলেন।

বাসব সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে অপরাধ বিজ্ঞান-এর একটা বই পড়ছিল। অদূরে বসে শৈবাল এক মনে পেসেন্স খেলে চলেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

বাসব রিসিভার তুলে নিয়ে সাড়া দিতেই ওপাশ থেকে সামন্তর গলা ভেসে এল, আমাকে অথৈ জলে ফেলে আপনি পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন! সেদিনের পর থেকে তো আপনার টিকিটির পর্যন্ত দেখা নেই।

কতদূর কি হল কেসটার ?

কিছুই হয়নি। আন অফিসিয়ালি আমাকে সাহায্য করতে রাজি আছেন কি না বলুন ?

এত রাগের কথা হল। নিশ্চয়ই রাজি আছি। এবার ঝেড়ে কাশুন তো।

সামন্ত জ্ঞানরঞ্জন সংক্রান্ত সমস্ত কথা বললেন। গলিত মৃতদেহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছেলে মৃতদেহ সনাক্ত করতে পেরেছে একথাও জানালেন।

আমি জ্ঞানবাবুর বাড়িটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই।

বেশ তো, কবে যাবেন ?

আজই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। ওখানে যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা করে রাখবেন। আরেকটা কাজ করতে হবে। যে বাক্সর মধ্যে বাড়িটা পাওয়া গেছে ওটা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

বেশ।

বাসব ফোন ছেড়ে দিল।

চল ডাক্তার রামনারায়ণ লেন থেকে ঘুরে আসি।

তোমার ঘাড়েই কেসটা চাপল মনে হচ্ছে।

পুলিশকে তো অখুশি করা যায় না। বুঝতে তো পারছই ওদের সহযোগিতাতেই আমার কারবার।

তা বটে।

আরও কিছুক্ষণ পরে দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রামনারায়ণ লেনের নির্দিষ্ট বাড়িতে লক্ষ্য করা গেল, মিঃ সামন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। চিত্তরঞ্জন ম্রিয়মান মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলে বাসব জ্ঞানরঞ্জনের শয়নকক্ষটি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

চিত্তরঞ্জন দুজনকে নিয়ে গেল ওখানে।

একজন ধনীব্যক্তির শয়নকক্ষ যেমন হওয়া উচিৎ তার ব্যতিক্রম নয়। পরিপাটি করে চতুর্দিকে সাজানো। প্রশ্ন করে জানা গেল, ঘরের আলমারি-গুলিতে পুলিশ তল্লাসী চালিয়েছিল। সুতরাং ওদিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই। যদি কোন সূত্র থাকে তবে তা এখন পুলিশের হাতে।

পাশের ঘরে কে থাকেন ?

ওটা স্টাডিরুম। ও ঘরে বাবা পড়াশোনা করতেন।

বাসব পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেওয়াল বেড়ে কাঁচের বড় বড় পাল্লা দেওয়া আলমারি। ইংরাজী ও বাংলা বই ঠাসা। একধারে সুদৃশ্য সেক্রেটেরিয়েট টেবিল। টেবিলে থরে থরে ফাইল সাজানো। বলাবাহুল্য এ সমস্ত ব্যবসা সংক্রান্ত। আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস রয়েছে ওখানে।

বাসব বলল, পুলিশ এঘর থেকে কিছু নিয়ে গেছে নাকি ?

দেরাজে বাবার ডায়েরি ছিল, ওটা নিয়ে গেছে।

দেরাজে চাবি লাগান আছে নাকি ?

না।

লম্বালম্বি ভাবে তিনটি দেরাজ আছে সেক্রেটেরিয়েট টেবিলে। প্রথমটা বাসব দেখল, চেক বুক, কিছু চিঠি-পত্র ও ছোটখাট আরও অনেক কিছু

রয়েছে। দ্বিতীয় তাকে পাওয়া গেল, গোছা খানেক এ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক। বিভিন্ন বছরের। চলতি বছরেরটা উপরেই ছিল। বাসব পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ৮ই জুনে এসে থামল। এই দিনই জ্ঞানরঞ্জন বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়েছিলেন। দেখা গেল ৮ই জুন তাঁর তিনজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। সেই তিনব্যক্তি হলেন, মৃণাল দস্তিদার, কিংকর সরকার আর অমিয় সোম।

চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে জানা গেল, এই তিনজনই ফাউণ্ড্রীর প্রয়োজনে যে সমস্ত মাল লাগে তারই সাপ্লায়ার! ব্যবসার সূত্রে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। বাসব ওদের ঠিকানা নোট করে নিল। এখানে আর কিছু করার ছিল না। চিত্তরঞ্জনকে এক প্রস্থ সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

তুমি এবার কোথায় যাবে?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, বিবেকানন্দ রোডে যাব। মৃণাল দস্তিদারের সঙ্গে আগে কথা বলব ভাবছি।

আমাকে তাহলে ছেড়ে দাও ভাই। আজ একটা অপারেশন আছে। শৈবাল চলে যাবার পর বাসব একটা ট্যাক্সি করে বিবেকানন্দ রোডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছাল। অফিসেই পাওয়া গেল দস্তিদারকে। স্থূলকায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গম্ভীর প্রকৃতিরই মনে হল। উৎসুক নেত্রে আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে এই তদন্তের সহযোগিতা প্রার্থনা করল।

দস্তিদার বললেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার। জ্ঞানরঞ্জনবাবু অত্যন্ত অমায়িক মানুষ ছিলেন। তিনি যে এইভাবে খুন হবেন কল্পনাও করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা চাইছেন বলুন?

গোটাকয়েক প্রশ্ন করব। সঠিক উত্তর পেলে আমার উপকার হবে।

বলুন?

৮ই জুন জ্ঞানরঞ্জনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

এসেছিলেন।

কখন?

তখন বেলা সাড়ে দশটা।

কি কথাবার্তা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?

ব্যবসা সংক্রান্ত কথাই হয়েছিল। আধঘণ্টার বেশি থাকেননি।

তখন কি তিনি স্বাভাবিক ছিলেন?

অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি।

এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন?

একটু চিন্তা করে দস্তিদার বললেন, যতদূর মনে পড়ছে, কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, খিদিরপুরের দিকে যাবেন।

আরও দু'চার কথার পর বাসব ওখান থেকে উঠল। অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছিল, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু খবর পাওয়া গেল না। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে চিন্তিত মুখে ও মোড়ের দিকে পা চালাল। আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাপারটা জটিল মনে হচ্ছে বটে, প্রকৃত পক্ষে তা বোধহয় নয়। বিরাট একটা ফাঁক কোথাও আছে। তার সন্ধান পেলেই সমস্ত জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিঙ্কর সরকার ও অমিয় সোমের সঙ্গেও ক্রমে সাক্ষাৎ হল বাসবের। দুজনেই ক্ষুদে ব্যবসাদার। একজনের অফিস গণেশ এভিনিউ-এ, আর এক-জনের ধর্মতলা স্ট্রীটে। কিঙ্কর সরকার বললেন, ৮ই জুন বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ জ্ঞানরঞ্জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথাটা ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন বলতে পারেন না। কারণ তিনি সে সম্পর্কে কিছু বলেননি, ইত্যাদি।

অমিয় সোমও ওই একই রকম কথা বললেন। তাঁর সঙ্গেও জ্ঞানরঞ্জন বেলা সাড়ে দশটার সময় দেখা করতে এসেছিলেন। কথাবার্তা ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই হয়েছিল। তিনি এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন সোম বলতে পারেন না।

বাড়ি ফিরে বাসব ঘোরাল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। তিনজনে একই কথা বলছেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জ্ঞানরঞ্জন বেলা সাড়ে দশটার সময় দেখা করেছিলেন! একজন লোকের পক্ষে একই সময়ে তিনজনের সঙ্গে তিন ঠিকানায় দেখা করা কি করে সম্ভব? সুতরাং তিনজনেই নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

এই মিথ্যা কথা বলার নেপথ্যে কি কোন গভীর রহস্য নিহিত আছে? হয়ত এমনও হতে পারে, তিনজনই জানতেন তদন্ত করতে তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই কেউ আসবে। তাই যা হোক একটা সময় তাঁরা বলেছেন। কাকতালিয় ভাবে একই সময় উল্লেখিত হয়ে গেছে।

আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয়, জ্ঞানরঞ্জন কোন অজানা কারণে আলাদা আলাদা ভাবে তিনজনকে জানিয়েছিলেন, সাড়ে দশটার সময় দেখা করবেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে দেখা করেননি বা তিনজনের মধ্যে কোন একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এখন ভয় পেয়ে গিয়ে সকলেই ওই সময়টার কথা উল্লেখ করছেন।

যাইহোক, এই তিন মহাশয়ের মধ্যে যে কেউ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এ সন্দেহ সহজেই মনকে নাড়া দেয়। বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আরো কিছুক্ষণ এই সম্পর্কে চিন্তা করল। তারপর বাহাদুরকে ডেকে জেনে নিল লালবাজার থেকে কাঠের বাক্সটা পাঠান হয়েছে কিনা?

বাক্সটা ঘণ্টাখানেক আগেই সামন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। খাওয়া দাওয়া সেরে বাসব ওটা নিয়ে পড়ল। লম্বায় ফুট আড়াই হবে, উঁচুতে দু'ফুটের বেশি নয়। এই সাইজের একটা বাক্সে মৃতদেহ বেশ ঠেসেঠুসেই রাখতে হয়েছিল। বাক্সের গায়ে কালি দিয়ে কিছু লেখা ছিল। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় খালি চোখে পড়া গেল না। ম্যাগনিফ্লাইং গ্লাস দিয়ে বাসব পাঠোদ্ধার করল শেষ পর্যন্ত। লেখা আছে 'নাগপুর টু ক্যালকাটা।' মেয়ার্স কোং এবং ৭ ৪ ৭ ৭।

অর্থাৎ মেয়ার্স কোম্পানি ওই তারিখে নাগপুর থেকে কলকাতায় কিছু মাল এই বাক্সে পাঠিয়েছিল। ট্রেনে নয়, ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়েছিল তাও বুঝতে পারা যাচ্ছে। নাগপুর থেকে বাক্সটা এসেছে খুব বেশিদিন হয়নি—

বাসব ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চার পাঁচটা ট্রান্সপোর্ট অফিসে খোঁজ খবর নিতেই জানা গেল, মেয়ার্স কোম্পানির মাল বহন করে রোড স্টার ট্রান্সপোর্ট। রোড স্টারের অফিস তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে। ওখানে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে, নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে বাসব জানতে পারল রোড স্টার নিজের প্রয়োজনে মেয়ার্স কোম্পানি থেকে কিছু মেশিনারি আনিয়েছিল। সাত-চার-সাতাত্তরেই মালটা ওখান থেকে ডেসপ্যাচ হয়।

সেই প্যাকিং বাক্সটা আপনারা কি করেছিলেন?

বিস্মিত ম্যানেজার বললেন, মাল খালাস করে নেবার পর বাক্সগুলো আমরা বিক্রি করেছি।

সাত-চার তারিখে আসা ওই বাক্সটা কাকে বিক্রি করা হয়েছে বলতে পারেন?

খাতাপত্র ঘেঁটে তিনি বললেন, বেশ কিছু বিক্রি করা হয়েছে রমনী জোয়াদ্দারকে! ভবানী দত্ত লেনে তার আড়ত আছে।

বাসব ঠিকানাটা ভাল করে জেনে নিয়ে রোড স্টারের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। ভবানী দত্ত লেন এখান থেকে বেশিদূর নয়।

সন্ধ্যার মুখেই চিত্তরঞ্জন, দস্তিদার, সোম আর সরকার বাসবের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। পুলিশের আহবানেই অবশ্য তাঁরা এখানে এসেছেন। বেলা তিনটের সময় বাসব ফোন করে সামন্তকে জানিয়েছিল, কেশটা হেরাফেরি হয়ে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে। উনি যেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনকে লালবাজারে ডেকে পাঠান। ওদের কোন অজুহাতে কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে—তারপর তার বাড়িতে সন্ধ্যার মুখে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তবে এখুনি যেন একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে তার কাছে পাঠান হয়। বিশেষ এক জায়গায় তদন্তে যেতে হবে।

সামন্ত অনুরোধ মতই কাজ করেছেন।

বাসব কিন্তু বাড়ি নেই। দস্তিদার, সোম আর সরকারের মুখ অসম্ভব

গম্ভীর।এতক্ষণ আটকে রাখার জন্য তারা পুলিশের এই জুলুমের প্রতিবাদ যে করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সামন্ত অদূরে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। আরো মিনিট কুড়ি পরে বাসব বাড়ি ফিরল। মুখে সলজ্জ হাসি।

বসতে বসতে বলল, আপনাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য আমি মর্মাহত। আর সময় নষ্ট করব না। এবার কাজের কথায় আসছি। আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন, হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তার নাম করার আগে আমি কিছু আলোচনার মধ্যে যেতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখি হত্যার মোটিভ কি তা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। অবশ্য হত্যাকারীকে হাতে পাবার পর মোটিভের সন্ধান পেতে পুলিশের অসুবিধা হবে না। এবার আমি যা বলতে চলেছি তা অনুমানের উপরই নির্ভরশীল। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তব থেকে তার দূরত্ব খুব বেশি নয়! জ্ঞানরঞ্জনবাবু কেন জানা যায় না ৮ই জুন আপনাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেলা সাড়ে দশটার সময় নির্দেশ করেছিলেন। একই লোকের পক্ষে একই সময় তিনজনের সঙ্গে তিন জায়গায় দেখা করা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি একজনের সঙ্গেই দেখা করেছিলেন! বলাবাহুল্য সেই ব্যক্তিই হত্যাকারী।

সোম বললেন, আপনি বলতে চাইছেন আমাদের মধ্যেই কেউ খুন করেছে?

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাকে একথা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। তারপর শুনুন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারা যায়, এটা প্রি-প্ল্যান মার্ডার নয়। দুজনের মধ্যে কোন কারণে উত্তেজনা চরমে ওঠে বা সেই অজানা মোটিভ হঠাৎ মাথা চাড়া দেওয়ায় এই রক্তাক্ত বিপর্যয় ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই হত্যাকারীকে ভীত ও বিব্রত বোধ চেপে ধরে। কারণ যা হবার হয়ে গেলেও, মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে না পারলে বিপদের শেষ থাকবে না। কাজেই হত্যাকারীকে তার অফিস ঘরে তালা দিয়ে রাখতে হল—ওই ঘরেই ঘটনাটা ঘটেছিল। কর্মচারিরা বিকেলে চলে যাবার পর সে একটা প্যাকিং বাক্স কিনে আনে। বাক্সে মৃতদেহ ভরে, অফিস ঘরের চারদিকে ছিটিয়ে থাকা রক্ত পরিষ্কার করে, জিপে বাক্সটা চাপিয়ে নিয়ে চলে যায় ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেক দূরে। তারপর কল্যাণপুরের বনবাদাড়ে ফেলে আসে মৃতদেহ। নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আমি কার কথা বলতে চাইছি। জিপ গাড়িই এই কাজের সহায়ক। এমনই যোগাযোগ, হত্যাকারীর একটা পুরানো মডেলের জিপ আছে।

সরকার বললেন, সেকি! তবে—

দস্তিদার বললেন, আপনি কি তাহলে…কিন্তু…

ভারি গলায় বাসব বলল, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মিঃ দস্তিদার। আপনি ভালরকমই জানেন, আমি ঠিক রাস্তা ধরেই এগিয়েছি। মিঃ সামন্ত, আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনার আসামী সামনেই রয়েছেন। স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন।